সাধারণ বিজ্ঞান

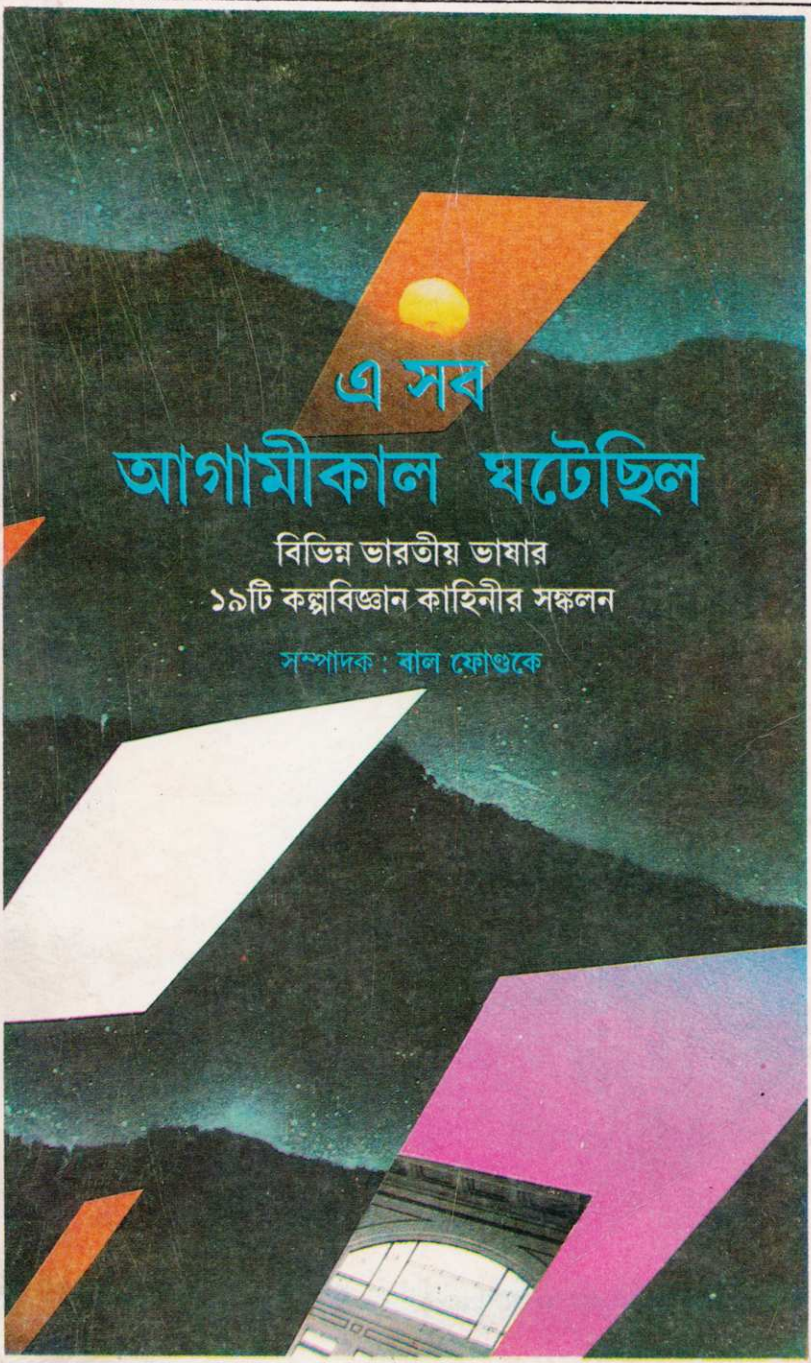

এ সব আগামীকাল ঘটেছিল

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার
১৯টি কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর সঙ্কলন

সম্পাদক : বাল ফোণ্ডকে

কল্পবিজ্ঞান কাহিনী বলতে ঠিক কী বোঝায় তা সুন্দরভাবে বর্ণনা করে হুগো গের্ণসব্যাক বলেছিলেন যে, 'বিজ্ঞানকাহিনী বলতে আমি বুঝি জুল ভের্ণ, এইচ.জি. ওয়েলস এবং এডগার অ্যালান পো'র রচনা জাতীয় গল্প—এক মনোমুগ্ধকর বিস্ময়ের কাহিনী, যার সঙ্গে মিশ্রিত আছে বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার বর্ণিত দৃশ্য', এবং সেখানে আজ যে নতুন নতুন উদ্ভাবনের চিত্র থাকছে তা '...আগামীকাল আর অসম্ভবের পর্যায়ে থাকবে না।' পশ্চিমে রচিত কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর অধিকাংশের পক্ষেই উপর্যুক্ত কথাগুলি খাটে কিন্তু যে কোনো ভাষাতেই হোক, ভারতে কল্পবিজ্ঞান সহিত্যের মূল বিষয় প্রধানত মানবিক মূল্যবোধভিত্তিক যা বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন এবং মানবিক ভাবানুভূতি বা সামাজিক ভিত্তির অন্তঃস্থ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে রচিত হয়।

জানা গেছে, প্রথম ভারতীয় কল্পবিজ্ঞান কাহিনী লিখেছিলেন বাংলায়, জগদীশ চন্দ্র বসু এবং প্রায় একই সময়ে মারাঠীতে এস. বি. রাণাডে। এরপর তামিল সহ অন্যান্য ভাষাতেও কল্পবিজ্ঞান কাহিনী রচিত হয় কিন্তু প্রধানত মারাঠী ভাষাতেই এর বিকাশ সবচেয়ে শক্তিশালী যার প্রমাণ এই সঙ্কলনেও পাওয়া যাবে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর এই সঙ্কলন থেকে ভারতীয় কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের প্রবণতা সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠবে। লেখক-সম্পাদক বাল ফোণ্ডকে কাহিনীগুলি সযত্নে নির্বাচন করেছেন। শ্রী ফোণ্ডকে নয়াদিল্লির সি. এস. আই. আর-এর প্রকাশনা ও তথ্য দফতরের অধিকর্তা।

এ সব
আগামীকাল ঘটেছিল

Collect More Books >
From Here

সাধারণ বিজ্ঞান

এ সব আগামীকাল ঘটেছিল

সম্পাদক : বাল ফোণ্ডকে
ছবি : সুবীর রায়
অনুবাদ : নবারুণ ভট্টাচার্য

গল্পকার
জয়ন্ত ডি. নারলিকার
বাল ফোণ্ডকে, লক্ষ্মণ লোনধে
সুবোধ জবাদেকার, নিরঞ্জন এস. ঘাটে
অরুণ মাণ্ডে, শুভদা গোগাটে, অনীশ দেব
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন সিংহ, 'সুজাতা'
রাজশেখর ভুসনুরমাথ, সঞ্জয় হাভানুর
দেবব্রত দাস, মুকুল শর্মা, আর.এন. শর্মা
কেনেথ ডয়েল, দেবেন্দ্র মেওয়ারি, অরবিন্দ মিশ্র

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

এই বইটি প্রাকৃতিক-ভারসাম্য সহায়ক পুনরুৎপাদিত কাগজে মুদ্রিত।

ISBN 81-237-1730-X

1996 (শক 1918)
© মূল ইংরেজী সঙ্কলন: বাল ফোগুকে, 1993
বাংলা অনুবাদ © ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, 1996

মূল্য: 63.00 টাকা

It Happened Tomorrow *(Bangla)*

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ5, গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি 110016 কর্তৃক প্রকাশিত

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা		ix
ভূমিকা		xi
তুষার যুগ আসছে	জয়ন্ত ডি. নারলিকার	1
প্রতারক	বাল ফোণ্ডকে	23
দ্বিতীয় আইনষ্টাইন	লক্ষ্মণ লোনধে	40
অন্ধকারের বুক বেয়ে	সুবোধ জবাদেকার	58
লোকটা	নিরঞ্জন এস. ঘাটে	70
রুবী	অরুণ মাণ্ডে	82
জন্মগত অধিকার	শুভদা গোগাটে	107
নীলবর্ণ বিড়াল	অনীশ দেব	137
সময়	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	147
উত্তরণ	নিরঞ্জন সিংহ	167
উভয় সংকট	'সুজাতা'	181
শুক্রগ্রহ লক্ষ্য করছে	রাজশেখর ভুসনুরমাথ	200
লিফট	সঞ্জয় হাভানুর	208
ঈশ্বরের মুখোমুখি	দেবব্রত দাস	223
কোন দুই কালে	মুকুল শর্মা	235
দ্বিতীয় আগমন	আর.এন. শর্মা	240
বৃষ্টি	কেনেথ ডয়েল	248
বিদায়, মিস্টার খান্না	দেবেন্দ্র মেওয়ারি	256
পোষ্যপুত্র	অরবিন্দ মিশ্র	264

কৃতজ্ঞতা

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর সঙ্কলন অতীতে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা থেকে সংগ্রহ করে ভারতীয় কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের এক প্রতিনিধিত্বমূলক সঙ্কলন পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। বিশ্ব কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের মানচিত্রে ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করার এই প্রচেষ্টার উদ্যোগ নেয় ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। এই কারণে এবং সঙ্কলনটির জন্য কাহিনী নির্বাচন, তার সম্পাদনার দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করার জন্য আমি ট্রাস্টের কাছে কৃতজ্ঞ। দায়িত্বভারটি গ্রহণ করার সময় আমি উপলব্ধি করতে পারিনি যে কাজটি কত কঠিন, বিশেষত আমি যখন সবগুলি ভাষার সঙ্গে পরিচিত নই। যাইহোক, অনেক বন্ধুই তখন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ভিয়াল নাদকারনি, আর.এস. ভুসনুরমাথ, শৈবালকুমার নাগ ও সুকন্যা দত্ত বিশেষভাবে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। অনুবাদকের সংখ্যা বহু হলে অনুবাদের সাজুয্য রক্ষা করা দুরূহ। তা সত্বেও এই সঙ্কলনে সেই সাজুয্য রচনার কাজটি বহুলাংশে সুসম্পন্ন হয়েছে।

বাল ফোণ্ডকে

ভূমিকা

'কল্পবিজ্ঞান কাহিনী' আদপে কী? সাহিত্যের জগতে এই ধারাটি ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু সমালোচক ও সম্পাদক প্রশ্নটি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। এডগার অ্যালান পো, উইলিয়াম উইলসন বা এডগার ফসেট—কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর প্রথম যুগের খ্যাতনামা লেখকবৃন্দ কল্পবিজ্ঞান কাহিনী বলতে নির্দিষ্টভাবে কি বোঝায় তার একটি সংজ্ঞা নির্ধারণেরও চেষ্টা করেছিলেন। সত্যি বলতে, 'কল্পবিজ্ঞান কাহিনী', এই নামটির নিজস্ব বিবর্তনের ইতিহাস রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যিনি নিয়েছিলেন তিনি হলেন হুগো গের্ণসব্যাক। তাঁর প্রদত্ত সংজ্ঞাটির প্রভাবও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। তাঁরই নামে কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর জন্য সুবিদিত 'হুগো' পুরস্কার দেওয়া হয়। গের্ণসব্যাক সাহিত্যের এই স্বতন্ত্র ধারাটিকে বলেছিলেন 'বিজ্ঞানকাহিনী' (সায়েন্টিফিকশন)। 'অ্যামেবি স্টোরিজ' নামক রহস্যরোমাঞ্চ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে হুগো তাঁর সংজ্ঞাটি দিয়েছিলেন। এই কাহিনীসমৃদ্ধ পত্রিকাটি কল্পবিজ্ঞান কাহিনীকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে এক বিশাল ভূমিকা নিয়েছিল।

সাহিত্যের এই ধারাটি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। নির্ঘাৎ এই কারণেই গের্ণসব্যাক কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর সীমারেখা বেঁধে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'বিজ্ঞানায়ন বলতে আমি বোঝাতে চাই জুল ভের্ন, এইচ.জি. ওয়েলস এবং এডগার অ্যালান পো জাতীয় গল্প—এক মানোমুগ্ধকর বিস্ময়ের কাহিনী, যার সঙ্গে মিশ্রিত থাকবে বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার বর্ণিত দৃশ্য। এই আশ্চর্য কাহিনীগুলি শুধু যে পড়তেই ভালো লাগবে তা নয়, সেগুলি সবসময়েই হবে শিক্ষামূলক। সহজ ও উপাদেয়ভাবে এই কাহিনী জ্ঞানের আকর হবে। বর্তমান কালের বিজ্ঞানায়নের ফলে যে নতুন নতুন উদ্ভাবনের ব্যাপার চিত্রিত হচ্ছে তা আগামীকাল আর অসম্ভবের আওতায় থাকবে না।'

নিঃসন্দেহে ভেজাল থেকে আসলকে পৃথক করার প্রয়োজনীয়তা গের্ণসব্যাককে প্রভাবিত করেছিল। এটা বস্তুত খুব প্রয়োজনীয় ছিল কারণ অপ-বিজ্ঞান নির্ভর অলীক কল্পনার পাঠকের কাছে কাহিনী হিসেবে কল্পবিজ্ঞান সমাদৃত হয়ে ওঠার

বিপদ ছিল বিদ্যমান। গের্ণসব্যাকের সময় থেকে কি বিশ্লেষণ কি সমৃদ্ধি—সবদিক দিয়েই ধারাটি অনেক এগিয়ে গেছে কিন্তু পূর্ববর্ণিত বিপদটি সম্পূর্ণ কাটেনি। অতএব দেখা যায় যে সুচারুভাবে কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য গের্ণসব্যাকের উদ্বেগ ছিল যথার্থ।

এতদসত্ত্বেও গের্ণসব্যাকের প্রদত্ত সংজ্ঞা-কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর পিঠে এক গুরুভার দায় চাপিয়ে দেয় যা এখনও তাকে বহন করতে হচ্ছে। তার কারণ ঐ সংজ্ঞানুসারে, সাহিত্যের এই ধারাকে, সঠিকভাবেই, শুধু 'কল্পবিজ্ঞান কাহিনী'ই বলা হল না, তাকে 'দ্রষ্টার কাহিনী'-ও বলা হল। অতএব দেখা গেল যে এই ধরনের সাহিত্যে রচনার ঝুঁকি যিনি নেবেন তাঁকে শুধু অশেষ কল্পনাশক্তির অধিকারী হলেই হবে না, তাঁকে আশ্চর্যভাবে ভবিষ্যদ্বাণীও করতে হবে।

কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের প্রাথমিক যুগের মহান স্রষ্টা ওয়েলস ও ভের্ন খুব বিশদভাবে না হলেও মোটের ওপর সঠিকভাবে ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর একটা রূপরেখা ফুটিয়ে তুলতে সফল হয়েছিলেন। এই সাফল্যই সম্ভবত গের্ণসব্যাককে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু তিনি এটা সম্যক উপলব্ধি করেননি যে ওয়েলস ও ভের্ন এবং তাঁদের প্রচেষ্টা যতই উজ্জ্বল হোক না কেন তাঁরা ছিলেন আদতে নিয়মের ব্যতিক্রমস্বরূপ। ওয়েলস ও ভের্ন যেন সমতলের মধ্যে দণ্ডায়মান দুই গগনস্পর্শী শৃঙ্গ যাঁদের পক্ষে সমতলের কাহিনী ও বিচাররীতিকে প্রভাবিত করা সম্ভব ছিল না।

নতুন প্রজন্মের যে কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর রচয়িতারা দ্রুত আত্মপ্রকাশ করছিলেন তাঁদের কাছে উপরোক্ত দায় এক অন্যায়ভাবে চাপানো জোয়ালে পরিণত হল। বিশ দশকের মধ্যভাগে সাহিত্যে এই ধারায় স্বর্ণযুগ সৃষ্টকারী আইজ্যাক আসিমভ ও রবার্ট হেইনলেইন সহ বিভিন্ন লেখক যাঁর সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন সেই জন ক্যাম্পবেলও সম্ভবত ঐ গুরুভার জোয়ালের যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন। শীঘ্রই তিনি তাঁর নিজস্ব ইস্তাহার প্রকাশ করলেন। এই ইস্তাহার কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর গোলমেলে ভিত্তিটিকে সঠিক ও সহজ করে তুলল।

ক্যাম্পবেল প্রস্তাব দিলেন, 'খোদ বিজ্ঞানের সগোত্র এক সাহিত্য মাধ্যম হিসেবে কল্পবিজ্ঞান কাহিনীকে অভিহিত করা উচিত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যেই এই ব্যাপারটি নিহিত রয়েছে। যে কোনো সুচিন্তিত তত্ত্ব শুধু পরিচিত ঘটনারই ব্যাখ্যা করে না, নতুন এবং এখন অবধি অনাবিষ্কৃত ঘটনাও আগাম আঁচ করে। কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর প্রচেষ্টা অনেকটা অনুরূপ—ভবিষ্যতের ফলাফল শুধু যন্ত্রের ক্ষেত্রেই নয়, মনুষ্য সমাজেরও কি চেহারা আনতে পারে সেটা কাহিনীর আকারে রচনা করা।' সাহিত্যের এই ধারাটির বর্তমানে যা স্বীকৃত নাম সেই 'কল্পবিজ্ঞান কাহিনী' তিনিই চালু করেন।

উভয় সংজ্ঞার মধ্যেই এই অংশটি নিহিত রয়েছে যে বিষয়বস্তু আঙ্গিক এবং লক্ষ্যের দিক থেকে এই ধরনের কাহিনী সমসাময়িক অন্যান্য আঙ্গিক থেকে বেশি গতিশীল হবে। এই প্রত্যাশা আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করেছে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মূল ধারণাটির মধ্যে কিছু শৈথিল্য ঘটিয়েছে। এর ফলে অনেক নতুন রচয়িতা অনাবিষ্কৃত এলাকায় অভিযান চালাবার সাহস দেখিয়েছেন এবং সুবিধেমতো সেগুলিকে মূল বিষয়ের মধ্যে তালেগোলে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর এই প্রসারিত অথবা কষ্টকল্পিত ভাষ্যের ক্ষেত্রেও নতুন নতুন উদ্যমীর উদ্ভব ঘটেছে।

সত্যি বলতে এটা স্বীকার করতেই হবে নতুন নতুন দ্রষ্টা ও তাঁদের অনুগামীরা মাধ্যমটিকে সমৃদ্ধকর করে তুলেছেন। প্রতিটি নতুন সাফল্যই আরও এগিয়ে যেতে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে, নতুন পথের সন্ধান করে নয়া সাফল্যের উজ্জ্বল নজির রাখতে অন্যদের অনুপ্রাণিত করেছে। এই কারণেই সাহিত্যের অন্য বহু ধারার মত কল্পবিজ্ঞান কাহিনীকে কখনও বদ্ধ জলায় আটকে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করতে হয়নি।

কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই অভিযান এত দূরে চলে গেছে যে মূল ধারার সঙ্গে সংযোগসূত্রটি চূড়ান্ত সীমার বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ধরনের প্রথম অভিযানের আরম্ভ ঘোষণা করে থিওডর স্টার্জিয়ন তাঁর নিজস্ব সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, 'কল্পবিজ্ঞান কাহিনী হল সেই কাহিনী যার মধ্যে থাকে মানুষ, মানবিক সমস্যা ও তার মানবিক সমাধান যা তার বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়বস্তু ব্যাতিরেকে হতেই পারত না।' বিজ্ঞান ও কাহিনীর মেলবন্ধনের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় কারণ বিজ্ঞান অযৌক্তিকতা আদৌ বরদাস্ত করে না কিন্তু কাহিনী ভাবাবেগ ও কল্পনার ওপরে বহুলাংশে নির্ভরশীল হওয়ায় মানবিক তৎপরতা বহুক্ষেত্রেই যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির ধার ধারে না।

যাইহোক, গের্ণসব্যাক ও ক্যাম্পবেল সযত্নে বাঁধ বেঁধেছিলেন স্টার্জিয়ন তাতে সাময়িকভাবে এই ফাটল ধরাতেই প্রচণ্ড জলের তোড়ের রাস্তা খুলে গেল। এঁর অনুবর্তীরা কল্পনাবিহারকালে বিজ্ঞানের সূত্রটি রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার কথা সর্বদা স্মরণে রাখতে পারলেন না। সেই কারণেই এই সংজ্ঞাটি চালু হয়ে যায় যাতে বলা হয়েছে, 'কল্পবিজ্ঞান কাহিনী হল বর্ণনামূলক গদ্যের সেই ধারা যা এমন একটি পরিস্থিতিকে ঘিরে রচিত হয় যার উদ্ভব আমাদের পরিচিত বিশ্বে সম্ভবপর নয়। মূলত মানুষ বা অন্য গ্রহের বাসিন্দাদের বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যা বা অপ-বিজ্ঞান বা অপ-প্রযুক্তিবিদ্যার নতুন কোনো প্রবর্তনের ভিত্তিতে এই কাহিনী প্রকল্পরূপে সাজানো হয়।

বর্তমানে যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে তার ঐ হল সূত্রপাত। এখন ইংরেজী ভাষাভাষী পশ্চিমী দুনিয়াতে যে নয়া কল্পবিজ্ঞান কাহিনী রচিত হচ্ছে তার অধিকাংশের মধ্যেই প্রকৃত বিজ্ঞানের অস্তিত্ব খুবই কম। 'কল্পবিজ্ঞান কাহিনী'র গল্প ফাঁদার জন্য যে পরিমাণে অপ-বিজ্ঞান বা অপ-প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহৃত হচ্ছে যে সাহিত্যধারাটির মূল স্বরূপ হারাতে বসেছে। এর ফলে শুধু অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যেই নয়, প্রবক্তা ও রচয়িতাদের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। নতুন যাঁরা লিখতে চাইছেন তাঁরাও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন।

পশ্চিমের অন্যান্য ভাষার পরিস্থিতি অজানা কারণ এর কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য খুব কমই ইংরেজিতে অনুবাদ হয়। তবে ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর একটা ভাল অংশ পাওয়া যায়। সম্ভবত স্তানিসল লেম-এর উদাহরণ অনুসরণ করে এইসব ভাষার লেখকবৃন্দ গের্ণসব্যাক-ক্যাম্পবেল-স্টার্জিয়ন-এর ঘরানার প্রতি আস্থা রেখে লিখে চলেছেন। তবে, রুশী কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর অধিকাংশই পাঠকের পক্ষে বেশি কঠিন—ভাষার আড়ষ্টতা দেখা যায় যে গল্পের মাধুর্যকে নষ্ট করে দিয়েছে।

ভারতীয় কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর লেখকদের মধ্যে কয়েকজন, শুধু যাঁরা ইংরেজিতে লেখেন তাঁরাই নন, সমসাময়িক মার্কিন ও বৃটিশ লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত। ফলস্বরূপ এঁরাও অপ-বিজ্ঞানের আশ্রয় নেন এবং এঁদের চিন্তাভাবনাও ভারতীয় আত্মিক বৈশিষ্ট্যের বিরোধী। এঁদের সাহিত্যকে ভারতীয় কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের মধ্যে ধরা উচিত কিনা প্রশ্নটি অবান্তর নয়। এঁরা নামেই ভারতের। এঁদের রচনায় না আছে ভারতীয়তা, না আছে কল্পবিজ্ঞানের গল্প। এটা অবশ্য ঠিক যে ইংরেজি ভাষার সাহিত্য পাঠকদের মধ্যে একাংশের অন্তত সাংস্কৃতিক যোগসূত্র পশ্চিমের দুনিয়ার সঙ্গে বাঁধা। সেই কারণেই সম্ভবত উপরোক্ত লেখকেরা ঐ ভাবে লেখেন। কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের ধ্রুপদী ধারার প্রতি তাঁরা যদি বিশ্বস্ত থাকতেন তাহলে বাধ্যতামূলকভাবে তাঁদের প্রকৃত বিজ্ঞান এবং আকাশচারী কল্পনার মধ্যে তার সাম্য রক্ষা করে চলতে হত। ঐ কল্পনাকে পরিচিত, প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের মধ্যে খাপ খাওয়ানো খুব সহজসাধ্য নয়। অপ-বিজ্ঞানের বর্ণনা পড়া থাকলে ঐ বন্ধনের বালাই নেই। এর যে একটা আকর্ষণী শক্তি রয়েছে তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

যাইহোক, ঐ জাতীয় লেখকদের সংখ্যা বেশি নয়, ভারতীয় ভাষাগুলিতে তো নয়ই। ভারতীয় ভাষাসমূহে যে কল্পবিজ্ঞান কাহিনী রচিত হয় তার অধিকাংশই স্টার্জিয়ন-এর সংজ্ঞার অনুসারী। দেখা যায় যে লেখার সময় এঁরা মনে রাখেন যে

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগগতির কোনো বিষয়ের সঠিক বর্ণনার সময়েও তা করতে হবে কাহিনীর মাধ্যমে। এবং সেই কাহিনীর ক্ষেত্রে মূলত থাকবে মানুষ।

এই সংকলনটির জন্য গল্প নির্বাচনের সময়েও যে নিয়মাবলী অনুসরণ করা হয়েছে তা স্থিরীকৃত হয়েছে পূর্ববর্ণিত ঐ বিশেষত্বের মাধ্যমে যা ভারতীয় কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়। ঐ বিশেষত্বকে অবজ্ঞা করাটা ভাল তো হতই না, উপরন্তু সংকলনটি প্রতিনিধিত্বমূলক হয়ে উঠতে ব্যর্থ হত।

চারটি স্পষ্ট ও পৃথক পর্যায়ে কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের বিবর্তন ঘটেছে বলে মনে করা হয়। ধারাটির নির্দিষ্ট জন্মলগ্ন নিয়ে কিন্তু বিতর্ক রয়েছে। কারো কারো মতে বাবিলনীয় গিলগামেশের মহাকাব্যের মধ্য দিয়ে ধারাটির জন্ম। সভ্যতার উষালগ্নের কতিপয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে এই ধারার উৎপত্তি খোঁজার অবশ্যই একটি প্রলোভন রয়েছে। অনুরূপ চিন্তা-ভাবনা ও যুক্তির সাহায্যেই এদেশেও যেমন একদল ব্যক্তি বলে থাকেন যে 'বেদ'-এর মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নাকি সবকিছুরই সন্ধান পাওয়া যায়।

পক্ষপাতহীন ও যৌক্তিক বিশ্লেষণের ফলে মোটের ওপর বর্তমানে এই মতৈক্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে যে মেরি শেলি রচিত ধ্রুপদী গথিক রচনা 'ফ্রাঙ্কেনস্টেইন' হচ্ছে প্রথম কল্পবিজ্ঞান গল্প। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ফ্রাঙ্কেনস্টেইন হল ঐ গল্পে এক বিজ্ঞানীর নাম যাঁর পরীক্ষার ফলে অনিচ্ছাসত্ত্বেই এক অশুভ দানব সৃষ্ট হয়েছিল। যাইহোক, ঐ বিজ্ঞানী এবং সেই ক্ষিপ্ত দানবের নাম মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সর্ববিধ মানবিক প্রচেষ্টার ওপরে বিজ্ঞান যে দৈত্যের মত বিশাল ছায়া ফেলেছে তার মধ্যে কোনো অন্ধ অশুভ লুকিয়ে রয়েছে বলে মানবজাতির আশঙ্কা রয়েছে। ঐ আশঙ্কার বশেই যেন মানুষ ফ্রাঙ্কেনস্টেইন বলতে ঐ দানবকে বোঝে। ভয়জনিত এই ভ্রান্তি যেন ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আপাতদৃষ্টিতে যতই ভয়ঙ্কর বলে লাগুক না কেন মেরি শেলির গল্পের অন্তর্নিহিত স্রোতটি ছিল দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারের। এই ব্যাপারটিই প্রাক-কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য বা আদিম কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এমনি ধারা প্রবহমান ছিল এই শতকের তৃতীয় বা চতুর্থ দশক পর্যন্ত তো বটেই। আসিমভ, হেইনলেইন ও আর্থর ক্লার্কের মত লেখকদের সহায়তায় জন ক্যাম্পবেল যখন রহস্য রোমাঞ্চ পত্রিকাগুলিতে এক রূপান্তর আনলেন তখন ঐ প্রবণতার অপহ্নব শুরু হল।

গের্ণসব্যাক এবং স্বয়ং ক্যাম্পবেল প্রদত্ত কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর সংজ্ঞার প্রভাবেই নিঃসন্দেহে সাহিত্যের এই ধারাটি দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়। এ সময়ে যে প্রাণবন্ত

কল্পবিজ্ঞান কাহিনী রচিত হয়েছিল তার পেছনে স্বাভাবিকভাবেই চালিকা শক্তি ছিল বিজ্ঞান। বিজ্ঞান ও কাহিনীর মধ্যে ক্ষুরধার এক বিভাজন রেখার ওপর দিয়ে চলার উল্লেখযোগ্য দক্ষতা ঐ পর্যায়ের সাহিত্যে লক্ষণীয়। অর্থাৎ কিনা মূলগতভাবে বন্ধনমুক্ত, নৈর্ব্যক্তিক ও উন্মত্তভাবে যুক্তিপ্রেমী বিজ্ঞান ও স্বপ্নবিলাসী, আবেগপূর্ণ ও প্রায়শই যুক্তিরহিত কাহিনীর মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানো আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। যাইহোক, যেহেতু মূল লক্ষ্য ছিল প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান এবং তার সম্ভাব্য ভবিষ্যত অগ্রগতির ব্যাখ্যা ও প্রচার তাই ঐ বন্ধন ঘটাতে বেগ পেতে হয়নি। প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের মাধ্যমে একদিকে কঠোরভাবে যুক্তিবাদ মেনে, অন্যদিকে ভবিষ্যতের রূপরেখা বর্ণনায় কল্পনার উড়ালকে বাধাহীন করে তুলে এক সুসমঞ্জস সঙ্গতিপূর্ণ মিশ্রণ তৈরি করা সম্ভবপর হয়েছিল। এই যুগটিকে এখনও অনেকে 'কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর স্বর্ণযুগ' বলে বর্ণনা করেন কারণ বনেদী কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের কিছু কালজয়ী রচনা তখন রচিত হয়েছিল।

এই কাহিনীগুলি এমনই রসনীয় মায়াবিস্তারে সফল যে এর প্রভাব অপ্রতিরোধ্য হয়ে থেকে যেত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিশ্বসংসার সম্বন্ধে মানুষের কল্পমূর্তি চিরদিনের মত পাল্টে গেল। হিরোসিমা ও নাগাসাকির আকাশ যে ছত্রাকার মেঘ আবৃত করেছিল তা মানবজাতির নিরাপত্তাবোধকে ছত্রখান করে দিল। মানুষ এই প্রথম স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করল যে বিজ্ঞান হিংস্রভাবে তার সামাজিক কাঠামো-বিন্যাস ও মূল্যবোধকে পরিবর্তিত করার শক্তি ধরে। বিজ্ঞান আর নিছক জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টা ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে জয়লাভ করার মঙ্গলময় প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত থাকল না। এর সঙ্গে যুক্ত হল বাস্তবিক এক ফ্রাঙ্কেনস্টেইন, যে মানুষ বা মনুষ্যসদৃশ, যার স্রষ্টা বিজ্ঞান এবং যে নিজে লাগামছাড়া ধ্বংসে মেতে উঠতে পারে। একদিক দিয়ে, এর ফলে মানুষের বীক্ষা প্রসারলাভ করল। দেখা গেল যে এতদিন যে সংকীর্ণ আঞ্চলিক বা জাতিগত সীমানা সমাজকে পৃথকীকরণের মাধ্যমে চিহ্নিত করেছিল তা হয় কল্পনাপ্রসূত নতুবা নেহাৎই কৃত্রিম। মহাবিশ্বে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে ভাবিত হতে মানুষ বাধ্য হল।

দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন স্বভাবতই কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর মধ্যেও প্রতিফলিত হল। এটি হল কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর বিবর্তনের তৃতীয় পর্যায়। তার শেকড় কিন্তু প্রোথিত ছিল বনেদী কল্পবিজ্ঞানের মাটিতে। কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনুভূত বোধগুলির জায়গায় সামাজিক বিষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রাধান্য বিস্তার করল। আগে গুরুত্ব পেত বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা। এবার শুরু হল বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সম্ভাব্য ফল-পরিণাম এবং সামগ্রিকভাবে মানব সমাজের ওপরে তার প্রভাব নিয়ে অনুসন্ধান।

তৃতীয় পর্যায়ের এই বিকাশ কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর জনপ্রিয়তা আরও ছড়িয়ে দিল। তখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র ও উদারপন্থী চিন্তাভাবনার প্রাধান্য ছিল বেশি। পাঠকদের কাছে এই কাহিনী আর কল্পনার উড়াল থাকল না, হয়ে উঠল সম্ভাব্য বা প্রায় সত্য বাস্তবতা। ফলে দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা কমে গেল—কল্পবিজ্ঞান কাহিনী যেন পাঠকদের আরও নিজের, আরও সমীপবর্তী হয়ে উঠল। এক একসময় অস্বস্তিকরভাবে নিকট। যুগপৎভাবে বিশুদ্ধতাবাদীরাও তৃপ্ত হলেন কারণ এই সাহিত্য ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মনে বিজ্ঞানসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আগ্রহ বাড়িয়ে তুলেছিল।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নতুন ও অভিনব অগ্রগতি সম্বন্ধে মুগ্ধতার কারণে কেউ কেউ আকৃষ্ট হল। অন্যদের আশঙ্কা ছিল যে এই অগ্রগতি ভুল লোকের হাতে ধ্বংসাত্মক এক ঘটনা-পরম্পরার সৃষ্টি করতে পারে।

কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর প্রকাশধারার এই পরিবর্তন যেমন তাকে স্থায়ী ও অনন্য এক অবস্থানে অধিষ্ঠিত করল তেমন এর নতুন নতুন শাখা প্রশাখারও বিস্তার ঘটতে থাকল। চতুর্থ ও চূড়ান্ত পর্যায়ের কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর পৌঁছনর জন্য প্রয়োজন ছিল সময়ের। সাহিত্যের যে কোনো ধারাই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে এমন একটা সময় আসে যখন এর রচয়িতা, সমালোচক ও পাঠকরা বিষয়বস্তুর তুলনায় আঙ্গিক ও শৈলীর ওপরে বেশি করে জোর দেন। ষাট দশকের শেষ পর্বে শৈলী প্রাধান্যমূলক এই চতুর্থ ধারাটির আবির্ভাব যা কল্পবিজ্ঞানকে বনেদী ধারা থেকে উচ্চতর স্তরে অথচ স্বক্ষেত্র থেকে দূরে নিয়ে গেছে। মার্কিন ও ইউরোপীয় জগতে এই ধারাটিরই প্রাধান্য রয়েছে। অবশ্য বলতেই হবে যে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সঙ্গে এর সম্পর্কসূত্র খুবই ক্ষীণ এবং একে বনেদী ধারার তুলনায় চলতি, আধুনিক ধারা বলা যায়।

ভারতীয় কল্পবিজ্ঞান কাহিনীও ঐ একই পর্যায়গুলির মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্যের এই ধারাটির প্রথম আবির্ভাব এই শতাব্দীর গোড়ায়। বাংলা ভাষায় প্রথম কল্পবিজ্ঞান কাহিনী রচনার কৃতিত্ব স্বনামধন্য জগদীশ চন্দ্র বসুর। গল্পটি 1897 সালে প্রকাশিত হয় এবং এতে প্রায় আজগুবি একটি ব্যাপার ছিল—কিভাবে এক বোতল কেশতৈল সমুদ্রে ঢেলে আসন্ন ঘূর্ণিবাতকে প্রশমিত করা গেল। সমুদ্রশাসনের এই গল্পটির মধ্যে কিন্তু কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর মূল বৈশিষ্টটি বিদ্যমান—অর্থাৎ কাহিনীর আকারে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তিতে এখানে একটি আপাত দুরূহ ঘটনার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মারাঠী ভাষাতেও প্রায় একই সময়ে প্রথম কল্পবিজ্ঞান কাহিনী প্রকাশিত হয়। এস. বি. রাণাডে রচিত 'তারেচে হাস্য' এবং নাথ মাধব রচিত উপন্যাস 'শ্রীনিবাস রাও' প্রায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। 'কেরালা

কোসিল' পত্রিকায় জুল ভের্নের 'চাঁদে অভিযান'-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা গেছে।

ভের্ন, ওয়েলস এবং সমগোত্রীয়দের এইসব অনুবাদ হল সম্পূর্ণরূপে প্রথম পর্যায়ের কল্পবিজ্ঞান কাহিনী যাতে অ্যাডভেঞ্চার-এর প্রাধান্য ছিল। ষাট দশকের শেষ এবং সত্তর দশকের গোড়ার দিক অবধি পাঠকরা এইসবই প্রধানত পড়ত। কাহিনীর অন্যান্য ধারা যেহেতু এর মধ্যে বিস্ময়করভাবে শৈলীর দিক থেকে বহুমুখী হয়ে উঠেছিল তাই কল্পবিজ্ঞান কাহিনীকে রূপকথার দলে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, কিশোর বা শিশুসাহিত্য বলে একে এলেবেলে মনে করা হত। বাংলায় সত্যজিৎ রায় এবং মারাঠী ভাষায় ডি. পি. ঘাম্বেটে এবং নারায়ণ ধারাপ-এর মত ব্যক্তিরা নিয়মিত কল্পবিজ্ঞান গল্প রচনা করলেও ধারাটি জাতে উঠতে সক্ষম হয়নি।

সত্তর দশক অবধি এই পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল। এই সময়েই ভারতীয় কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর পুনর্জন্ম ঘটে। সরাসরি এক লাফে ভারতীয় কল্পবিজ্ঞান কাহিনী দ্বিতীয় পর্যায়ে ও দ্রুত তৃতীয় পর্যায়েও পৌঁছে গেল। এই পুনর্জন্ম ঘটার পেছনে একাধিক কারণ ছিল।

এতদিনে বিজ্ঞান শেখাবার শিল্পটিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। ফলস্বরূপ, সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞানের কথা সহজভাবে পৌঁছে দেবার জন্য সব কটি ভারতীয় ভাষায় রচিত নানা প্রবন্ধ এমন সাহিত্য-রূপ গ্রহণ করল যা বিগত বছরগুলিতে প্রকৃত প্রস্তাবে উপন্যাস পদবাচ্য বলে বিবেচিত হত। দেখা গেল যে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য রচিত প্রবন্ধগুলি গল্প, নাটিকা বা সাহিত্যিক প্রবন্ধের রূপেও প্রকাশিত হচ্ছে। একইভাবে কোনো বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের ঘটনাবলীও ছোটগল্পের আকারে রচিত হতে লাগল যার চরিত্রগুলিতে দেখা গেল স্বয়ং বিজ্ঞানীরাই রয়েছেন। ভুল করে কখনও অনুরূপ কাহিনীকে কল্পবিজ্ঞানের বলেও মনে করা হয়েছে। সব ভাষাতেই এই জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে এবং এখনও ঘটে চলেছে। কিন্তু এর রচয়িতা বা সমালোচক ও পাঠকরা একে কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য বলে মনে করেন না। কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর কোনো প্রতিসন্ধিমূলক সংকলনে এর স্থান হতে পারে না। তাই এই সংকলনেও ঐ জাতীয় রচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

10+2+3 ধাঁচের শিক্ষাক্রমের ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞানের যে নতুন পাঠক্রম প্রবর্তিত হল তাতে বিজ্ঞান ও গণিত মুখ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করল। নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট না করে বিজ্ঞান ও গণিতকে দূরে ঠেলে রাখার উপায় আর থাকল না। ফলে দশম শ্রেণীর পরেও যদি নাই হয় তবু অন্তত ঐ স্তর পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষা নিতান্ত জরুরী হয়ে দাঁড়াল। এই ঘটনা এবং তৎসহ ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম, বিশেষত টেলিভিশনের

ব্যাপক অনুপ্রবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে সাধারণ চেতনাকে দ্রুত বিকশিত করে তুলল এবং এইভাবে কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর এক সফল পুনঃজাগরণের পথ প্রশস্ত হয়ে উঠল।

এই সময়েই বহু সুপরিচিত লেখক বা খ্যাতনামা বিজ্ঞানীও কল্পবিজ্ঞান কাহিনী রচনায় এগিয়ে এলেন। মারাঠী ভাষায় কল্পবিজ্ঞান কাহিনী লেখার পথিকৃৎ হলেন স্যার ফ্রেড হয়েলের শিষ্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোর্তিবস্তুবিজ্ঞানী জয়ন্ত নারলিকার। স্যার হয়েলও কল্পবিজ্ঞান কাহিনী রচনা করেছেন। এরপর দেখা গেল যে বহু সম্মানিত পত্র-পত্রিকা নিয়মিত কল্পবিজ্ঞান কাহিনীকে স্থান দিতে লাগল অথচ এতদিন সাহিত্যের এই ধারাটিকে অবজ্ঞাই করা হত। কল্পবিজ্ঞান কাহিনী এইভাবে সম্মানিত হবার ফলে অনেকেই এর চর্চায় ব্রতী হয়ে উঠলেন। এই ঘটনার ফলে মারাঠী ভাষার কল্পবিজ্ঞান কাহিনী শক্ত শিকড়ের সাহায্যে মাটি ধরে থেকে আজ এক বলিষ্ঠ বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। অনুরূপ ঘটনাই বাংলা সাহিত্য জগতে ঝড় তোলে এবং এই ভাষায় কল্পবিজ্ঞান কাহিনী প্রতিষ্ঠালাভ করে। এটিই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি অন্যান্য ভাষায় ক্ষেত্রেও ঘটেছিল।

আধুনিক ভারতীয় কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর অধিকাংশই দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ের। অতএব তা বনেদী ঘরানারই অনুগামী। একেবারে হালে মনে হয় তৃতীয় পর্যায়টিরই প্রাধান্য চলছে। এটি একটি ঘটনা যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আজ মানুষের প্রচেষ্টা, ব্যবহার ও সম্পর্কের বিভিন্ন দিকে পরিবর্তন আনছে। অথচ এই সেদিনও মনে করা হত যে এগুলি চিরদিন অটুটই থাকবে। এর ফলে যে গঠন-বিন্যাস ও সামাজিক রূপের সৃষ্টি হচ্ছে তার সম্ভব ও সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা ও উদ্বেল কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হচ্ছে। সাহিত্যের অন্য কোনো ধারায় এজাতীয় তত্ত্ব উপস্থিত করার সুযোগ নেই।

ভারতীয় কল্পবিজ্ঞান-সাহিত্যজগতে আজ কেন সামাজিক তাৎপর্যবিশিষ্ট কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর প্রাধান্য রয়েছে তার আর একটি কারণ রয়েছে। জীবন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, বিশেষ করে মানব জীববিদ্যা এবং তার ঘনিষ্ট জ্ঞাতি জৈব-প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে মানুষ আজ এমন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে যে সে জীবনকে সৃষ্টি করতে, রূপ দিতে ও পরিবর্তিত করতে পারবে। এর ফলস্বরূপ সমাজের কাঠামো ও ক্রিয়া এবং তৎসহ তার প্রাণশক্তি যে নৈতিক ও ব্যবহারিক নীতি তাও আমূল পাল্টে যেতে পারে। ঈশ্বরের ভূমিকায় মানুষের অবতীর্ণ হওয়ার এই চিন্তা এখন বিপদেরও সৃষ্টি করেছে যে ব্যক্তিক সম্পর্কের চরিত্রও এমন রূপ নিতে পারে যা একেবারেই অজানা। এমনকি এতদিন যে বিষয় ও ঘটনাগুলিকে কঠোরভাবে ব্যক্তিগত ও গোপনীয় মনে করা হত তার ওপরে হয়তো ব্যক্তি-মানুষের কোনো

নিয়ন্ত্রণ আর থাকবে না, সেগুলির ক্ষেত্রে তার কোনো বক্তব্যই হয়তো আর খাটবে না। এই ব্যাপারে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা আজ ভারতীয় কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর এক ব্যাপক অংশের মূল বিষয়। এই বনেদী কল্পবিজ্ঞান কাহিনী হল এখনও মনুষ্যকেন্দ্রিক যার বিষয় হল বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন এবং মানবিক ভাবানুভূতি বা সামাজিক ভিত্তির আন্তঃক্রিয়া। এটা খুবই স্বাভাবিক যে প্রতিনিধিত্বমূলক ভারতীয় কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর একটি সংকলনের মূল অংশ জুড়ে থাকবে অনুরূপ কাহিনী।

বেশিরভাগ ভারতীয় কল্পবিজ্ঞান কাহিনী ঐ সাহিত্যের বিবর্তনের দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে এই কাহিনী একটি স্বকীয় চরিত্র অর্জন করেছে যা অনন্য। এই কল্পবিজ্ঞান কাহিনীকে ইউরোপীয় ও মার্কিন কাহিনীর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং ভারতীয় বলা সঙ্গত। অন্যভাবে বললে এই দেশের কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর ভারতীয়তা ভৌগোলিক কারণের ওপরে নির্ভরশীল নয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেষ্টন থেকেই তার অন্তরাত্মা গড়ে উঠেছে।

প্রথম পর্যায়ের কল্পবিজ্ঞান কাহিনী অ্যাডভেঞ্চার নির্ভর বলে যে জনসমাজে তার উৎপত্তি তার ওপরে নির্ভরশীল নয়। সে যে গোষ্ঠীরই মানুষ হোক না কেন তার অ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্নগুলি একই রকম। লেখক ও পাঠক যে জীবন বা সামাজিক কাঠামো থেকে এসেছেন তার আশা-আকাঙ্খা ও বিশিষ্ট ধারা ঐ কাহিনীতে ধরা পড়ে না।

দ্বিতীয় এবং বিশেষ করে তৃতীয় পর্যায়ের কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর ক্ষেত্রে কিন্তু এমনটি হয় না। দ্বিতীয় পর্যায়ের কল্পবিজ্ঞান কাহিনী বিজ্ঞান বা আরও নির্দিষ্টভাবে বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করার ঐকান্তিক তাগিদের দ্বারা আচ্ছন্ন হলেও এর রচয়িতা পাঠকের সাংস্কৃতিক ও ভাবগত দিকটির ব্যাখ্যার উপেক্ষা করতে পারে না। বিশেষত কাহিনী এবং তার ছক নিয়ে বিশেষভাবে ভাবতে হয় কারণ সঠিক যদি কাহিনীর চরিত্রগুলির সঙ্গে একাত্মতা বোধ না করে তাহলে কাহিনীর আবেদনে ঘাটতি পড়ে।

বিজ্ঞান হয়তো সর্বজনীন। হয়তো কেন, অবশ্যই সর্বজনীন ও বিশ্বব্যাপী। প্রকৃতির সূত্রগুলি মহাবিশ্বের সর্বত্রই সমভাবে প্রযোজ্য। ভৌত বা বাস্তব জগতের কথাই শুধু ভাবলে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের অভিঘাত একই থাকে। কিন্তু যখন মানসিক গুণাবলী, প্রতিক্রিয়া ও ভাবানুভূতির ওপরে ঐ অভিঘাতের ফলাফল চিত্রিত করার চেষ্টা করা হয় তখন দেখা যায় যে ব্যক্তিকে ঘিরে যে সাংস্কৃতিক বুনোট রয়েছে পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে তার ওপর নির্ভরশীল। কৃত্রিম উপায়ে মাতৃত্ব অর্জনের ব্যাপারটি এই সেদিনও অশ্রুতপূর্ব ছিল এবং জীববিজ্ঞানের অগ্রগতি বর্তমানে ব্যাপারটি চালু করেছে। উক্ত ব্যাপারটির সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া

কখনোই সর্বত্র একরকম হতে পারে না। এবং তা একরকম নয়ও। মানুষের কথ্যভাষা যেমন বলা হয় যে কুড়ি কিলোমিটার পেরলেই পাল্টে যায় তেমন ঐ প্রতিক্রিয়াও স্থানান্তরে ভিন্নরূপ নেয়। যে যেমন সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন তেমন ভাবেই যে ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকা তুষারযুগ বা 'পারমাণবিক শীত'-এর মত ঘটনাগুলিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখবে। তাই পৃথিবীর ভারত নামক অংশটুকু বলতে যা বোঝায় তার ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক সীমান্তঘেরা জায়গার কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যকে ভারতীয় কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য বলে অভিহিত করা যথার্থ হবে না।

এমনকি ব্যাপকভাবে ভারতীয় কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর মধ্যেও দেখা যায় যে মারাঠী কল্পবিজ্ঞান কাহিনী বাংলা কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর মতো নয় যা আবার তামিল কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর থেকে ভিন্ন। এর কারণ হল যে বিভিন্ন ভাষার ধারাটির বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঘটেছে এবং সব ভাষায় এই ধারা মর্যাদার সমান আসনে আসীন নয়।

পরিমাণগত ও গুণগত, উভয় দিক দিয়েই দেখা যায় যে মারাঠী ভাষায় কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের স্রোত সবচেয়ে বেগবান। এই ভাষায় কল্পবিজ্ঞান কাহিনী শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং অচিরেই তা একটি শক্তিশালী ধারায় পরিণত হবে। পঞ্চাশ দশকে মারাঠীতে কল্পবিজ্ঞান কাহিনী নিয়মিত প্রকাশিত হতে শুরু করে। অবধারিত ভাবে এই ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপটি ছিল ভের্ন এবং ওয়েলসের 'অদৃশ্য মানুষ' এবং 'আশি দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ'-এর মতো ধ্রুপদী কাহিনীর ভাবানুবাদ। স্থানীয় মেজাজ, বাক্-ধারা ও প্রকাশভঙ্গির ছোঁয়া লাগিয়ে ও দক্ষতার সঙ্গে কিছু সংযোজন ঘটিয়ে এগুলিকে আরও হৃদয়গ্রাহী করে তোলা হয়েছিল।

এই প্রাচীন ধ্রুপদী সৃষ্টিগুলি কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর প্রাথমিক, অ্যাডভেঞ্চার নির্ভর পর্যায়ের হওয়ার কারণে ছোটদের সাহিত্য বলে একে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল যদিও সব বয়সের পাঠকই এগুলির গুণগ্রাহী ছিল। ষাট ও সত্তর দশকে যখন প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য চিন্তাসমৃদ্ধ দ্বিতীয় পর্যায়ের কল্পবিজ্ঞান কাহিনী প্রকাশিত হতে লাগল তখনও সমালোচকদের দুর্ভাগ্যজনক মনোভাব ও মারাঠী সাহিত্যের ভাগ্যনিয়ন্ত্রাদের তাচ্ছিল্যের ফলে এই সাহিত্যকে নামগোত্রহীন অনাহুত বলে মনে করা হত। সেদিন প্রথাবিরোধী পত্রিকা 'নাভাল'-এর মাধ্যমে সংবেদনশীল প্রতিভা অনন্ত অন্তরকার যদি নিয়মিত, নিরবচ্ছিন্ন ও স্নেহময় বাস্তব সমর্থন ও সহয়তা না করতেন তাহলে অবশ্যই সাহিত্যের এই ধারাটির অকালমৃত্যু ঘটত। যর্থাথই অনন্ত অন্তরকারকে ভারতের জন ক্যাম্পবেল বলে অভিহিত করা যায়।

সত্তর দশকের শেষাংশ অবধি এই পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। এই সময়েই জয়ন্ত নারলিকার এই ধারায় লিখতে শুরু করেন। এর ফলে কল্পবিজ্ঞান কাহিনী বহু

প্রতীক্ষিত মর্যাদাটি অর্জন করল। লেখক হিসেবে নারলিকারের যোগদান এবং মারাঠী বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত বার্ষিক কল্পবিজ্ঞান রচনা প্রতিযোগিতা এই ধারার পৃষ্ঠপোষকতায় এক বিশাল ভূমিকা গ্রহণ করে। লেখকদের এক প্রমুখ ঐ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে আসেন। আজকের মারাঠী কল্পবিজ্ঞান কাহিনীকারদের অনেকেই অতীতে ঐ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছিলেন।

কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের মারাঠী স্রোতটিকে আর পিছনপানে তাকাতে হয়নি। বহুসংখ্যক লেখক নিয়মিত কল্পবিজ্ঞান কাহিনী রচনা করে আসছেন। একদল নবাগত প্রতিভাবান মঞ্চের পাশে অপেক্ষামান। তাঁদের লক্ষ্য মঞ্চের কেন্দ্রীয় স্থানটির দখল নেওয়া। বিভিন্ন সম্মানিত পত্রিকার দীপাবলী সংখ্যায় কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর জন্য স্থান বরাদ্দ থাকে। এই উপলক্ষে, বছরে, অন্তত পঞ্চাশটি নতুন ছোট গল্প প্রকাশিত হয়। বহু পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস এবং সংকলন কিনতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে কিছু কিছু অন্য ভাষাতেও অনুবাদ করা হয়েছে। ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে নিঃসন্দেহে মারাঠী ভাষাতেই কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর ধারাটি সবচেয়ে শক্তিশালী।

অন্যান্য ভাষাতেও কল্পবিজ্ঞান রচনা প্রায় একইভাবে শুরু হয়েছিল। তবে তার পরবর্তী বিকাশ গতি বা ব্যপ্তির দিক দিয়ে মারাঠী ভাষার মত না। উদাহরণস্বরূপ, বাংলার এই ধারার প্রথম দিকের লেখকদের মধ্যে প্রবাদপ্রতিম সত্যজিৎ রায় থাকলেও ধারাটি যথেষ্ট বিকশিত হয়নি। সুপরিচিত গ্রন্থসমালোচক অরুণা সিংহের মতে, 'অনুবাদ এবং কখনও চোখে পড়া ব্যঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যে ধারাটি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।' তাঁর প্রথম দিকের রচনার মতই সত্যজিৎ রায় যদি রসনীয় কল্পবিজ্ঞান কাহিনী লিখে যেতেন তাহলে পরিস্থিতি হয়ত ভিন্নতর হত। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর পরবর্তী কালের রচনায় দেখা যায় যে তিনি পিছনপানে চাইছেন এবং তাঁর রচনায় কল্পবিজ্ঞানের প্রথম পর্যায় ফিরে আসছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি অ্যাডভেঞ্চারকে প্রধান করে তুলে বিজ্ঞানকে পিছনের সারিতে বসিয়েছিলেন।'

অন্যান্য বেশ কিছু লেখক এই রচনা সৃষ্টি করতে গিয়ে আজগুবি বা অপ-বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছিলেন যা প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে। অন্যদিকে দেখা যায় যে বিজ্ঞানের বিষয়টি যেখানে চিত্তাকর্ষক সেখানে কাহিনীটি দুর্বল বা আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদিত 'ফ্যানটাসটিক' পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার ফলে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়—সম্পূর্ণরূপে কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর প্রতি নিবেদিত এই পত্রিকাটির সম্পাদকও ঐ ধারার একজন উল্লেখযোগ্য লেখক। বাংলা কল্পবিজ্ঞান রচনার একটি সদর্থক দিক হল মূলধারার সাহিত্যের বেশ কিছু খ্যাতনামা লেখক কল্পবিজ্ঞান কাহিনী রচনায় এগিয়ে এসেছেন। এর ফলে

ধারাটি কতিপয় লেখকের নিয়মিত রচনার মাধ্যমে জীবিত রয়েছে। অবশ্য তা মারাঠী ভাষার মতো প্রাণবন্ত রূপ পায়নি।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার প্রচেষ্টা ও গণবিজ্ঞান আন্দোলন বেশ শক্তিশালী। এর ফলে বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু তার জন্য সবসময় কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যে উন্নতি ঘটেনি। যেমন 'কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ'-এর মত লোকপ্রিয় সংগঠন খুব কমই রয়েছে কিন্তু রাজ্যের প্রধান ভাষা, মালয়ালাম-এ বলতে গেলে কোনো কল্পবিজ্ঞান কাহিনীই রচিত হয় না। চ. রাধাকৃষ্ণান-এর মতে 'কেরালার লেখক সমবায় প্রতিদিন এক দশমিক পাঁচটি বই প্রকাশ করে এবং অন্যান্য প্রকাশকরাও অনুরূপ সংখ্যক বই প্রকাশ করে। এই প্রকাশনার দুই-তৃতীয়াংশ হল কাহিনীমূলক গদ্য কিন্তু এর দশমিক এক শতাংশও কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য নয়।'

অন্যান্য ভাষায় কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের পরিস্থিতি সম্ভবত মালয়ালাম-এর মতো হতাশাব্যঞ্জক নয়। তবুও দেখা যায় যে মুষ্টিমেয় নিবেদিতপ্রাণ লেখক এই সাহিত্য রচনা করে চলেছেন। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে দেখা গেছে যে মারাঠী ভাষার বেগমান ধারার সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য এই সব দুর্বল শাখানদীগুলি তাদের ধারাপ্রবাহ বজায় রেখেছে। এর ফলে যে মহানদীর সৃষ্টি হবে নিঃসন্দেহে তা শক্তিশালী প্রবাহের অধিকারী হবে।

এখন প্রয়োজন হল ভারতের কল্পবিজ্ঞান কাহিনী ও বিশ্বের এই ধারার রচনার মধ্যে যোগাযোগ যার থেকে উভয়েই আদান-প্রদানের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারবে। তারজন্য আমাদের ভারতীয় কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যটিকে সামগ্রিকভাবে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করতে হবে এবং এর শক্তিশালী দিকগুলিকে স্বীকৃতি জানাবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলতার দিকগুলিকেও চিহ্নিত করতে হবে। আশা করি যে বর্তমান সংকলনটি সেই বহু-প্রত্যাশিত আন্তঃক্রিয়াকে সম্ভব করে তোলার ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে।

বাল ফোণ্ডকে

তুষারযুগ আসছে

জয়ন্ত ভি. নারলিকার

'বাবা! বাবা! শীগ্‌গীর ওঠো! ওঠো না বলছি! একবার বাইরে তাকাও, কত বরফ! কি মজা! কি মজা!'

ছেলেমেয়েদের হট্টগোলে সকালের গাঢ় ঘুমটা ভেঙে গেল রাজীব শাহের। কি নিয়ে এত হৈচৈ সেটা সে প্রথমে বুঝতেই পারেনি। কি এমন ঘটলো যে কবিতা আর প্রমোদ এত উত্তেজিত?

কবিতার প্রশ্ন, 'বাবা, আমরা নিচে নেমে বরফের মধ্যে খেলব?'

বরফ! বোম্বাইতে বরফ? এও কি সম্ভব? ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে রাজীব জানালার বাইরে তাকালো। দৃশ্যটি অভিভূত হওয়ারই মত। বরফ পড়েছে। বাড়িগুলোর ফাঁকে ফাঁকে সাদা তুষারের গালিচা বিছানো। রাজীব সহসা অনুভব করল কি ভয়ঙ্কর শীত। কবিতা, প্রমোদ একটা করে সোয়েটার পরে নিয়েছে। আর গরম জামা তারা খুঁজে পায়নি। বোম্বাইতে লোকের আবার গরম জামাকাপড় লাগে নাকি? গত বছর উটিতে বেড়াতে গিয়ে এই সোয়েটার দুটো যখন কেনা হয়েছিল তখন কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে এগুলোর এভাবে দরকার পড়বে।

শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে রাজীব প্রথমে ওদের বলেছিল, 'না, না। নিচে বরফের মধ্যে যাসনা।' কিন্তু গরম একটা শাল নিজের গায়ে জড়াতে জড়াতে মনটা নরম হল রাজীবের। 'তার চেয়ে বরং, চল্, আমরা সবাই ছাদে যাই। কিন্তু তার আগে তোরা জুতো মোজা পরে নে।'

প্রমোদ আর কবিতা হৈ হৈ করতে করতে ছাদে উঠে গেল। সেই অবসরে আরও মোটা একটা চাদর আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে নিল রাজীব। একটা হিটার থাকলে কি ভালই না হত! এই হিমশীতল ঘরে একটা কয়লার উনুন জ্বললেও যেন বাঁচা যেত।

গত সপ্তাহ থেকেই আবহাওয়াটা পাল্টাতে শুরু করেছিল। তাপমাত্রা কমতে

কমতে শেষে এই তুষারপাত। বোম্বাই-এর লোকেরা ঠাণ্ডা এমনিতেই সহ্য করতে পারেনা। থার্মমিটারের পারা 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ছুলেই ত্রাহি ত্রাহি রব শুরু হয়ে যায়। গতকাল দিনের বেলায় তাপমাত্রা 5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছেছিল, রাতে নেমে দাঁড়িয়েছিল শূন্য ডিগ্রিতে। কেউই ভাবতে পারেনি যে আবহাওয়ায় এত ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে। নাম করা সব আবহাওয়াবিদদের মুখে অবধি কথা সরছে না। সকলের মনে একটাই প্রশ্ন—এরপর?

ছাদ থেকে প্রমোদের গলা ভেসে এল, 'বাবা, উঠে এস।' ফ্ল্যাট বাড়িটার মালিকানা রাজীবদেরই। ওপরতলায় থাকার সুবাদে ছাদের সুবিধাও রাজীব ও তার পরিবারই ভোগ করত।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রাজীব বলল, 'আসছি আমি। তোরা বেশি ছুটোছুটি করিসনা। পেছল থাকতে পারে।' খোলা ছাদে আবার ঠাণ্ডা লেগে যাবে নাতো ওদের!

ছাদ থেকে দৃশ্যটি সত্যিই অপূর্ব। ঠিক যেন বড়দিনের কার্ডে ছাপানো ইউরোপের কোনো শহরের ছবি। কার সাধ্য আছে যে বলে এটাই ঘেমো ভ্যাপসা প্যাচপেচে গরমের শহর বোম্বাই? হিন্দু কলোনির রাস্তার দুপাশে সারিবদ্ধ গাছগুলো শুভ্র তুষারে আবৃত। বরফ রাস্তা আর ফুটপাথেও—লোকের ও গাড়ির পথচলার জন্য কোথাও কোথাও বরফ সরে গেছে। দূর থেকে তাই সেই জায়গাগুলো কালো ছোপের মত দেখাচ্ছে। দাদার স্টেশন ছাড়িয়ে চলে গেছে রেলপথ। কিন্তু কোনো ট্রেন আজ চলছে বলে মনে হচ্ছে না।

রাজীব মনে মনে বলছিল, 'বাজি ধরে বলতে পারি সেন্ট্রাল রেলওয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলেছে। আজকে অন্তত ওদের ট্রেন বন্ধ থাকার জন্যে কোনো অজুহাত খাড়া করতে হবে না। ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে কি ট্রেন চালাচ্ছে? কে জানে!' তখনই মন্থরগতিতে একটা লোকাল ট্রেন মাহিমের দিকে চলে গেল।

রাজীবের মন তখন পিছু হটতে হটতে চলে গেছে পাঁচ বছর আগের এক সন্ধ্যায়। রাজীব সেদিন একটা বাজী ধরেছিল। এক ধরেছিল এই জেনে যে হারতে সে কখনোই পারে না। বসন্ত চিটনিসের প্রশ্নটা এখনও কানে বাজছে, 'বলুন তো, বোম্বাইতে কি কখনও তুষারপাত হবে?'

রাজীবের জবাব, 'কস্মিনকালেও না।'

বসন্তের আত্মবিশ্বাসী প্রত্যুত্তর, 'আমার মতে কিন্তু দশ বছরের মধ্যেই বোম্বাইতে তুষারপাত হবে।'

শেষ অবধি সেটা ঘটলো—দশ নয়, পাঁচ বছরের মধ্যেই।

□

ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত একটি পার্টি দিয়েছিলেন। সেখানে অধ্যাপক বসন্ত চিটনিসের সঙ্গে রাজীব শাহ-র আলাপ। (বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করার জন্য অধ্যাপক চিটনিস, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন)। ওয়াশিংটন ডি.সি., মেরিল্যান্ড ও ভার্জিনিয়া থেকে কয়েকজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। সেইসঙ্গে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কয়েকজন সাংবাদিক। আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন সাংবাদিক রাজীব শাহ-ও।

বিজ্ঞান ও রাজনীতির নানা বিষয় নিয়ে মামুলি গল্পগুজব চলছিল। এরই মধ্যে, এককোণে, চুপচাপ দলছুট হয়ে বসেছিলেন বসন্ত চিটনিস। পার্টি ও আনুষঙ্গিক হাল্কা আলাপ আলোচনার দুনিয়ায় কোনোদিনই বসন্ত নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। এমন সময়...

...হন্তদন্ত হয়ে এক সাংবাদিকের প্রবেশ। তিনি সবিশেষ উত্তেজিত, 'এইমাত্র টেলিপ্রিন্টারে খবর এল যে ভিসুভিয়াসে আবার অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে!'

খবরটা শুনে রাজীব বসন্তকে বলেছিল, 'হায় কপাল! এই নিয়ে তিন মাসের মধ্যে পর পর চারটে আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত ঘটলো। ব্যাপার স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবীর পরিপাকক্রিয়াটি ঠিকঠাক চলছে না। আপনি কি বলেন?'

বসন্ত বলেছিলেন, 'আমি তো মনে করি পৃথিবীর ভেতরে যা ঘটছে সেটার থেকে বরং বাইরের ব্যাপারটা যতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত সেটা আমরা দেখছিনা।'

রাজীবের প্রশ্ন, 'মানে, আপনি সঠিক কি বলতে চান?' মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক বলেছিলেন, 'ব্যাপারটা আর একটু খুলেই বলুননা অধ্যাপক চিটনিস!'

বসন্তের কণ্ঠস্বর বেশ গম্ভীর, 'আমি বোঝাতে চেষ্টা করছি। একটা আগ্নেয়গিরিতে যখন অগ্ন্যুৎপাত ঘটে তখন জ্বালামুখ দিয়ে যেসব বস্তু ছিটকে বেরিয়ে আসে তার সবটা কিন্তু পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে না। এর মধ্যে কিছুটা অংশ বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। এখন দেখতে হবে যে কতটা আগ্নেয় পদার্থ বায়ুমণ্ডলে মিশেছে। কারণ, একটা নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়ালে এর ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য নড়চড় হয়ে যেতে পারে। আমার ভয় এইখানে যে ঐ নির্দিষ্ট মাত্রা হয়তো এখনও পার হয়নি কিন্তু পর পর অগ্ন্যুৎপাতের ফলে অবস্থাটা এখন মোটেই আর ভাল বলা চলে না।'

চিত্তাকর্ষক কোনো সংবাদের লোভে নোটবইটা বাগিয়ে ধরে একজন মার্কিন সাংবাদিক বসন্তকে বলেছিল, 'প্রকৃতির ভারসাম্য নড়চড় হয়ে যাবে বলছেন। কিন্তু মোদ্দা ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে এর ফলে?'

স্থিরদৃষ্টিতে চোখে চোখ রেখে বসন্ত বলেছিলেন, 'কি দাঁড়াবে? ওয়াশিংটন ডি.সি.-র থেকে আপনাদের রাজধানী সরিয়ে হনোলুলুতে হয়তো নিয়ে যেতে হবে।'

'কিন্তু কেন?' সাংবাদিক নাছোড়বান্দা।

বসন্ত হাসিমুখে বলেছিলেন, 'জানি, আপনাদের, মানে সাংবাদিকদের ধাঁধা জিনিষটা খুবই অপছন্দের। সহজ কথায় ব্যাপারটার মানে একটা ছোট মাপের তুষারযুগ যদি আসে তাহলে মার্কিন উত্তরাঞ্চলের এইসব শহর যেমন নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, এমনকি ওয়াশিংটন থেকেও আপনাদের অন্য কোথাও চলে যেতে হবে।'

বসন্ত বিষয়টি আরও ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারতেন কিন্তু মার্কিন বিদেশ দপ্তরের জনৈক গণ্যমান্য কর্তাব্যক্তি এসে পড়ায় আলোচনায় ছেদ পড়লো। শুরু হল আবার সেই মামুলি গল্পগুজব। রাজীব কিন্তু অধীর আগ্রহে বসন্তের কাছে ব্যাপারটা আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে চাইছিল। তাই, একটু ফাঁকায় পেতেই রাজীব বসন্তকে বলেছিল, 'বৈজ্ঞানিক হিসেবে আপনি সবসময়েই অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলেন বলে সুনাম আপনার যথেষ্ট। কিন্তু তুষারযুগ সম্বন্ধে আপনার মন্তব্যটা ঠিক মেনে নিতে পারছিনা। যদিও আপনার মত বিজ্ঞানের লোক নই কিন্তু আমার তো মনে হয় যে আগামী অন্তত কয়েক হাজার বছরের মধ্যে মানুষকে আর একটা তুষারযুগ দেখতে হবে না। বলতে পারেন সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান থেকেই কথাটা আমার মনে হচ্ছে...'

'কিন্তু সেটা যদি ভুল বলে প্রমাণিত হয়?' এক টুকরো পাঁপড় মুখে তুলতে তুলতে কথার খেইটা ফের ধরে নিয়ে বসন্ত বলেছিলেন, 'আমি প্রমাণ করে দিতে পারি যে বর্তমানে পৃথিবীর পরিবেশ যে সংকটের মধ্যে রয়েছে তাতে করে—ধরুন আগামী এক দশকের মধ্যেই একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। তবে, আপনার দুশ্চিন্তা নেই। বোম্বাইতে কোনো বিপদ হবে না। নিরক্ষরে যার ওপরে বা নিচে 20 ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে বিপজ্জনক কিছু ঘটার সম্ভাবনা কম।'

'ইস্কুলে পড়া ভূগোলের কিছুই প্রায় মনে নেই। তবে মনে আছে যে বোম্বাই-এর অক্ষাংশ হল 19 ডিগ্রি উত্তরে। আপনার হিসেবে ধরলে জায়গাটাকে তো ভাল বলা চলেনা।'

বসন্ত মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'ভালই তো, আমরা অর্থাৎ বোম্বাইওয়ালারা এতদিনে একটা আশ্চর্য জিনিষ দেখতে পাব—ঠান্ডা, বরফ পড়া, শন্ শন্ বাতাস। তবুও দেখবেন অন্যান্য জায়গার তুলনায় বোম্বাইতে অতটা কষ্ট হবে না।'

রাজীব দশ ডলারের একটি নোট বের করেছিল। বাজি ধরার টাকা। বলেছিল,

'আমি কিন্তু কিছুতেই আপনার কথা মেনে নিতে পারছিনা। দশ বছরের মধ্যে বোম্বাইতে বরফ পড়বে? অসম্ভব। দশ ডলার বাজি ধরলাম। আপনি জিতলে দশ ডলার পাবেন। আর আমি হারলে? স্রেফ দশ সেন্ট দিলেই চলবে। আপনি রাজী তো?'

'দেখুন, বাজিতে আমার হারার তো কোনো সম্ভাবনা দেখছিনা। আর জিতব যখন জানিই তখন আর বাজি ধরে কি হবে। মধ্যে থেকে আপনি ঐ দশ ডলার খুইয়ে বসবেন। এর চেয়ে বরং এই নিন আমার কার্ড। ওপরে আজকের তারিখটা লিখে দিচ্ছি। এটা রাখুন। আপনার কার্ডেও আজকের তারিখটা লিখুন। লিখে আমাকে দিন। দশ বছরের মধ্যে বোম্বাইতে যদি বরফ পরে তাহলে আমার কার্ডটি আমায় ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। ওপরে লিখতে ভুলবেননা যে আপনি হেরে গেছেন। আর আমি যদি হারি? আমিও তাই করবো। রাজী!'

রাজীব ও বসন্তের কার্ড বিনিময়ের মধ্যেই রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী ঘোষণা করলেন, 'আসুন আপনারা। আপনাদের জন্যে মিষ্টিমুখের যৎসামান্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। আসুন আপনারা দয়া করে।'

খাবার দাবার সাজানোর টেবিলে এবার বিশাল একটি কেক এনে রাখা হল। দেখবার মতই। শুভ্র বরফের মতই সাদা চিনি দিয়ে মোড়া। গায়ে লেখা, 'সুমেরুর বিস্ময়'।

বসন্ত অস্ফুটে বলেছিলেন, 'বিস্ময়ই বটে। কিন্তু দশ বছরের মধ্যেই আসল বিস্ময়টি যখন আসবে তখন কি হবে? তখন বরফকে কেউ কিন্তু চিনি বলে ভুল করবে না।'

কবিতার ছোঁড়া একটা বরফের দলার ধাক্কায় চমক ভাঙ্গল রাজীবের। তার চিন্তাটাও ফিরে এল বর্তমানে। রাজীব ভাবল যে বাজীটা সত্যিই সে হেরে গেছে। এবার বসন্ত চিটনিসকে তাঁর কার্ডটা ফেরত পাঠাতে হবে। ঘরে ফিরে এল রাজীব।

দেরাজ থেকে কার্ডটা বের করার সময় ওপরে ছাপা টেলিফোন নম্বরটা চোখে পড়ল রাজীবের। অবশ্যই সে কার্ডটা পাঠাবে। কিন্তু টেলিফোনে একবার বসন্তের সঙ্গে কথা বলে নিলে হয় না? বসন্তের নম্বরটা ডায়াল করতে থাকে রাজীব।

ওপার থেকে সাড়া পেয়ে রাজীব বলল, ' ডক্টর চিটনিস?'

'কথা বলছি। আপনার নাম?'

'আমার নাম রাজীব শাহ। আপনার কি মনে আছে...'

'ও, সেই বাজি তো! হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিলক্ষণ। আজকেই আমি আপনার কথা ভাবছিলাম। তাহলে বাজিতে শেষ অবধি হেরে গেলেন?'

বসন্তের মুখের মৃদু হাসিটা কল্পনা করল রাজীব।

'তা তো বটেই। আপনার সঙ্গে দেখা করে আধ ঘণ্টাটাক একটু কথা বলতে চাই। সময় হবে আপনার?'

'কেন বলুন তো?'

'কোন্ বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপরে নির্ভর করে আপনি এই বরফ পড়ার ঘটনাটির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেটা একটু বিশদ জানতে চাই। শুধু তাই নয়, সেটা জনসাধারণের চোখেও আনতে চাই।'

'এই তো সাংবাদিকের মত কথা। কিন্তু কিছু কি লাভ হবে এতে? যাই হোক, বেলা এগারটার মধ্যে আপনি যদি ইনস্টিটিউটে চলে আসেন তাহলে কথা হতে পারে। আমি অপেক্ষা করব।'

রাজীব বলল অবশ্যই সে পৌঁছে যাবে। দাড়ি কামানোর সময় রেডিওটা খুলে দিয়েছিল। তখন বিশেষ সংবাদ বুলেটিন চলছে। '...সমগ্র উত্তর ভারত অভূতপূর্ব আবহাওয়ায় সঙ্গীন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। পশ্চিম রাজস্থান থেকে বঙ্গোপসাগর, হিমালয় থেকে শাহিয়াদারি পর্বতমালা—সর্বত্র কম বেশি তুষারপাত হয়েছে। মানুষ ও গবাদি পশুর হতাহতের সংখ্যা এখন নিরূপণ করা সম্ভব নয়। দেশান্তরী পাখিরা এই আবহাওয়ার ফলে হাজারে হাজারে মারা পড়েছে। অপরিমিত ক্ষতি হয়েছে শস্যের। সবই প্রায় নষ্ট হয়েছে। সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপটারে তুষার পীড়িত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেছেন। তুষারপাতের ফলে যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার জন্য প্রধানমন্ত্রী বিশেষ একটি ত্রাণ তহবিল গঠন করেছেন। মুক্তহস্তে এই তহবিলে অর্থসাহায্য করার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে...'

রেডিও-তে আর একটি আকাশবাণীর কেন্দ্রে রাজীব দেখল ঐ একই সংবাদ বুলেটিন চলছে।

কবিতা রাজীবকে ডাকল—'বাবা! এসে একবার টিভিতে দেখে যাও। কত জায়গার বরফ দেখাচ্ছে।'

টিভি-তেও বিশেষ বুলেটিন চলছিল। গোটা উত্তর ভারত জুড়ে তুষারপাতের নানা দৃশ্য। এত জায়গার ছবি দূরদর্শন যোগাড় করতে পেরেছে বলে রাজীবের

গর্বই হল। মনে পড়ে গেল 'ডক্টর জিভাগো' চলচ্চিত্রে দেখা তুষারবৃত রাশিয়ার দৃশ্য। দূরদর্শনে তখন বিভিন্ন শহরের তাপমান জানানো হচ্ছিল—শ্রীনগর হিমাঙ্কের 20 ডিগ্রি নিচে, চন্ডীগড় 15 ডিগ্রি নিচে। দিল্লি 12 ডিগ্রি বারাণসী 10 ডিগ্রি এবং কলকাতা 3 ডিগ্রি হিমাঙ্কের তলায়। শুধুমাত্র বোম্বাই-এর দক্ষিণে তাপমান যন্ত্রের পারা 0 ডিগ্রি হিমাঙ্কের ওপরে। মাদ্রাজ 5 ডিগ্রি, বাঙ্গালোর 2 ডিগ্রি ও ত্রিবান্দ্রম 7 ডিগ্রি হিমাঙ্কের ওপরে বলে তাও যেন কিছুটা উষ্ণ বলে মনে হচ্ছিল।

এরপরেই বিশেষ একটি ঘোষণা। 'রাষ্ট্রপতি একটি জরুরী সভা ডেকেছেন যাতে উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্য, তিন সেনাবাহিনীর প্রধান, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং বিরোধী পার্টিসমূহের নেতৃবৃন্দ যোগ দেবেন। ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লি থেকে বোম্বাইতে স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে এই সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

পাঁচ বছর আগে জনৈক মার্কিন সাংবাদিককে বসন্ত বলেছিলেন, 'ওয়াশিংটন ডি.সি.র থেকে আপনাদের রাজধানী সরিয়ে হনোলুলুতে হয়তো নিয়ে যেতে হবে।' কথাটা মনে পড়ে গেল রাজীবের। ভারতের মত একটা উষ্ণ আবহাওয়ার দেশেই যদি এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতি হয় তাহলে ইউরোপ বা রাশিয়ার হাল কিরকম!' জানার জন্য রাজীব রেডিওতে বি.বি.সি. ওয়র্ল্ড সার্ভিস ধরলো।

সব জায়গা থেকেই বিপর্যয় ও ক্ষয়ক্ষতির খবর। তাপমাত্রা 20 ডিগ্রি থেকে 30 ডিগ্রি হ্রাস পেয়েছে। খবর শুনে রাজীবের মনে হল চিরাচরিত ঠাণ্ডার দেশ বলে কানাডা, ইউরোপ ও রাশিয়ার কাছে এই ঘটনা ততটা মারাত্মক বলে মনে হয়নি, যতটা ভারতের লেগেছে।

রাজীবের হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে বসন্তের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ঘড়িতে ন'টা বেজে পাঁচ। সূর্য উঠলেও তাকে দেখাচ্ছে কোনো নিষ্প্রভ গ্রহ বা চাঁদের মত। কবিতা আর প্রমোদ ধরেই নিয়েছে যে স্কুল আজ বন্ধ থাকবে। তাদের মা তাঁর বন্ধুর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে পুনে গেছেন। অন্য সময় মা সবসময় কবিতা, প্রমোদকে পড়তে বসান, ইস্কুলের দেওয়া কাজ শেষ করান, দুষ্টুমি করলে বকাসকাও করেন। তারা দুজনেই মহানন্দে টিভি দেখছিল।

রাজীব সামান্য কিছু খেয়ে নিল। তারপর গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করল। ইঞ্জিনটা ঠান্ডায় জমে গিয়েছিল বলে চালু করতে বেশ কিছুটা ধকল হল রাজীবের। কিন্তু আসল ঝামেলাটা অপেক্ষা করছিল রাস্তায়। তুষারগলা রাস্তায় এত পেছল যে রাজীবের গাড়ির চাকা নিয়ন্ত্রণে থাকছিল না। বিদেশে এরকম পথে গাড়ি চালাবার অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগিয়ে রাজীব কোনোমতে গাড়িটাকে বাগে রাখতে সফল

হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত বোম্বাই-এর বেশির ভাগ মোটর চালকেরই এরকম রাস্তায় গাড়ি চালাবার অভিজ্ঞতা ছিল না। রাজীব দেখল গোটা আম্বেদকর রোড ধরে একের পর এক গাড়ি আর বাস হয় অন্য গাড়িকে ধাক্কা মেরে বেসামাল হয়ে পরে রয়েছে বা বেগতিক দেখে তাদের রাস্তাতেই ফেলে রেখে মোটর চালকরা চলে গেছে।

পেছল কাদা আর ভাঙা তোবড়ানো গাড়ির মধ্য দিয়ে সাবধানে নিজের মারুতিটাকে পাশ কাটিয়ে চালাতে চালাতে রাজীব আপনমনেই বিড়বিড় করছিল, 'ব্রেক্ আর এক্সিলারেটরটা কোথায় আছে জানলেই যেন গাড়ি চালানো শেখা হয়ে গেল...কজন ভারতীয় যে ঠিক ঠিক গাড়িটা চালাতে জানে...'

রাজীবের বাড়ি থেকে কোলাবা যেতে সচরাচর মিনিট পঁয়তাল্লিশ লাগে। রাজীব ধরে নিয়েছিল যে অভূতপূর্ব পরিস্থিতির জন্যে বড়জোর এর দ্বিগুণ সময় অর্থাৎ ঘণ্টা দেড়েক লাগতে পারে। কিন্তু এখন রাজীব বুঝতে পারল যে আরও অনেক, অনেক সময় লেগে যাবে কোলাবা পৌঁছতে।

'আরে আসুন ভাই, আসুন। আপনি কিন্তু এক ঘণ্টা পেছিয়ে পড়েছেন। পথে কারো সাক্ষাৎকার নিতে বোধহয় দেরি হয়ে গেল!' বসন্ত রাজীবকে আপ্যায়ন করলেন।

'অধ্যাপক চিটনিস, ক্ষমা চাইছি। এই বেহাল শহরে গাড়ি না চালিয়ে যদি হেঁটে আসতাম তাহলে হয়তো এর চেয়ে অনেক আগে পৌঁছোনো যেত।' রাজীব একটা চেয়ারে বসল। মুখোমুখি রিভলভিং চেয়ারে বসন্ত।

'আগে আপনাকে অভিনন্দন জানাই। আপনার ভবিষ্যদ্বানী তো অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। এখন, জানেন তো আমরা, মানে সাংবাদিকরা সারাক্ষণ হন্যে হয়ে খবরের খোঁজে ছুটোছুটি করি। কি করে আপনি এই নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সে বিষয়ে আপনার কাছে বিশদ জানতে চাই। জনসাধারণের চোখে সবটা তুলে ধরলে কোনো লাভ হবে না বলে আপনি মনে করছেন। কিন্তু কেন?'

'এইসব কাগজের মধ্যে রয়েছে আপনার প্রশ্নের উত্তর।' মোটা একটা ফাইল রাজীবের হাতে তুলে দিলেন বসন্ত।

ফাইলে ছিল বিভিন্ন বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত বসন্তের প্রবন্ধের প্রতিলিপি, বেশ কিছু টাইপ করা পাতা ও হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি। বিজ্ঞানের জগতে নেহাতই

আনাড়ি বলে বিশেষ কিছুই রাজীবের বোধগম্য হল না। সে প্রবন্ধের শিরোনাম ও মুদ্রিত সারাংশগুলো লিখে নিল।

নির্লিপ্তকণ্ঠে বসন্ত বলল, 'তুষারযুগ সম্বন্ধে আমার ভবিষ্যদ্বাণীর পেছনে অবশ্যই একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রয়েছে। কিন্তু আমার প্রকাশিত লেখায় তার সন্ধান আপনি ভালভাবে পাবেন না। আমার যে লেখাগুলি ছাপা হয়নি তার মধ্যেই বরং ঐ তত্ত্বের হদিশ মিলবে।'

'কেন?'

'কেন? এর জন্য দায়ী হল তিনটি ব্যাপার যা নিয়ে বিজ্ঞানীদের গর্বের অন্ত নেই—বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি, সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের দ্বারা অন্য কোনো বিজ্ঞানীর কাজের মূল্যায়ন এবং প্রকৃত ন্যায় বিচার।' বসন্তের মুখে একই সঙ্গে ব্যঙ্গ ও হতাশার একটা ভাব কয়েক লহমার জন্যে ফুটে উঠেছিল। সেটা চলে যায়। আবার সেই নির্লিপ্ত ভাবটি ফিরে আসে, 'আপনারা ভাবেন যে বিজ্ঞানীরা শুধু শুদ্ধমন নিয়ে জ্ঞানের সন্ধানই করে চলেছে, তাদের মধ্যে না আছে হিংসা, না আছে লোভ। এগুলো মনগড়া কল্পনা ছাড়া আর কিছুই না। জানবেন যে আমরা বিজ্ঞানীরাও নিছকই রক্তমাংসের মানুষ। মানুষের মধ্যে যতরকম দুর্বলতা থাকতে পারে সে সব আমাদের মধ্যেও রয়েছে। আসল ব্যাপারটা কি জানেন, বড় বড় আসনে যে সব বিজ্ঞানীরা বসে আছেন তাঁদের কাছে নতুন কোনো বিজ্ঞানীর কোনো নতুন তত্ত্ব, নতুন আবিষ্কার যদি পছন্দসই না হয় তাহলে এঁরা সবসময়ে এই চেষ্টাই করবেন যে ঐ বিজ্ঞানীর কাজের ব্যাপারে লোকে যেন না জানতে পারে। আপনি ভাবতে পারেন যে এঁদের জন্য আমি যা বলতে চাই তা খোলাখুলি লিখতে পারিনি। আমি জানতাম যে এই তুষারযুগ আসবে কিন্তু স্রেফ ছাপা হবে কি হবে না এই ভেবে নিজের তত্ত্বটিকে যতটা সম্ভব রেখে ঢেকে বলতে হয়েছে আমায়। আর ঐ যে পাণ্ডুলিপি দেখছেন ওগুলো ওঁদের বিচারে নিছক পাগলামি বা অবাস্তব কষ্টকল্পনা। অতএব ঐসব পাণ্ডুলিপি ছাপার যোগ্য বলে বিবেচিতই হয়নি।'

'অধ্যাপক চিটনিস, আমাকে মাপ করবেন...'

'আর আপনি টাপনি নয়। এখন থেকে তুমি। আমাকে বসন্ত বলে ডাকলেই খুশি হব।'

'ধন্যবাদ, বসন্ত। কিন্তু তুমি যা বলছ তার সঙ্গে তো সেই কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও-র সময়ের ঘটনার দারুণ মিল। গীর্জার থেকে যাতে বাধা না আসে তার জন্যে তো কোপারনিকাসের প্রকাশক তাঁর বই-এর মুখবন্ধটিই পাল্টে দিয়েছিলেন।' লেখার সঙ্গে সঙ্গে রাজীব সামান্য কারণটি টেপ রেকর্ডারেও তুলে নিচ্ছিল।

বসন্ত বেশ ভেবেচিন্তে কথাগুলো বলছিলেন।

'তখনকার দিনে বিজ্ঞানীদের বাধা দিত গীর্জা। আর আজ আমাদের কাজে বাধ সাধছে বিজ্ঞান জগতের যত হোমরাচোমরার দল। এরাই ঠিক করছে কি ছাপা হবে, কি ছাপা হবে না, ফতোয়া দিচ্ছে যে বিজ্ঞান বলতে এটাই বোঝায়। অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে এরা আমলই দেয় না। পাঁচশো বছর আগে গীর্জার যাজকরা যা করেছে এখন এরাই সেটা করছে। কি বলব, জানি আমার কথার মধ্যে বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছে।'

'তবে একটা ব্যাপার বসন্ত। নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তুমি যা বলছ সেটা যেমন ঠিক তেমন এটাও তো তোমায় মানতে হবে যে বহু বিজ্ঞানী অনেক রকম আজগুবি তত্ত্ব খাড়া করে। এখন বলো কার এত সময় যে প্রত্যেকটা তত্ত্ব খতিয়ে দেখবে? তাই তুমি যাঁদের বিরুদ্ধে কথাগুলো বলছ তাঁদের আমি সবসময় দোষ দিতে পারি না।'

'রাজীব, তোমার কথাটা একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না মানছি। কিন্তু এটা আমাকে বলো তো—ধরো কেউ একটা নতুন তত্ত্বের কথা বলল। শুধু তাই নয়, এই তত্ত্বের স্বপক্ষে যুক্তিপ্রমাণও পেশ করল। তখন কেন এর যথার্থ মূল্যায়ন হবে না? এবং এরকম একটি তত্ত্বকে নিশ্চয় অন্য অনেক আজগুবি তত্ত্বের থেকে আলাদা করা দুরূহ কিছু নয়। আর এছাড়াও দেখতে হবে ঐ বিজ্ঞানী আগে কোনো মূল্যবান কাজ করেছেন কিনা। যাইহোক এসব আলোচনা ছেড়ে তোমাকে বরং আমার তত্ত্বটি এবারে বোঝানোর চেষ্টা করি।'

রাজীব বলল 'সেই বরং ভাল। কি করে যে তুমি অত আগে সবটা বলতে পেরেছিল।'

পৃথিবীর একটা মানচিত্র টেবিলের ওপর রেখে বসন্ত বলল, 'ভাল করে দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে পৃথিবীর ওপরে শুধুমাত্র তিনভাগের একভাগ হচ্ছে স্থল। বাকি সবটাই জল, সাগর মহাসাগর মিলিয়ে। এখন পৃথিবীর আবহাওয়া কেমন থাকবে সেটা অনেকটাই নির্ভর করে সমুদ্রের ওপর। সমুদ্রের ওপরের গরম হাওয়া ওপরে উঠে যায়, উঠে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে মিশে যায় এবং পরে, নেমে আসার আগে ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক তো?'

'এখন অবধি যা বললে সেগুলো ইস্কুলের ভূগোল বই খুললেই দেখা যায়।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। আসল কথায় আসছি। সচরাচর আমরা ধরেই নিই যে মহাসাগরগুলো উষ্ণ এবং সবসময়েই এই উষ্ণতা বজায় থাকবে। কিন্তু এই ধারণাটা কি ঠিক? কয়েক বছর আগে বিভিন্ন গভীরতায় আমি সমুদ্রের তাপমাত্রা

মেপেছিলাম এবং যা দেখেছিলাম তাতে করে আমার আশঙ্কাই হয়েছিল। ওপরের দিকে সমুদ্রের জল গরম ঠিকই কিন্তু যত গভীরে যাবে তত ঠাণ্ডা বাড়বে। খুব বেশি গভীরে গেলে দেখবে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি। আমার তখন আশঙ্কা হয়েছিল এই ভেবে যে পৃথিবীর আবহাওয়ার জন্যে সমুদ্রের ওপরের অংশের ওপরে আমরা কি নির্ভরশীল। অথচ গোটা সমুদ্রের তুলনায় এই অংশের আয়তন আর কতটুকু। তাছাড়া প্রতি বছরই এই আয়তন কমছে, সমুদ্রের ওপরের স্তরটি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে পড়ছে।'

'কিন্তু সূর্য আছে তো। সূর্য কি সমুদ্রকে তাপ যোগাচ্ছে না?'

'সরাসরি তাপ দেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু সূর্যের বেশি নয়। গরমকালে তো মেরু অঞ্চলে চড়া রোদ্দুর পড়ে কিন্তু কতটুকু বরফ আর তাতে গলে? বরং দেখা যায় যে বরফ সূর্যরশ্মিকে প্রতিফলিত করে ফিরিয়ে দিচ্ছে। ফলে তাপও ভেতরে ঢুকতে পারছেনা। তবে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে সূর্যের আলোর তাপ দেওয়ার ক্ষমতা বেশি। চাও তো পরীক্ষাগারে তোমাকে এটা হাতে নাতে দেখিয়ে দিতে পারি।'

একটা টানা বারান্দা পেরিয়ে পরীক্ষাগারে যেতে হয়। রাজীবকে বসন্ত সেখানে নিয়ে গেলেন।

টেবিলের ওপরে বড় একটি কাচের পাত্র। বসন্ত একটি সুইচ টিপে একটি যন্ত্র চালু করলেন।

'আমি এবার আস্তে আস্তে এই কাচের পাত্রে যে আবদ্ধ বাতাস রয়েছে তাকে ঠাণ্ডা করছি। কেমন? মনে রাখতে হবে যে এই বাতাস কিছুটা আর্দ্র যার মানে হল এর মধ্যে কিছু পরিমাণে জলীয় বাস্প রয়েছে। এখন তুমি দেখবে যে খুব সাবধানে, ধীরে ধীরে, আমি যদি তাপমাত্রাটা কমাতে থাকি তাহলে হিমাঙ্কের তলায় চলে গেলেও ঐ বাস্প জমে তুষার হচ্ছে না।'

তাপমান যন্ত্রে দেখাই যাচ্ছিল যে তাপমাত্রা কমছে। তাপমাত্রা 0 ডিগ্রির তলায় চলে গেল। তুষারের কোনো চিহ্নও নেই। এরপর বসন্ত আড়াআড়ি ভাবে কাচের পাত্রের মধ্যে জোরালো একটি আলোর রশ্মি ফেললেন। অথচ পাত্রের মধ্যে যে আবছা অন্ধকার ছিল তাতে কোনো হেরফের হল না।

বসন্ত বুঝিয়ে দিলেন, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আলোর রশ্মিটা আর্দ্র বাতাসের মধ্য দিয়ে বিনা বাধায় চলে যাচ্ছে। তাপমাত্রা আরও কমিয়ে দেখা যাক কি হয়।'

কমতে কমতে তাপমাত্রা যখন হিমাঙ্কের 40 ডিগ্রি নিচে তখন দেখা গেল গোটা পাত্রটা চক্‌চক্ করছে রূপোলী আলোয়। পরিবর্তনটি যথেষ্টই লক্ষ্যণীয়।

বসন্ত বললেন, 'এতক্ষণ বাতাসের মধ্যে যে জলকণা ছিল তা জমে কঠিন হয়েছে। সেই তুষারকণাই আলোর প্রতিফলক হিসেবে কাজ করছে। বাতাসের আর্দ্রতা এটা করতে পারে না। পরীক্ষা শেষ। চলো এবারে গিয়ে বসে তোমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই।'

'মেরু অঞ্চলে ঠিক এই ঘটনাটাই ঘটে। তাপমাত্রা যখন 40 ডিগ্রির নিচে নেমে যায় তখন ঐ তুষারকণা বা তথাকথিত হীরকচূর্ণের সৃষ্টি হয় যা তুমি এইমাত্র দেখলে। এই তুষারের সূক্ষ্ম গুঁড়ো সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে ছড়িয়ে দেয়। মেরু এলাকাতেই ঘটনাটা সচরাচর হয় কারণ অন্য জায়গায় তাপমাত্রা বলতে গেলে কখনোই অত নিচে নামে না।'

বসন্ত বলে যাচ্ছিলেন আর রাজীব প্রয়োজনমত দরকারী বিষয়গুলো লিখে নিচ্ছিল। একইসঙ্গে রাজীব টেপরেকর্ডারটিও চালু রেখেছিল। কিন্তু তখনও সে তুষারপাতের মূল কারণটা বুঝতে পারেনি। সেটা রাজীবের অভিব্যক্তি থেকেই বুঝতে পারলেন বসন্ত। হেসে বললেন, 'এইবার আসল ব্যাপারটায় আসছি। এমন একটা অবস্থার কথা ভাবো যখন সমুদ্রের তাপমাত্রা কমে কমে এতই ঠান্ডা হয়ে গেছে যে যতটা তাপ আবহমণ্ডলে পাঠানো দরকার সেটা সমুদ্র পাঠাতে পারছেনা। এর ফলে সব জায়গাতেই ঠাণ্ডা যে শুধু বাড়বেই তা নয়, মেরু অঞ্চল ছাড়াও অন্যত্র ঐ হীরকচূর্ণ তৈরি হবে। তার ফল কি হবে? সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যাবে, পৃথিবীর ওপরে আসতে পারবেনা। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, ঐ তুষারকণার একটা পর্দা যেন তখন পৃথিবীকে সূর্যের আলো থেকে আড়াল করবে।'

রাজীব এবার সবটা স্পষ্ট বুঝতে পারে। বুঝতে পেরে উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে, 'অতএব, পৃথিবী আরো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। অন্যদিকে সমুদ্রের উষ্ণতাও কমতে থাকবে। ওদিকে আবহমণ্ডলে হীরকচূর্ণের পরিমাণ আরও বাড়তে থাকবে। যার ফলে সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসতে আরও বেশি বাধা পাবে। এইভাবে চলতে থাকলে পরিণতি হিসেবে তুষারযুগ আসবে। কিন্তু সমুদ্র যদি যথেষ্ট পরিমাণে উষ্ণ থাকে তাহলে কখনোই এটা ঘটতে পারে না।'

বসন্ত রাজীবকে থামান, 'দাঁড়াও, আর একটা ব্যাপার বোঝা দরকার। সাধারণ অবস্থায় হীরকচূর্ণের বিপদ থেকে আবহমণ্ডলকে রক্ষা করতে সমুদ্রের ওপরের দিকের জলে যে তাপ থাকে তাই যথেষ্ট। কিন্তু এমন কিছু যদি ঘটে যার ফলে সমুদ্রের উষ্ণতা কমে যায় তাহলেই সমূহ বিপদ। ধরো কোনো আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুদগিরণের সময় নিক্ষিপ্ত ধুলো ও ছাই আবহমণ্ডলে মিশে যেতে পারে। এই কণাগুলি হয় সূর্যের আলোকে শুষে নেবে বা প্রতিফলিত করে ফিরিয়ে দেবে। তাই

আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তা যদি মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যায় তাহলে ধুলোর পর্দার সৃষ্টি হয়ে বিপদ ঘটতে পারে। কারণ সূর্যের আলো তখন স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীর ওপরে পড়ে তাপ যোগানোর কাজটা করতে পারবেনা। প্রকৃতি তার নিজের নিয়মে যে ভারসাম্য তৈরী করেছে সেটা ভেঙে পড়ছে দেখে বেশ কয়েক বছর আগেই আশঙ্কিত হয়েছিলাম।'

সেই পাঁচবছর আগে ওয়াশিংটনে যে আলোচনা হয়েছিল রাজীব এতদিনে তার যথার্থতা অনুভব করতে পারল। বুঝতে পারল যে ভিসুভিয়াসে অগ্ন্যুদগিরণের সংবাদে বসন্ত কেন অতটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন।

বসন্ত চিটনিসের আশঙ্কা আজ সত্য বলে প্রমাণিত। তাহলে ভবিষ্যৎ?

'তুষারযুগ এসে গেছে! ভারতীয় বিজ্ঞানীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে প্রমাণিত!' —এই শিরোনামে রাজীবের রচনাটি প্রকাশিত হল। রচনাটি ভারতে তো আলোড়ন ফেললই, উপরন্তু বিদেশী সংবাদ সংস্থাগুলিও রচনাটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত করল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বসন্ত চিটনিসের খ্যাতি নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বিজ্ঞানীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্রমাণসহ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আবহমণ্ডলে বিশাল পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ও সমীহা তো তিনি যথেষ্টই পেলেন, অন্যদিকে বিজ্ঞানীমহলও তাঁকে যথোপযুক্ত স্বীকৃতি জানালো। আগামী দিনে কি ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে অধ্যাপক বসন্ত চিটনিসের চিন্তাভাবনা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হতে লাগল।

কিন্তু এত কিছুর পরেও কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী কিছুতেই এটা মেনে নিতে পারছিলেন না যে তুষারযুগের সূচনা ঘটেছে। তাঁরা বলতে থাকলেন যে এ হল আবহাওয়ামণ্ডলে এক সাময়িক গোলযোগ মাত্র। মামুলি পরিবর্তনের চেয়ে অনেক বড় হলেও এটা একটা সাময়িক ব্যাপার, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। বরং তাঁরা আশ্বাসবাণী শোনালেন যে সমুদ্র ও আবহমণ্ডলে তাপ বিনিময়ের প্রক্রিয়াটি আবার স্থিতিশীল হয়ে যাবে এবং মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই সেই স্বাভাবিক, পরিচিত, উষ্ণ দিনগুলো আবার ফিরে আসবে। মারাত্মক ঠাণ্ডায় কয়েকটি দেশ খুবই নাজেহাল হয়ে পড়েছিল। তাদের কিন্তু এই আশ্বাসবাণী তেমন মনে ধরেনি।

বিশ্বের নানা দেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বসন্ত বিশ্ববাসীকে সাবধান করে বললেন যে কোনোরকমের ঢিলেমির মনোভাব গ্রহণ করলে ফল ভাল

হবে না। 'গরমকালে হয়তো বরফ কিছুটা গলতে পারে কিন্তু এটাকে তুষারযুগের অবসান বলে ভাবলে ভুল হবে। মনে রাখবেন, আরও বেশি ঠাণ্ডা নিয়ে এর পরেই শীতকাল আসবে। তখন এটা যদি ঠেকাতে হয় তাহলে অনতিবিলম্বে আমাদের চেষ্টা চালাতে হবে। আবহমণ্ডলে পরিবর্তনের যে ধারাটি এসেছে আমার মতে তার গতিমুখ বিপরীতে ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব কিন্তু নিঃসন্দেহে কাজটি ব্যয়সাপেক্ষ। তবে আমি বলব যে এ ব্যাপারে অর্থ খরচে কার্পণ্য করা উচিত হবে না।'

কিন্তু বসন্তের এই সাবধানবাণীতে কোনো ফল হল না। বসন্তকাল এল এপ্রিল নাগাদ। তাপমাত্রা সামান্য বাড়লো। সেবারে উত্তর গোলার্ধের সর্বত্র গ্রীষ্ম ছিল উষ্ণ ও রৌদ্রোজ্জ্বল। দক্ষিণ গোলার্ধেও এবারে যে শীত পড়ল তা উত্তরের মত হাড়কাঁপানো নয়। সুতরাং আবহাওয়াবিদ থেকে শুরু করে সকলেই বলতে শুরু করল যে আর ভয় নেই, বরফ গলতে শুরু করেছে।

প্রতিবারের মত এবারেও উইমবেল্ডনের টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। প্রতিযোগীদের গরম জামা পরে খেলতে হলেও অন্যবারের মত বৃষ্টি না পরায় সকলেরই মন বেশ খুশি খুশি ছিল। ক্রিকেট সমরে 'অ্যাসেজ' জিতল অস্ট্রেলিয়া। এবারে অন্তত দুইপক্ষের কেউই আবহাওয়াকে দোষারোপ করেনি। মার্কিন ওপেন গলফ্ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল অভূতপূর্ব মনোরম আবহাওয়ায়। অন্যদিকে, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকায় এবার দুরন্ত গরম পড়ল না। ভারতীয় উপমহাদেশে বর্ষা বেশ তাড়াতাড়িই এল বলা চলে। বৃষ্টিপাতও ছিল পর্যাপ্ত।

কি ছোট, কি বড়—সব দেশই নিজেদের এই ভেবে আশ্বস্ত করল যে, 'আমরা অতটা না ঘাবড়ালেও পারতাম'। ভারতের নাগরিকরা অন্তত এই প্রথম তাদের অলশ আমলাতন্ত্রকে সাধুবাদ জানিয়েছিল কারণ ঐ লেটলতিফের দল তখনও রাজধানী নয়াদিল্লি থেকে বোম্বাইতে স্থানান্তরিত করার কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি। বরং তারা কাজ মুলতুবি রেখে ঘোষণা করে দিল, 'পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া অবধি কাজ বন্ধ থাকবে।'

কিন্তু দুশ্চিন্তা বাড়ছিল একজনের। তিনি হলেন বসন্ত চিটনিস। আগুন নিভে যাওয়ার আগে একবার যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে এবারের গ্রীষ্মও যেন সেরকম। বসন্ত অনেককে ব্যাপারটা বলেছিলেন কিন্তু কেউই মন দিয়ে সেটা শোনার অবস্থায় ছিল না!

একটি ব্যতিক্রম অবশ্য ছিল। বসন্তের যুক্তিসত্তায় রাজীবের ছিল অকাট্য বিশ্বাস। একদিন দপ্তরে বসে রাজীব মন দিয়ে টেলিপ্রিন্টারে পাঠানো খবর পড়ছে এমন সময় বসন্ত এলেন। রাজীব তাঁর মুখটা দেখেই অনুমান করল যে নির্ঘাত বসন্তের

কাছে কোনো বিশেষ খবর আছে।

'নাও, এই টেলেক্স বার্তাটা পড়ো', বসন্ত একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন। বার্তাটি এইরকম, 'আপনার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা দক্ষিণ মেরুর বরফের পরিমাপ করেছি। গত বছরের তুলনায় এখানে বরফের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জলের তাপমাত্রা 2 ডিগ্রি হ্রাস পেয়েছে।'

বসন্ত বললেন, 'দক্ষিণ মেরুর আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্র থেকে বার্তাটি এসেছে। আমি জানতাম যে ফলটা এরকমই হবে, শুধুমাত্র প্রমাণের অপেক্ষায় ছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত দেখছি যে আমিই ঠিক।'

'তার মানে তুমি বলতে চাও যে এবারের শীত গতবারের চেয়েও ভয়াবহ হবে।'

'হ্যাঁ, রাজীব। কিন্তু কে আর তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে বলো। আমি তো দেখছি সকলকেই এবার ঠাণ্ডায় জমে মরতে হবে।'

'কিন্তু বসন্ত, সত্যি করে বলোতো, পরিস্থিতি কি এতই খারাপ? বরফের আক্রমণ থেকে বাঁচার কোনো উপায়ই কি নেই?'

'আছে কিন্তু এখন আমি মুখ খুলবোনা। ঐ সবজান্তারা এসে যদি অনুরোধ করে তবেই মুখ খুলতে পারি, নচেৎ নয়। যাইহোক, শোনো, বন্ধুর মত তোমাকে একটা পরামর্শ দিচ্ছি। প্রাণে যদি বাঁচার ইচ্ছে থাকে তাহলে যতটা পারো নিরক্ষরেখার কাছে চলে যাও। আগামী কয়েক মাস হয়তো ইন্দোনেশিয়ার আবহাওয়া কিছুটা সহনীয় থাকবে। আমি চললাম বান্দুং যাওয়ার টিকিট কাটতে। যা ভাল বোঝ করো।'

বসন্ত চলে গেলেন।

মানুষ দাবি করতে পারে যে সেই হচ্ছে পৃথিবীর সর্বময় প্রভু কিন্তু আসলে প্রকৃতির ক্ষমতার কাছে মানুষের সেরা প্রযুক্তিবিদ্যা নিতান্তই তুচ্ছ।

2 নভেম্বর। বোম্বাই-এর মানুষের জন্য আশ্চর্য এক দৃশ্য অপেক্ষা করছিল। আকাশে একই সঙ্গে হাজার হাজার পাখি উড়ছে। এবং এত সুশৃঙ্খলভাবে সার বেঁধে তারা উড়ছিল যে বিমানবাহিনীরও লজ্জা পেয়ে যাওয়ার কথা। পক্ষীবিশারদরা এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে হতবাক কারণ কখনও তাঁরা এসব পাখিকে এইভাবে উড়তে দেখেননি। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোম্বাই-এর যত কাক, চড়ুই ও পায়রা ছিল, তারাও সেই পাখিদের দলে যোগ দিল।

পাখির ঝাঁক উড়ছিল দক্ষিণাভিমুখে। বসন্ত চলে যাওয়ার সময় যে কথাগুলো বলেছিল সেগুলো রাজীবের এই দৃশ্য দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেল। পাখিরা তাদের সহজাত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কিছু বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু মানুষ তখনও তার অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জাম থাকতেও কিছুই বুঝে উঠতে সক্ষম হয়নি। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান ছাড়াও পাখিদের সাবধান করে দিয়েছিল গত বছরের শীতের অভিজ্ঞতা।

পৃথিবীকে ঘিরে মহাকাশে যে ক্ষিতি-স্থির কৃত্রিম উপগ্রহগুলি ঘুরছিল তারাও ব্যাপারটা আঁচ করতে পারল। অবশ্য পাখিদের দুদিন পরে। মহাকাশ থেকে 4 নভেম্বর এল সাবধানী বার্তা—'পৃথিবীর আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে এবং আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ভারিমাত্রায় তুষারপাত ঘটার সম্ভাবনা আছে।'

আবহাওয়াবিদরা বুক ফুলিয়ে ফতোয়া দিলেন, 'ভাগ্যে আমাদের হাতে অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক সব সরঞ্জাম ছিল। না থাকলে এই আগাম সাবধানী বার্তা এসে পৌঁছোত না।' ততক্ষণে কিন্তু পাখিরা নিরক্ষরেখার কাছে নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে গেছে।

মানুষের মধ্যে পাখিদের মতো শৃঙ্খলাবোধ নেই। তাই তারা তুষারপাতের ভয়ে বিচলিত হয়ে পড়তে লাগল। জাপান, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বিজ্ঞানে উন্নত নানা দেশ এই ভেবে নির্ভাবনায় ছিল যে গতবারের শীত যখন তারা সামলে নিতে পেরেছে তখন এবারের শীতের মোকাবিলা করতেও তাদের অসুবিধা হবে না। কিন্তু তারা কল্পনাও করতে পারেনি যে তাদের বড় বড় শহরগুলো যখন পাঁচ ফুট গভীর তুষারের তলায় চাপা পড়বে তখন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে। ফল যা হতে পারে তাই হল—ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ দেখা দিল। পারমাণবিক যুদ্ধের সময় প্রাণরক্ষার জন্য যে ভূগর্ভস্থ আশ্রয়স্থল নির্মিত হয়েছিল সেখানে যারা আশ্রয় নিতে পেরেছিল কোনোমতে প্রাণ বাঁচল তাদের। চিরাচরিত উষ্ণ দেশগুলিতে তুষারের আক্রমণ এত তীব্র হয়নি। কিন্তু সেখানেও প্রাণহানির হার প্রায় একই ছিল কারণ এসব দেশের মানুষ এই পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি নেয়নি।

সপরিবারে রাজীব তার এক খুড়তুতো ভাই-এর সঙ্গে মাদ্রাজে চলে গিয়েছিল। সেখানে তাও কোনোমতে প্রাণধারণ করে বসবাস করার মত অবস্থা ছিল। প্রমোদ আর কবিতার ততদিনে বরফের আকর্ষণ চলে গিয়েছিল। অনেকের মত তারাও বার বার জানতে চাইত যে চেনা সেই গরমের দিনগুলো আবার ফিরে আসবে কবে? কিন্তু, বিশেষজ্ঞরা কেন, কেউই এর জবাবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কিছু বলতে পারেননি। যে সব বিজ্ঞানীরা গতবারের শীতকে হালকাভাবে নিয়েছিলেন তাঁদের

অনেকেই এবারের তীব্র ঠান্ডায় প্রাণ হারিয়েছিলেন। অবশ্য সময়মত ওয়াশিংটন থেকে মায়ামি বিচ-এ চলে যাওয়ার ফলে এঁদের মধ্যে একজনের প্রাণরক্ষা পেয়েছিল। তিনি হলেন রিচার্ড হোমস্। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি পর্ষদের সদস্য।

রাজীবকে বিস্মিত করে একদিন মায়ামি বিচ থেকে রিচার্ড হোমস্-এর টেলিফোন এল।

'রাজীব শাহ বলছেন? কেমন আছেন ভাই? আমি অবশ্য বাজি ধরে বলতে পারি আপনাদের মাদ্রাজ আমাদের এই হাড়কাঁপানো মায়ামি-র থেকে অনেক বেশি গরম। তাই না?'

হাসিঠাট্টার ভাব আনার চেষ্টা করলেও রিচার্ড-এর কণ্ঠস্বরের মধ্যে নিহিত এক দুশ্চিন্তার আভাস পেল রাজীব।

'বলেন কি রিচার্ড! আপনাদের বাড়িতে তো ঘর গরম করার ব্যবস্থা আছে।'

'ঘর গরম...মায়ামি-তে? আপনি কি খেপেছেন! আমি আসলে ফোন করেছিলাম জানতে যে বসন্ত এখন কোথায়...বসন্ত চিটনিসকে তো আপনি ভালমতই চেনেন। তিনি কোথায় উধাও হলেন বলুন তো। ওদিকে আবার বোম্বাই বা নয়াদিল্লি কোথাও টেলিফোন কাজ করছে না।'

কখনও যেন করতো—আপনমনে বলল রাজীব। বান্দুং-এ বসন্তের ঠিকানা ও ফোন নম্বরটা সে হোমস্-কে দিয়ে দিল। রিচার্ড বললেন, 'এই তুষারপাত নিয়ে বসন্ত কি ভাবছেন সেটা জানাই আমার উদ্দেশ্য। হয়তো এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় তিনি বাতলাতে পারেন।'

রাজীব ভাবল যে তাহলে কি এতদিনে সবজান্তাদের দল বসন্তের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য প্রস্তুত? অথচ, মাত্র কয়েক মাস আগে এই রিচার্ড হোমস্-ই বসন্তের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে হাসিঠাট্টা করেছিলেন। এখনও হয়তো পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়নি, হয়তো কিছু করা এখনও সম্ভব। হোমস্ যখন টেলিফোন করবেন তখন বসন্ত কেমন মেজাজে থাকবে? বসন্ত হোমসের কথা শুনবে তো?

বান্দুং বিমানবন্দর। রিচার্ড হোমস্-এর সঙ্গে করমর্দন করতে করতে বসন্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর আপনাদের ওয়াশিংটনের হালচাল কেমন বলুন।'

'ওয়াশিংটনে একটি জীবিত প্রাণীও নেই। সত্যি বলতে পাখিদের বুদ্ধি কিন্তু আমাদের চেয়ে ঢের বেশি। তারা অন্তত সময় থাকতে থাকতে পালিয়ে গিয়েছিল।'

শেষবারের তুলনায় এবারে রিচার্ড হোমস্-এর হাবভাব অনেক নরম। বসন্ত চিটনিস তাঁকে দেখলে পাছে রেগে ওঠেন, এই ভয়ে হোমস্ রাজীবকে সঙ্গে এনেছিলেন। বসন্তের বাড়ি যাওয়ার পথে গাড়িতে তিনজনের মধ্যে বিশেষ আর কথা হয়নি।

কয়েকটা কাগজ বসন্তের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে রাজীব বলল, 'একটা দিব্যি নিরাপদ জায়গা নিজের জন্যে বেছে নিয়ে ভালই তো আছ। ওদিকে গোটা দুনিয়া জুড়ে ধ্বংসের কি তাণ্ডবলীলা চলেছে তার খবর রাখো? টেলেক্স ও ফ্যাক্স পাওয়া এই বার্তাগুলো পড়ে দেখ, বুঝতে পারবে।'

স্বাভাবিক সময়ে ঘটলে এই সংবাদগুলি নিঃসন্দেহে খবরের কাগজে হেডলাইনে ছাপা হত। কিন্তু তুষারযুগে এগুলো নিতান্তই নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনামাত্র।

'বৃটেনের জনসংখ্যার যে চল্লিশ শতাংশ প্রাণে বেঁচেছেন তাঁদের কেনিয়াতে পাঠানোর কাজ বৃটিশ সরকার সম্পন্ন করেছে। এর জন্য দুমাস সময় লেগেছে।' 'রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে মস্কো এবং সেন্ট পিটার্সবার্গের জনসাধারণকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে।' 'ভূগর্ভস্থ আশ্রয়ে আমরা এক বছর টিকে থাকতে পারব—ইজ্রায়েলের রাষ্ট্রপতি।' 'ইউ.এন.আই. জানাচ্ছে যে উত্তর ভারতের প্রত্যেকটি নদী জমে কঠিন হয়ে গেছে।'

ভাবলেশহীন মুখে সংবাদগুলো পড়ে একটার পর একটা কাগজ রাজীবকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন বসন্ত। শেষে নির্লিপ্তভাবে মন্তব্য করলেন, 'গত বছর তুষারযুগের আসল চেহারার সামান্যই আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। এবারে পুরোটা টের পাওয়া যাচ্ছে। আগামী বছর অবস্থাটা কি দাঁড়াবে সেটা দেখার জন্যে বোধহয় আমরা থাকবোনা।'

রাজীবের কণ্ঠে ভয়, 'অবস্থাটা কি তাহলে সত্যিই এত মারাত্মক?'

রিচার্ডের আর্তস্বর, 'তুষারযুগ থেকে উদ্ধারের কোনো উপায়ই কি নেই?'

'রিচার্ড, হয়তো আমরা অনেকটাই দেরি করে ফেলেছি। তবে আমার ধারণাটা নির্ভুল নাও হতে পারে। যখন আর কোনো বিকল্প নেই তখন আমরা অবশ্যই একটা চেষ্টা করে দেখতে পারি। এই চেষ্টাটা গত বছরেই আমাদের করা উচিত ছিল।' টাইপ করা কয়েকটা পাতা দেরাজ থেকে বের করে বসন্ত সামনে রাখলেন। প্রথম পাতায় রচনাটির শিরোনাম—'ইন্দ্রলোক অভিযান প্রকল্প।'

বসন্ত আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'স্বর্গের দেবতা হলেন ইন্দ্র। তাঁর আকাশের রাজত্বেই আছে তুষারযুগের উৎস। তাই সেখানেই অভিযান চালাতে হবে।' রিচার্ড নিঃশব্দে পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। অথচ মাত্র এক বছর আগেই পাণ্ডুলিপিটি একবার ছুঁয়ে দেখতেও রাজী হননি এই রিচার্ড হোমস্।

বসন্ত চিটনিসের সঙ্গে রিচার্ড হোমস্-এর দেখা হওয়ার পর ছ'মাস কেটে গেছে।

মহাকাশযান থেকে পৃথিবীর দিকে তাকালে কেবল সবুজ আর নীলের প্রাচুর্য দেখা যেত। কিন্তু এখন নিরক্ষরেখার 10 ডিগ্রি উত্তর ও 10 ডিগ্রি দক্ষিণের একফালি জায়গা বাদে আর কোথাও সবুজ বা নীলের হদিশ মিলবেনা। বাকি সব জায়গায় তুষারযুগ বিরাজমান। এবং মানবসভ্যতার যা কিছু অবশিষ্ট রয়েছে তা ঐ একফালি জায়গাতেই আশ্রয় নিয়েছে। সেখান থেকেই শুরু হতে চলেছে তুষারযুগের আক্রমনের বিরুদ্ধে মানবসভ্যতার সংগ্রাম।

দাঁতে দাঁত দিয়ে শেষ লড়াই!

অতিকায় রকেট-টা মহাকাশে উঠে যাওয়ার জন্য তৈরি। বসন্ত চিটনিসের মুখে উজ্জ্বল আশার ছাপ। থুম্বা-তে বিক্রম সারাভাই মহাকাশ কেন্দ্র (বি.সা.ম.কে.)-র রকেট উৎক্ষেপণ মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে বসন্ত ইন্দ্রলোকে অভিযান শুরু করার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন।

উৎক্ষেপণ বিভাগের প্রধান জানালেন, 'আমরা প্রস্তুত।' বসন্ত নির্দেশ দিলেন, 'বোতাম টিপে দিন।' জ্যোতিষের পরামর্শ অনুযায়ী শুভক্ষণ মেনে কোনো কিছু শুরু করার লোক বসন্ত চিটনিস নয়।

উৎক্ষেপণের জন্য বোতাম টেপা হল। উদ্বেগে ভরপুর কয়েকটি মুহূর্ত। কিন্তু তারপরেই বিশাল রকেটটি সাবলীলভাবে আকাশে উঠে যেতে সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। শুরু হল ইন্দ্রলোকে অভিযান।

ঐ মহাকাশ কেন্দ্র থেকে এর আগেও বহু রকেট অন্তরীক্ষে পাঠানো হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল আবহমণ্ডল সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা। এবারে কিন্তু রকেট পাঠানোর লক্ষ্য অন্য—আবহমণ্ডলকে নিয়ন্ত্রণ করা। নিরক্ষবৃত্তের ওপরে অবস্থিত নানা জায়গা—শ্রীহরিকোটা, শ্রীলংকা, সুমাত্রা, কেনিয়া, গুয়াতেমালা...আরও কত কত কেন্দ্র থেকে একের পর এক রকেট ও রকেট বাহিত কৃত্রিম উপগ্রহ আবহমণ্ডলে পাড়ি জমালো। ইন্দ্রলোকে অভিযানের যিনি মূল স্থপতি সেই বসন্ত চিটনিস প্রথম রকেট উৎক্ষেপণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার বিরল সম্মান পেয়েছিলেন।

একটি যান্ত্রিক প্যানেলের পর্দায় উৎক্ষিপ্ত রকেটটির সফল যাত্রা লক্ষ্য করতে করতে বসন্তের মুখে এই প্রথম হাসির রেশ দেখা গেল। লালরঙা একটি টেলিফোনের রিসিভার তুলে তিনি ঘোষণা করলেন, 'ইন্দ্রলোকে অভিযান সাফল্যের সঙ্গে শুরু হয়েছে।'

এই মহা অভিযানে ব্যবহৃত হয়েছিল রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ, বিশেষ বেলুন এবং বিমান। অভিযাত্রী সেনাদল মোটের ওপর এই চারটি দলে বিভক্ত ছিল। অন্যদিকে

বিশ্বের নানা জায়গায় মানুষ কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ সংবাদ পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল। নতুন এই মহাভারতের যুদ্ধে বর্ণনাকারী সঞ্জয়ের ভূমিকায় যেন ঐ উপগ্রহগুলি অবতীর্ণ হয়েছিল।

রোজনামচায় রাজীব লিখেছিল, 'আমাদের পুরাণে আছে যে পৃথিবীর নৃপতিরা সাফল্যের সঙ্গে ইন্দ্রকে আক্রমণ করেছিলেন। এই অভিযান কি সেই সাফল্য পাবে?'

বসন্ত অভিযানটির পরিকল্পনা করেছিলেন এইভাবে—প্রথমেই আবহমণ্ডলে অসংখ্য ধাতব কণা বর্ষণ করা হবে। এই ধাতব কণাগুলি সূর্যের তাপ শোষণ করে নেবে এবং সেই তাপ পৃথিবীর দিকে সরবরাহ করবে। ধাতব কণা বর্ষণ করার সময় সে ধরেই নিয়েছিল যে আবহমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত আগ্নেয় ভস্মকণার পরিমাণ কমে যাবে কারণ এতদিনে, পরিস্রবণের প্রক্রিয়া অনুযায়ী তাদের ভূপৃষ্ঠে থিতিয়ে পড়ারই কথা। সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে ভস্মকণাগুলি যে বিপদ ডেকে এনেছিল, ধাতব কণাগুলি সূর্যতাপ শোষণ করে সেই বিপদ দূর করবে—মোটের ওপর এই ছিল বসন্ত চিটনিসের ধারণা।

কিন্তু বসন্ত প্রথমে বুঝতে পারেননি যে তুষারযুগের মোকাবিলা করার জন্য ঐ ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। দেখা গেল যে আবহমণ্ডলে যে তুষারের গুঁড়ো বা তথাকথিত হীরকচূর্ণ রয়েছে তার পরিমাণ অনতিবিলম্বে হ্রাস করার দরকার। হীরকচূর্ণ অপসারণের একমাত্র উপায় হল আবহমণ্ডলে বিস্ফোরক উত্তাপ সৃষ্টি করা। বসন্ত বিস্ফোরক মারণাস্ত্রের কৃৎকৌশল ব্যবহার করে সফল হলেন। ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে মারণাস্ত্র নির্মিত হয়েছিল তাই কিন্তু শেষ অবধি প্রয়োগ করা হল প্রাণ রক্ষার গঠনমূলক কাজে। সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সব দেশই এগিয়ে এসেছিল। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মুখে গিয়ে না পড়লে এই ঐক্য কখনোই সম্ভব হত না। বসন্তের অধীনে বিশ্বের নানা দেশের বিজ্ঞানীরা প্রায় ছ মাস ধরে আবহমণ্ডলে তীব্র উত্তাপের সঞ্চার ঘটানোর বিষয়টি খতিয়ে দেখেছিলেন। সাফল্য সম্বন্ধে কিন্তু কেউই নিঃসন্দিহান ছিলেন না। সকলেরই মনে কাঁটার মত ফুটে ছিল একটাই প্রশ্ন—হীরকচূর্ণ অপসারণ শেষ অবধি সফল হবে কি?

সেপ্টেম্বর মাস এল। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ার আভাস দেখা দিল। গাঙ্গেয় উপত্যকায় বরফ গলতে শুরু করল। ধীরে ধীরে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফ্লোরিডা—এই বিশাল ভূখন্ড তুষারমুক্ত হতে শুরু করল। মায়ামি থেকে রিচার্ড হোমস্ বসন্তকে ফোন করে বললেন, 'অভিনন্দন, অধ্যাপক চিটনিস। ইন্দ্রলোকে অভিযান জয়যুক্ত হয়েছে। হীরকচূর্ণের পরিমাণ দ্রুত কমছে। সারা পৃথিবী জুড়ে আবার উষ্ণতার

সৃষ্টি হচ্ছে। বসন্ত, আপনি সত্যিই ক্ষণজন্মা প্রতিভা।'

অনেক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠার পর কোনো বিজ্ঞানীর কাজ যখন তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে যোগ্য সমাদর ও স্বীকৃতি লাভ করে তখন তিনি গভীর পরিতৃপ্তি বোধ করে থাকেন। অধ্যাপক বসন্ত চিটনিসের মুখেও তখন অনুরূপ অভিব্যক্তি ছিল। কিন্তু যেটা বোঝা যায়নি সেটা হল ঐ আপাত পরিতৃপ্তির তলায় লুকিয়ে ছিল প্রগাঢ় এক দুশ্চিন্তা, অনিশ্চয়তার এক আলোড়ন।

বসন্ত ভাবছিলেন যুদ্ধ তো জেতা হল। কিন্তু মহাযুদ্ধ যে এখনও সামনে! এরকম তো হয়েই থাকে যে তুমুল যুদ্ধে লড়াই করে জয়লাভ করার সঙ্গে বিজয়ীর সব শক্তি ও ক্ষমতা নিঃশেষিত হয়ে যায়। তুষারযুগের সঙ্গে যুদ্ধে এই সাফল্যের জন্য মানবজাতি নিজেকে বাহবা দিতে পারে কিন্তু আরও বড়, আরও কঠোর সংগ্রাম যে সামনে অপেক্ষামান। তুষারদৈত্যের হিংস্র আক্রমণ মানবজাতির প্রায় অর্ধেককে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ইন্দ্রলোকে অভিযান চালাতে প্রচুর জ্বালানী সম্পদ ও মূল্যবান রসদ খরচ করতে হয়েছে। এবং এবার যখন পৃথিবী জুড়ে বরফ গলবে তখন শুরু হবে এক বিধ্বংসী প্লাবন। এত কঠিন সব সমস্যা মোকাবিলা করার সময় মানুষের এই সহযোগিতার মনোভাব থাকবে তো? পারবে মানুষ এই লড়াইতে জিততে? বসন্ত অনুভব করলেন তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে।

বিগত দুবছরে অধ্যাপক বসন্ত চিটনিসের কপালে এই প্রথম ঘাম দেখা দিল।

প্রতারক

বাল ফোন্ডকে

ফাঁদে আটকে পড়ার সেই দিনটার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আটকা পড়ে গেলাম একটা গোলকধাঁধাঁর মধ্যে। প্রাণপণে চাইলেও ঘটনাটা আমি ভুলতে পারবনা। এর থেকে কখনও কি আমি আর বেরোতে পারব? অভিমন্যুর কথা আপনাদের জানা আছে? মহাভারতের সেই বালকবীর। চক্রব্যূহের মধ্যে চিরতরে যে হারিয়ে গেল। মহান কর্তব্যের দায়ে যাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। আমি কি এই যুগের অভিমন্যু হবো নাকি? আমার মনে হয় যে আমার এই চিন্তা, এই স্নায়বিক পরিশ্রম আমাকে পাগল করে দিচ্ছে। সাঙ্ঘাতিক মাথাধরার ব্যথা। না কি শরীরটাই ব্যথায় টনটন করছে! কোনো কিছুর সম্বন্ধেই আমি আর নিশ্চিত নই!

না, না, আমি নিশ্চিত। একটা ব্যাপার সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। প্রায় শেষের সীমায় পৌঁছে গিয়েছি আমি। সহনসীমার অন্তে গিয়ে পৌঁছিয়েছি। এখন খুব বেশিদিন আমি আর সহ্য করতে পারবনা। সেই কারণেই ব্যতিব্যস্ত করছি আপনাদের। দেখছি আপনারা যদি এর থেকে মুক্তির একটা হদিশ দিতে পারেন। দোহাই আপনাদের, এর থেকে আমাকে উদ্ধার করুন!

বুকে হাত রেখে বলছি—এইটাই একমাত্র কারণ। তা না হলে কেউ আমাকে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করাতে পারবেনা। হ্যাঁ, মশাই! ঠিক তাই—সরকারী গোপনীয়তা রক্ষার আইন অনুসারে আমি শপথবদ্ধ—আর এগুলো হল সব গোপন সামরিক তথ্য। ঈশ্বর, আমাকে অন্ধ করে দাও! এরকম সঙ্গীন অবস্থায় কখনও কাউকে পড়তে হয়েছে? ব্যাপারটি অতীব বিপজ্জনক। বিস্ফোরক! না, না। আমার আর মুখ না খোলাই ভাল! আর টুঁ শব্দটিও করবনা!

না! দুশ্চিন্তা করবেন না। ঐ খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ার মত কিছু আমি ঝোঁকের বশে করে বসবনা। কিন্তু আমি যে আর পারছিনা। সারাক্ষণ সমস্যাটা ভেতরে কুরে কুরে খাচ্ছে। অথচ এর সমাধান করতেও আমি অপারগ। মনে হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত গরম হয়ে

গেলে কামান যেমন ফেটে যায়। সরকারী গোপনীয়তা রক্ষার আইন জাহান্নামে যাক। চুলোয় যাক সব। আমাকে সবকিছু বলতেই হবে। নিজের জন্যেই কথাগুলো আমাকে বলতে হবে! সদাশিবের জন্যেও বলতে হবে!

ব্যাপারটা কি হল? ও হ্যাঁ! ঐ হতচ্ছাড়া সদাশিব যে কে সেটা আপনাদের বলিনি বোধহয়! বলেছি কি? দেখেছেন তো কাণ্ডটা। এইরকম দশাই হয়েছে আমার। এক মিনিটও পর পর গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারিনা। কিন্তু আপনাদের সঙ্গে এরকম করলে চলবেনা। আপনাদের খাতিরেই আমার শুরু করা উচিত একেবারে গোড়া থেকে। ক্ষমাঘেন্না করে একটু শুধরে নেবেন। কোনো খুঁটিনাটিই আমি বাদ দিচ্ছি না।

প্রথমে আপনাদের নিজের পরিচয়টা দিয়ে নেওয়া যাক। আমি হলাম লেফটেনাণ্ট কর্ণেল অরবিন্দ জামখেদকার, এ.এম.সি। ঠিকই ধরেছেন। আর্মি মেডিক্যাল কোর। হ্যাঁ, আমি হলাম শল্য চিকিৎসক। সামরিক বাহিনীর।

দুঃখিত? কি বললেন? ও হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। সামরিক বাহিনীতে আমরা, অর্থাৎ চিকিৎসকরা, সচরাচর ক্যাপ্টেন বা মেজর পদের ওপরে উঠতে পারিনা। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়ে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করেছিলাম।

ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের কাজ সত্যিই খুব ভাল হয়েছিল। আমাদের শল্যচিকিৎসকদের দলটি খুবই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। আমার পদোন্নতিতে এই অভিজ্ঞতা সাহায্য করেছিল। পরে এন.এ.এস.এ (নাসা)-এর চিকিৎসা বিভাগে প্রতিনিধি হয়ে কিছুদিন কাজ করার ব্যাপারটিও আমার পক্ষে যায়। সেটি ছিল সামরিক চিকিৎসায় উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যাপার। এই সুযোগে আমি কাছেই, হিউস্টনে, কিছুদিন মাইকেল ডিবাকে-র কাছেও প্রশিক্ষণ পেয়েছিলাম। ঠিকই ধরেছেন! ইনিই হলেন সেই মাইকেল ডিবাকে—হৃদযন্ত্র সংস্থাপনের শল্য চিকিৎসক হিসেবে যাঁর জগৎজোড়া খ্যাতি। ফিরে আসার পরেও নিত্য নৈমিত্তিক ঐ সর্দিকাশি আর কাটাছেঁড়ার চিকিৎসার মধ্যেও উপরোক্ত বিষয়ে গবেষণা আমি অব্যাহত রেখেছিলাম। ফলে 'ইণ্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ মিলিটারি মেডিসিন'-এ আমার প্রায় মোটের ওপর ছ'টি বেশ ভদ্রস্থ গবেষণা প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিল।

কি? আরে মশাই চলে যাবেন না! অবশ্য আপনার এটা ভাবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে যে লোকটা স্রেফ নিজের কথাই বলছে। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিজের সম্বন্ধে গালগল্প ছাড়ছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এইসব তথ্যগুলো বিশদভাবে আপনাদের আমাকে জানাতেই হবে। এর পেছনে একটা উদ্দেশ্যও রয়েছে।

সে কথায় পরে আসা যাবে। আপনাদের বলছিলাম যে কিভাবে ঘটনাটা শুরু

হল। দিনটার কথা এখনও স্পষ্ট মনে করতে পারি। রোদ্দুরে ঝলমলে একটা দিন? বেঁচে থাকার মতই সুন্দর। অপূর্ব একটা দিন। লালি-র জন্মদিন ছিল সেদিন। লালি মানে ললিতা—চিনলেন তো—আমার স্ত্রী।

না! কক্ষনো এটা যেন করবেন না! আমি আপনাদের যা বলছি তা যাচাই করার জন্যে ললিতার কাছে গিয়ে দোহাই কিছু বলতে যাবেন না। বলবেন না তো? কারণ হল ব্যাপারটার বিন্দুবিসর্গও সে জানে না। গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারটা সামরিক বাহিনীতে আমাদের মনে একেবারে গেঁথে দেওয়া হয়। কোনো গোপন কথা এমনকি অতিনিকট প্রিয়জনের কাছেও জানানো চলেনা।

মনে আছে তো সে দিনটা ছিল লালির জন্মদিন। বছরের ঐ দিনটা আমি কখনও ভুলিনা। প্রত্যেকবারের মত এবারও আমি ঐ দিন ছুটি নিয়েছিলাম। রাতে আমাদের বাইরে খেতে যাবার কথা ছিল। হয়তো পরে একটা সিনেমাও দেখা হত। আর সেইসঙ্গে কিছু কেনাকাটারও ব্যাপার ছিল। একটা শাড়ী বা ভাল কোনো পোশাক। কিছু একটা। মানছি যে দারুন কিছু একটা করার পরিকল্পনা আমাদের ছিল না। কিন্তু এরকম কালেভদ্রে এক একটা দিনই তো দৈনন্দিনতার একঘেয়েমি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে।

বেরিয়ে পড়ার জন্যে আমরা একেবারে প্রস্তুত এমন সময় কার ফোন বাজে? আমাদের কম্যানডাণ্ট, আবার কে? গ্যারিসনে আমার ডাক পড়েছে। তৎক্ষণাৎ!

লালি কি একেবারে ক্ষেপে অস্থির হয়ে গিয়েছিল? আমি আর তার চোখের দিকে তাকাতে পারিনি। সাদা কাপড়ের মতই ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল তাকে। নিঃশ্বাসে যেন আগুন ঝরছিল। হতভাগিনী লালি! সামরিক বাহিনীর এই জীবন গোল্লায় যাক। অবশ্য এতদিনে লালিও এটা ভালভাবেই বুঝে গেছে।

তড়িঘড়ি রওনা হলাম আমি। হাজিরা দিলাম কম্যানডাণ্টের কাছে। কেতাদুরস্তভাবে সেলাম ঠুকলাম।

আমার এই কম্যানডাণ্ট কিন্তু বড় ভাল লোক। এত ভাল অন্তঃকরণের মানুষ বড় কমই দেখা যায়।

তিনি বললেন, 'আমি দুঃখিত, ডাক্তার, তোমার সন্ধ্যেটা মাটি করার জন্য। কিন্তু এর মধ্যে আমার কোনো হাত নেই। সামরিক গোয়েন্দাবিভাগের সদর দপ্তর তোমাকে চায়। ব্যাপারটা জরুরী।'

হায় ভগবান। গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে আমার আবার কি সম্পর্ক? তবে? এটা কি নিছকই ওঁর ভান? কোনো তামাশা! নিখুঁত অভিনয়!

ভেবেছিলাম এটা গোয়েন্দা বিভাগেরই রসিকতা। অবশ্য এক্ষেত্রে বলা দরকার

যে,সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের সঙ্গে রসিকতার খুব একটা যোগাযোগ নেই। যাইহোক, সেটা আপাতত আমার বিচার্য নয়।

আমি তৈরি। না হয়ে আর উপায়ই কি বা ছিল। ব্রিগেডিয়ারকে সেটা জানিয়ে দিলাম। 'ঠিক আছে। সন্ধ্যের আগেই রওনা দিতে পারব।'

ভেবেছিলাম যে বাইরের খাওয়াটা দুপুরে সেরে সিনেমাটাও দেখে নেওয়া যাবে। কেনাকাটা না হয় লালিই করে নেবে। দোকানে ঐ গাদা করা শাড়ীর মধ্যে বরাবরই আমি অসম্ভব বিরক্ত বোধ করি। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার আমাকে স্বপ্নের দুনিয়া থেকে মাটিতে টেনে নামালেন।

'ফের বলছি আমি দুঃখিত। এটা এস.ও.এস.। বাইরে হেলিকপটার অপেক্ষা করছে, ওড়ার জন্যে প্রস্তুত। তুমি এখনই রওনা হয়ে যাও। ললিতা সোনাকে যা বলার আমিই বুঝিয়ে বলব। আর সময় নষ্ট কোরোনা। ঝটপট বেরিয়ে পড়ো।'

'হ্যাঁ, স্যার!' এইটুকুই কথা। কোনো প্রশ্ন চলবেনা। ব্রিগেডিয়ারকে আবার একটা সেলাম ঠুকে দৌড় লাগালাম হেলিকপটারের দিকে। তার পাখার ব্লেডগুলো বন্ বন্ করে ঘুরছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা ক্ষিপ্ত মিক্সি মেশিনের ব্লেড ঘুরছে।

গোয়েন্দা বিভাগের সদর দপ্তরে পৌঁছতে সোয়া ঘণ্টাও লাগেনি। কিন্তু তার মধ্যেই শীঘ্র পৌঁছবার জন্য তাড়া দিয়ে প্রায় আধডজন রেডিও বার্তা আমাকে পাঠানো হয়েছিল। হেলিপ্যাডে যখন আমি নামলাম তখন একটি জিপ ইঞ্জিন চালু করে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

এর পাঁচ মিনিট পরেই আমি গোয়েন্দা বিভাগের সদর দপ্তরে হাজির। বিভাগের প্রধান দুরন্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলেন। মুখটা দেখেই সেটা অনুমান করেছিলাম। সেলামটেলামের সামরিক আদবকায়দার কোনো তোয়াক্কা না করে তিনি আমার হাত চেপে ধরে, হিড় হিড় করে টানতে টানতে আমাকে অস্ত্রোপচার কক্ষে নিয়ে গেলেন। যা দেখবার তা সামনেই ছিল। উনি একটা কথাও বলেননি। বলার দরকারও হয়নি।

দেখেই মনে হল যে কাজটা আমিই পারব, একান্তই আমার কাজ এটা। খুঁটিনাটি সবটা তখন না জানলেও একটা আবছা ধারণা আমার তখনই তৈরি হয়ে গিয়েছিল...

টেবিলের ওপরে শুয়ে আছে এক জওয়ান। ভাল স্বাস্থ্য কিন্তু আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন। কি ভয়ঙ্কর সব ক্ষত! দেখে মনে হল তার প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। দেহের অনেক হাড়ও ভাঙা। পায়ের উরুর হাড় ভেঙে বিসদৃশ এক কোণে ঝুলে রয়েছে। কার্ডিয়োস্কোপ লাগানো। কিন্তু তার আলোক বিন্দুটি সরলরেখায় চলেছে।

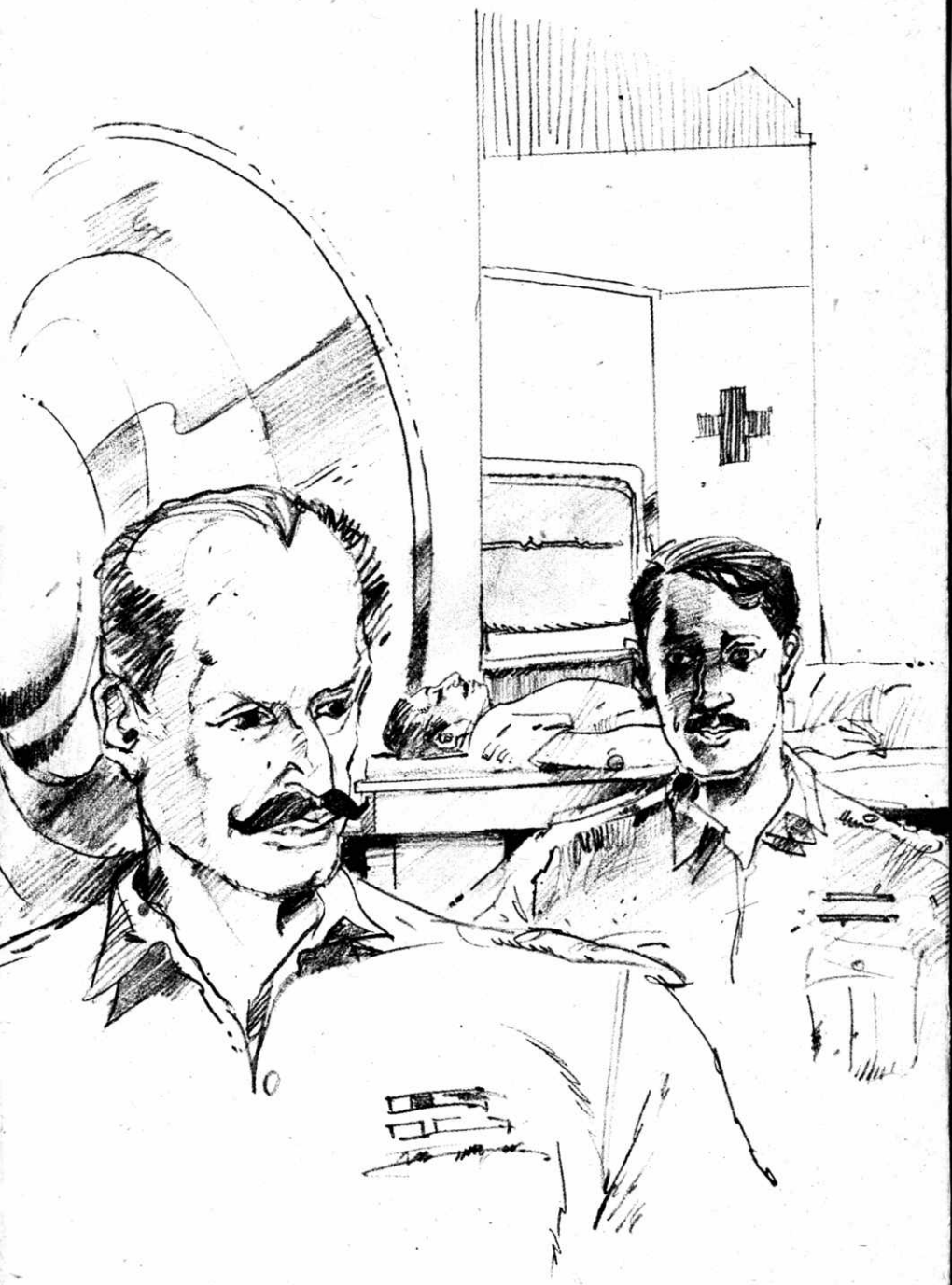

এমনভাবে চলেছে যেন সেও উর্দিপরা সৈনিক। সোজাসুজি চলেছে বিন্দুটি। বুঝলাম যে খাঁচা থেকে পাখি উড়ে গেছে। বুঝলেন কি বলছি? কার্ডিয়োস্কোপ দেখে বোঝা গেল যে হৃদযন্ত্রটি নিশ্চল হয়ে গেছে। ই.ই.জি. মেশিনও লাগানো ছিল। এর সঙ্কেতটি তাও মোটের ওপরে ভাল। অর্থাৎ মস্তিষ্কটি তখনও সচল...কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই গোলমেলে...

কয়েক মিনিট কারো মুখেই কোনো কথা নেই। সকলেই যেন এই ভয়ে ভীত যে সামান্যতম শব্দ হলেই ই.ই.জি-র সঙ্কেতটিও নিথর হয়ে যাবে।

সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান গলা ঝাড়লেন, 'ডাক্তার, তাহলে কেমন বুঝছেন?' আমি কোনো জবাব দিলাম না। কিই বা বলার ছিল আমার? একটা স্টেথিস্কোপ চেয়ে নিয়ে একটু কাজের ভান করলাম। জওয়ানটির চোখে কয়েকবার আলো ফেললাম। মনে হল মস্তিষ্কও ক্রমে বিকল হয়ে পড়ছে।

প্রধানই আবার নীরবতা ভঙ্গ করলেন। 'ডাক্তার, ইনি হলেন এখানকার চিকিৎসক, অমরজিৎ সিং।' লম্বা, খেলোয়ার সুলভ চেহারার শিখ যুবকটি আমাকে আড়ষ্টভাবে সেলাম করল। দেখলাম সে ক্যাপটেন। হাত বাড়িয়ে দিলাম করমর্দনের জন্য।

'আচ্ছা ডাক্তার, অমরজিৎ তো বলছে যে রোগীর হৃদ্‌যন্ত্র যদিও সাড়া দিচ্ছে না কিন্তু তার মস্তিষ্ক এখনও স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্কেত দিচ্ছে। তাই নাকি বলা যায় না যে রোগী মৃত। এ বিষয়ে আপনি কি একমত?'

'হ্যাঁ, স্যার। ষাট দশকের শেষদিকে যখন প্রথম হৃদ্‌যন্ত্র সংস্থাপন চালু হয় তখন এই নিয়ে কিছু আইনগত ও নৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। বিষয়টি ঘিরে বিস্তর বাদানুবাদও হয়েছিল। এবং শেষ অবধি স্থির হয় যে যতক্ষণ মস্তিষ্ক স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের ইঙ্গিত দেবে ততক্ষণ কাউকে মৃত, অন্তত চিকিৎসকের দৃষ্টিতে প্রাণহীন বলে মনে করা হবে না।'

প্রায় অধৈর্যভাবেই প্রধান আমাকে সহসা থামিয়ে দিলেন। 'ঠিক আছে, বুঝলাম। আমরা সকলেই এখানে একমত যে এই রোগী এখনও মারা যায়নি। সে বেঁচে আছে। বেশ ভাল কথা। আপনি ওকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করতে পারবেন? ওর মস্তিষ্ক এখনও ঠিকই কাজ করছে। শুধু হৃদ্‌যন্ত্রটি অচল হয়ে গেছে। একটা হৃদ্‌যন্ত্র আপনি সেলাই করে দিতে পারবেন? মানে, বলতে চাই যে পাল্টে আর একটা বসাতে? তাহলে সবদিক দিয়েই রক্ষা হয়। এইজন্যই আমরা আপনাকে ডেকেছি। ডাক্তার, একটা অন্য হৃদ্‌যন্ত্র আপনি বসিয়ে দিন।'

'হৃদ্‌যন্ত্র বসাবো? ওর শরীরে? এখন?' আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম। কথাগুলো এমনই অবিশ্বাস্য! 'কিন্তু, কিন্তু...'

'কিসের কিন্তু, ডাক্তার?'

'কিন্তু, কি করে এটা সম্ভব?'

'কেন সম্ভব নয়? আপনার সমস্যাটা কোথায়?'

'অস্ত্রোপচারটা মোটেই সহজ ধরনের নয়। এবং এটা শুরু করার আগে অনেক প্রস্তুতির দরকার। যেমন একটা হার্ট-লাং মেশিন। একটি ক্রায়োস্টাট। শল্য-চিকিৎসকদের একটা বড় দল থাকতে হবে...রোগীকে নানাদিক দিয়ে অস্ত্রোপচারের জন্য প্রস্তুত করারও একটা ব্যাপার রয়েছে। বেশ কয়েকটা ইঞ্জেকশনও দিতে হবে।'

'অমরজিৎ সেগুলোর ভার নেবে।'

'কিন্তু আসল ব্যাপারই হল যে হৃদ্‌যন্ত্রটি বসানো হবে সেটি নিয়ে। সেই হৃদ্‌যন্ত্র আপনি পাচ্ছেন কোথায়? যদি বা একটা যোগাড়ও করেন সেটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করতে হবে। তন্তুগুলোকে যাচাই করতে হবে। রক্তের শ্রেণীর মতই তন্তুর শ্রেণীতেও মিল আছে কিনা দেখতে হবে। তা না করলে যে দেহতে হৃদ্‌যন্ত্রটি বসানো হবে সেই দেহ এটি প্রত্যাখ্যান করবে। পরবর্তীকালে নতুন বসানো হৃদ্‌যন্ত্রটি ঐ দেহ কিছুতেই গ্রহণ করবেনা।'

'সে না হয় হল। ঐ প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটি যদি ঘটেও সেটা ঘটবে পরে। তাই নয় কি? মাত্র কয়েকদিনের জন্যেও আপনি যদি ওকে জীবন্ত করে তুলতে পারেন তাহলেই যথেষ্ট।'

'কিন্তু...ওরকম একটা হৃদ্‌যন্ত্র আপনি কোথায় পাবেন?'

'পাবো আমি ঠিকই। সন্ধান চলছে। তাতে যদি না পাওয়া যায় তাহলে একজন স্বেচ্ছাব্রতীর ব্যবস্থা করতে হবে।'

'নিশ্চয়ই আপনি এটা গুরুত্ব দিয়ে বলছেন না।' আমার গলার স্বর চড়ে গেল, 'আপনি বলতে চান..একজন জীবন্ত মানুষ, ভগবানের সৃষ্ট একটি মানুষকে আপনি হত্যা করবেন? স্রেফ তার হৃদ্‌যন্ত্রটি নেবার জন্যে?'

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমার মন বেশ নরম। সামরিক বাহিনীতে এত বছর কাজ করেও আমার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোতে মরচে ধরেনি। প্রধান আমাকে ধমক দিলেন।

'ওসব ভাবাবেগের ন্যাকামিতে গুলি মারো। বুঝলে! এটা করার জন্য আমি আদেশ দিচ্ছি।'

'দয়া করে ব্যাপারটা আপনি বুঝতে চেষ্টা করুন। ধরুন যা কিছু দরকার সব আপনি ঠিকঠাক পেলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও এমন আশা করা যায়না যে অস্ত্রোপচারটি সফল হবেই। আর রোগীর অবস্থাও খুব সঙ্গীন। অস্ত্রোপচার সফল হলেও ও

সামলাতে পারবে কিনা আমার সন্দেহ রয়েছে।'

'ডাক্তার, আমি রাখঢাক করতে চাইনা। একে বাঁচিয়ে তোলাটা চূড়ান্ত জরুরী যাতে সে কথা বলতে পারে। একটা বা দুটো ঘণ্টার জন্যে ওকে বাঁচাতে পারলেই যথেষ্ট। তাতেই চলবে। হৃদ্‌যন্ত্রটি বসিয়ে ওকে ঐটুকু সময়ের জন্যে আপনাকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে।'

'কিন্তু কেন? এত তাড়াহুড়োর কারণটা কি?' প্রধান চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সেটা আপনার জানার বিষয় নয়।' রাগে তিনি থরথর করে কাঁপছিলেন। এরপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বললেন, 'দেখুন ডাক্তার, এটা হল গোয়েন্দা বিভাগ। যার যতটুকু না জানলে নয়, সেই ভিত্তিতেই এখানে আমরা কাজ করি। আমি আপনাকে বড়জোর এটুকুই বলতে পারি যে লোকটি একটি অতীব গোপন তথ্য জানে। এমন একটা তথ্য যার রণনীতিগত গুরুত্ব অপরিসীম। এবারে আমাকে বলুন আপনার চূড়ান্ত ফয়সালা কি?'

আমার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। ঠোঁটের শুকনোভাবটা দূর করার জন্যে বৃথাই আমি চেষ্টা করছিলাম। আবার সেই রোগীর কাছে গেলাম। তাকে ভালভাবে পরীক্ষা করতে লাগলাম। ভাবলাম যে কথা বলার চেয়ে এটাই বোধহয় ভাল। বিগত এক ঘণ্টায় রোগীর সম্বন্ধে যে তথ্যসমূহ পাওয়া গেছে তা খতিয়ে দেখলাম। ই.ই.জি-র থেকে পরিস্থিতির কি চিত্র ফুটে ওঠে তার ওপরে মনোনিবেশ করলাম। হিসেব করলাম, পুনরায় গণনা করে দেখলাম। মস্তিষ্কের অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে আমার কানের পেছনে বেদনা হচ্ছিল। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিতই থেকে গেল। আর তা ছাড়া প্রতি মিনিটে যে ক্ষীণতম আশা ছিল তাও যেন চলে যাচ্ছিল। হতাশায় মাথা ঝাঁকিয়ে আমি বললাম, 'দুঃখিত, স্যার। আপনি যদি আদেশ করেন আমি অস্ত্রোপচার করব। কিন্তু ওকে বাঁচিয়ে তোলার আশা খুবই ক্ষীণ। এতই ক্ষীণ যে ঐ সাঙ্ঘাতিক দরকারী তথ্যটি আপনি আর পাবেননা। আর সর্বোপরি একজন স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবীরও প্রাণ যাবে। সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা স্যার, আমি আপনার ওপরেই ছেড়ে দিলাম।'

হতাশ হয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন প্রধান। 'না, না ডাক্তার। আমি সম্পূর্ণভাবে আপনার ওপরে নির্ভর করছি। আপনার অত অভিজ্ঞতা, আপনার বিশেষ প্রশিক্ষণ, আপনার...'

'হ্যাঁ, স্যার। সে সবই রয়েছে! কিন্তু...আমি, আমি তো ঈশ্বর নই!'

'তাহলে কি কোনো রাস্তাই নেই?'

'মাফ করবেন, স্যার। ভালভাবেই জানি যে আপনাদের ঐ গোপন তথ্য জানাদের

তালিকায় আমি পড়িনা। কিন্তু সবটা যদি আপনি খুলে বলেন তাহলে হয়তো সমাধানের একটা রাস্তার হয়তো আমি খোঁজ দিতে পারব। হাজার হলেও, আমিও তো সামরিক বাহিনীরই লোক। এর শৃঙ্খলা আমি জানি। গোপন তথ্য আমিও গোপন রাখতে পারি। যদি...'

পরিস্থিতি তখন এমনই সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল প্রধানও তাঁর গোপনীয়তার শপথ ভঙ্গ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই কারণেই তিনি মনস্থ করেন যে আমাকে সবকিছুই খুলে বলবেন। আজ মনে হয় যে উনি তখন এতটা নরম না হলেই যেন ভাল ছিল। তাহলে এখনকার এই জটিল অবস্থার মুখোমুখি আমাদের হতে হত না।

প্রধান বলতে শুরু করলেন, 'ডাক্তার ত্রই জওয়ান হল...ক্যাপ্টেন সদাশিব গোখলে। ও ছিল, মানে এখনও আছে যদিও, আমাদের সেরা কর্মী।'

প্রধানের কাছে তখন ক্রিয়ার কাল গুলিয়ে যাচ্ছিল।

'আমি ওকে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলাম, অত্যন্ত বিপজ্জনক এক অভিযান। শত্রুপক্ষের সীমানার ভেতরে ঢুকে ওদের যুদ্ধের পরিকল্পনা হস্তগত করতে হবে। ওদের লক্ষ্য হল অতর্কিতে একটা আগাম আঘাত হানা। কিন্তু শব্দের চেয়ে অধিক গতিশীল জঙ্গী বিমানগুলি এখনও আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়নি। অতএব আমাদের হাতে এখন দরকার সময়ের। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে প্রাথমিক এই সংঘর্ষের ওপরেই যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করছে। সেই কারণেই এই তথ্যের এত প্রয়োজনীয়তা। তা ছাড়াও এই যুদ্ধের পরিকল্পনা যদি জোরালো প্রমাণ হিসেবে ওদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারি তাহলে কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও আমরা ওদের হারিয়ে দিয়ে জিততে পারব। সেক্ষেত্রে হয়তো গোটা যুদ্ধটাই আমাদের পক্ষে এড়ানো সম্ভব হবে। এই চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে গিয়েছিল এই সদাশিব। পেশোয়ার নামানুসারে তাকে ছদ্মনাম দেওয়া হয়েছিল ভাউসাহেব। কাজটি সে ভালভাবেই সম্পন্ন করে এবং সফল হয়েছে বলে আমাদের একটি রেডিও বার্তাও সে পাঠিয়েছিল সদাশিব ফিরে আসছিল এবং আমরাও অধীরভাবে তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সম্ভবত শেষ মুহূর্তে সে ধরা পড়ে যায়। এই অবস্থায় তাকে সীমান্ত পেরিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। আমি নিশ্চিত যে ওরা ভেবেছিল যে সদাশিব মরে গেছে। এমনকি এখানে নিয়ে আসার সময় আমরাও আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওর হৃদ্‌স্পন্দন ছিল খুবই ক্ষীণ। প্রায় শোনাই যাচ্ছিল না। এখন তো তাও বন্ধ হয়ে গেছে। এ এক মারাত্মক ক্ষতি। ছেলেটাকে আমি সত্যিই বড় পছন্দ করতাম। কিন্তু তার থেকে অনেক দরকারী হল সেই তথ্য যা সদাশিবের মস্তিষ্কে ছিল। সে তথ্য আর পাওয়া যাবেনা। তার চেয়েও খারাপ হল যে শত্রুপক্ষ সতর্ক হয়ে গেছে।

ওরা ওদের আক্রমণের কর্মসূচী এগিয়ে আনতে পারে। এখন সদাশিবের মত আর কোনো জওয়ানকে পাঠানোরও কোনো পথ নেই। এই অভিযানের পুরোটাই একেবারে গণ্ডগোল হয়ে গেল। এখন এই কারণে আমরা যদি যুদ্ধে হেরে যাই...'

প্রধানের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। বেদনার ভাবাবেগ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা। সত্যি বলছি, একটা ছুঁচ পড়লেও আপনারা শব্দ পেতেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে। আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেই মুহূর্তে চিন্তাটা আমার মাথায় খেলে গেল। এমন চমক লেগেছিল নিজের যে পায়ের তলায় যেন সহসা মাইনের বিস্ফোরণ ঘটেছে। চিন্তাটা মাথা থেকে আমি দূর করে দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তার সম্ভাবনা, অগ্নিপরীক্ষার এই সুযোগ আমাকে উত্তেজিত করে তুলেছিল।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'স্যার! এটা কি সম্ভব হতে পারে যে সদাশিব কোথাও এই তথ্য লিখে রেখেছিল! হতে পারে ও সঙ্কেতলিপিতে লিখেছিল!'

'অসম্ভব। অভাবনীয়। ওরকম গর্হিত ভুল কেউ করতে পারেনা। অন্তত সদাশিব তো নয়ই। এই তথ্য শুধু সে নিজের ভেতরে রেখেছিল, নিজের স্মৃতিতে।'

'তাই যদি হয় স্যার, আমার একটা পরিকল্পনা আছে। দেখুন আপনার কেমন লাগে। এটা যদি সফল হয় তাহলে আপনি আপনার তথ্য পাবেন। সদাশিবের আত্মবলিদানও ব্যর্থ হবেনা। আপনি যে স্বেচ্ছাব্রতীর কথা বলেছিলেন তাকে আমার অবশ্যই দরকার পড়বে কিন্তু এর জন্য তার প্রাণ নেওয়ার প্রয়োজন হবেনা।'

'বলো কি ভাবছ? খুলে বলো। জলদি করো। ধানাই পানাই কোরোনা।'

'কিন্তু আমি স্যার আপনাকে আগেই সাবধান করে দিচ্ছি। দুনিয়াতে কোথাও এরকম কোনো পরীক্ষা হয়নি। এ একেবারে অন্ধকারের মধ্যে আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মত। এমন কোনো ভরসা নেই যে পরীক্ষাটি সফল হবেই। তবুও...'

'সেটা আপনি আমার ওপরে ছেড়ে দিন। বলুন, তাড়াতাড়ি বলুন!'

'স্যার, যদিও আমি একজন শল্যচিকিৎসক, হৃদ্‌যন্ত্র সংস্থাপন বিশেষজ্ঞ, কিন্তু সবসময়েই স্নায়ু-শরীরবিদ্যাই হচ্ছে আমার প্রিয় বিষয়। এ বিষয়ে যা কাজকর্ম হচ্ছে সে খবর আমি রাখি। সময় পেলে কিছু গবেষণাও করে থাকি।'

'আহা, আসল কথাটাই বলুন না। বলে যান!'

'স্যার, ম্যাককনেল নামে এক বিজ্ঞানী ফিতাকৃমির ওপরে একটি চিত্তাকর্ষক পরীক্ষা করেন। এরপরে দেশত্যাগী হাঙ্গেরীয় বিজ্ঞানী আনগার পরীক্ষাটি করেন ইঁদুরের ওপরে। আসলে নেংটি ইঁদুরের ওপর। শরীরবিদ্যার দৃষ্টিতে নেংটি ইঁদুর আর মানুষ বলতে গেলে বেশ কাছাকাছি। এই কারণেই ওদের ওপরে পরীক্ষার যে

ফল পাওয়া গেছে মানুষের ক্ষেত্রেও তা ঘটার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

'এখন, এটা মোটের ওপর সকলেই জানে যে নেংটি ইঁদুররা সচরাচর অন্ধকার পছন্দ করে। বাড়িতে যে ইঁদুর থাকে তাদের উদাহরণই ধরা যাক। দিনের বেলায় কদাচিৎ আপনি তাদের দেখতে পাবেন। কিন্তু রাত হলে অন্য ব্যাপার। তখন তারাই রাজা। এখানে ওখানে খাবারের সন্ধানে ছুটে বেড়ায়। দিনের বেলা তারা লোকচক্ষুর অগোচরে লুকিয়ে থাকে। কখনও কোনো অন্ধকার ফাটলে, কখনো মাটির মধ্যের গর্তে। ইঁদুরদের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিয়েই ছিল আনগারের গবেষণার আয়োজন।

'তিনি সমান দুইভাগে বিভক্ত একটি বিশেষ ধরনের খাঁচা তৈরি করেন। একটি ভাগে ছিল জোরালো আলো, এবং অন্য অর্ধে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এই খাঁচায় আনগার কয়েকটা নেংটি ইঁদুর রেখেছিলেন। খাদ্য ও জল রাখা ছিল আলোকিত অর্ধে। কিন্তু নেংটির দল সেখানে যেতে চাইতনা। সেখানে ওরা দৌড়ে যেত এবং মুখে কিছুটা খাবার নিয়েই দৌড়ে ফিরে আসত অন্ধকারের মধ্যে। আনগার তখন খাঁচার অন্ধকার দিকটিতে বিদ্যুৎবাহী তার বসিয়ে দিলেন। ফলে যখনই কোনো নেংটি অন্ধকার অর্ধে ঢুকত অমনি তার বৈদ্যুতিক শক্ লাগত। এই শকের মাত্রা কিন্তু এমন ছিল না যাতে নেংটি ইঁদুরগুলি পঙ্গু হয়ে যায় বা মারা পড়ে। শকটা ছিল ভয় পাওয়াবার পক্ষে যথেষ্ট যাতে নেংটি ইঁদুররা আবার তড়িঘড়ি আলোকিত অর্ধে পালিয়ে আসে। এই পরীক্ষাটি কিছুদিন ধরে চালানো হল যতদিন না নেংটিদের মধ্যে একটি শিক্ষা বা ধারণা মনে গেঁথে যায়। এইভাবে ক্রমে তাদের মধ্যে অন্ধকার সম্বন্ধে একটা ভীতি গড়ে উঠল। দেখা গেল যে তারে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ করে দিলেও তারা আলোকিত অর্ধে থাকাই পছন্দ করছে। তাঁর ফল সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আনগার খাদ্য অন্ধকার অর্ধে রাখা শুরু করলেন। কিন্তু দেখা গেল যে নেংটিরা সেই খাদ্য আলোকিত অর্ধে নিয়ে আসছে।

'এইভাবে চলতে চলতে আনগার যখন নিশ্চিন্ত হলেন যে অন্ধকার সম্বন্ধে এই ভীতি নেংটি ইঁদুরদের মস্তিষ্কে দৃঢ়ভাবে বসে গেছে তখন তিনি শুরু করলেন পরীক্ষাটির দ্বিতীয় পর্যায়। তখন বিজ্ঞানীরা এমন একটি প্রকল্প দিয়েছিলেন যে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি মস্তিষ্কের একটি নির্দিষ্ট অংশে অবস্থান করে এবং এই স্মৃতি আর.এন.এ. নিউকলেইক এসিডের অণুর মধ্যে রাসায়নিক রূপে মজুত থাকে। যে ইঁদুরগুলোকে অন্ধকার ভয় পেতে শেখানো হয়েছিল আনগার এবার তাদের মেরে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করেন এবং মস্তিষ্কের যে অংশে স্মৃতি অবস্থান করে সেখান থেকে আর.এন.এ নিয়ে একেবারে নতুন একদল নেংটি ইঁদুরের দেহে ঐ আর.এন.এ. ইঞ্জেকশন করে প্রবিষ্ট

করান। আনগার দেখলেন যে নতুন এই নেংটি ইঁদুরগুলোও অন্ধকার ভয় পাচ্ছে। স্মৃতি যে আর.এন.এ-র মধ্যে থাকে, এই প্রকল্পটি এইভাবে পরীক্ষালব্ধভাবে প্রমাণিত হল। বলাই বাহুল্য যে এরপরে এ বিষয়ে আরও বহু পরীক্ষা করা হয়েছে, এখনও হচ্ছে এবং তত্ত্বটিও সমর্থনলাভ করছে।'

'ধন্যবাদ, ডাক্তার। এই শিক্ষাদানের জন্য।' প্রধানের কণ্ঠে বিদ্রূপ ঝরে পড়ছিল।' কিন্তু দয়া করে আমাকে বলবেন কি যে আমাদের হাতে এখন যে সমস্যা আছে তার সঙ্গে এর সম্পর্কটা কোথায়?'

'সেই কথাতেই তো আসছিলাম, স্যার। এই জন্যেই একটু আগে আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে সদাশিব কোথাও ঐ তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারে কিনা। সেটা যখন নেই তখন এটাই ধরে নেওয়া যায় ইঁদুরেরা যেভাবে স্মৃতি তাদের মস্তিষ্কে রেখেছিল সদাশিবও অনুরূপভাবে ঐ তথ্য তার মস্তিষ্কে রেখেছে। এখন ওর মস্তিষ্কের স্মৃতিবাহী অংশটি থেকে আর.এন.এ. সংগ্রহ করে যদি আমরা অন্য একজনের দেহে তা প্রবিষ্ট করাই তাহলে তারও পক্ষে ঐ রাসায়নিক ভাষাকে আমাদের কাছে বোধগম্য ভাবে অনুবাদ করে দেওয়া সম্ভব হবে। কে ধরনের চৌম্বক লিপিতে টেপের ওপরে সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করে টেপরেকর্ডার। এবং এরপরে অন্য কোনো যন্ত্রে সেই ক্যাসেট বাজালে ঐ সঙ্গীতই বেজে ওঠে। আমাদের দরকার একটি তাজা মস্তিষ্ক, একজন স্বেচ্ছাব্রতী। এখন বোধহয় বুঝতে পারছেন যে...'

'সাবাশ! সাবাশ!' উত্তেজিত প্রধান আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। 'জবাব নেই, ডাক্তার! অসাধারণ!'

'দাঁড়ান! দাঁড়ান!' তাঁর উৎসাহ কিছুটা স্তিমিত করার চেষ্টা তখন আমার। 'আমার কথায় হয়তো আপনার মনে হয়েছে যে ব্যাপারটা সহজ। কিন্তু জানবেন যে পরীক্ষাটিতে বিস্তর ঝুঁকি আছে। পরীক্ষাটি যে সফল হবে এমন কোনো গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নয়। এ পরীক্ষা কেউ কখনও করেনি। সুস্থ মাথায় কেউ করবেও না। আমিও করতাম না। তার কারণ মানুষের ওপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপরে সঙ্গত কারণেই অনেক বিধিনিষেধ রয়েছে। ওরকম কোনো পরীক্ষা করলে আমাকে অপরাধী বলে চিহ্নিত করা হবে। কিন্তু আপনি দেখছি এসব নৈতিক ব্যাপার স্যাপার নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না। এবং সবটাই গোপন রাখতে পারবেন আশা করি। তাই এই পরীক্ষা করতে আমি রাজী হয়েছি। তবুও এর সম্ভাব্য ফল-পরিণাম সম্বন্ধে আপনাকে আমি সাবধান করে রাখছি।'

'এ ব্যাপারে পূর্ণ দায়িত্ব আমার। আপনি যা দরকার তা করতে থাকুন। শুধু আমাকে বলুন যে কি কি আপনার দরকার।'

'বলছি। ঐ স্বেচ্ছাব্রতীকে তরুণ এবং সুস্বাস্থের অধিকারী হতে হবে। অবিবাহিত হলেই ভাল হয়। কোনো গণ্ডগোল হলে তাহলে আমাদের তার স্ত্রীর মুখোমুখি হতে হবেনা।

লালির জন্মদিনের স্মৃতি নিশ্চয়ই আমার মনের কোনো অন্ধকার কোণে লুকিয়েছিল।

এরপর আমরা আর সময় নষ্ট করিনি। পরীক্ষাতে আমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। এক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের পরে রোগীর অবস্থা নিয়ে উদ্বেগের কোনো কারণ না থাকলেও অস্ত্রোপচারটি উপযুক্ত যত্ন ও দক্ষতার সঙ্গে করতে হয়েছিল।

এখন অবধি শুনে কি মনে হচ্ছে? দাঁড়ান, বলছি। ঈশ্বরের কৃপায় সদাশিবের মস্তিষ্ক থেকে আর.এন.এ সংগ্রহ করতে কোনো সমস্যাই হয়নি। আর প্রধান যে স্বেচ্ছাব্রতীটিকে যোগাড় করেছিলেন সেই বিশ্বনাথ কারাণ্ডে একেবারে টগবগে যুবক। টাট্টু ঘোড়ার মত। আমি বলেছিলাম যে স্বর্গও সদাশিব ও ঐ স্বেচ্ছাব্রতীর মাতৃভাষা এক হতে হবে। অন্য ভাষা হলে হয়তো নতুন ঝামেলার সৃষ্টি হবে। বিশ্বনাথের দেহে তো সদাশিবের মস্তিষ্ক থেকে নেওয়া আর.এন.এ ইঞ্জেকশন করলাম। পরের দিন পরীক্ষার ফলের সামান্য একটু ইঙ্গিত পাওয়া গেল। আরও দুটো দিন আমরা কাটতে দিলাম। তারপর শুরু হল টেপ রেকর্ডার নিয়ে আমাদের কাজ। আমি একদিকে ওর শরীরের নানা বিষয় পরীক্ষা করছিলাম। অন্যদিকে প্রধান শুরু করলেন তাঁর জেরা। কখনও তিনি বিশ্বনাথকে সরাসরি প্রশ্ন করছিলেন। মোক্ষম সব প্রশ্ন। আবার ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এমন প্রশ্ন করছিলেন যার থেকে বোঝা যায় বিশ্বনাথ ঠিক বলছে কিনা। কিছু সাঙ্কেতিক শব্দ কেবল সদাশিবই জানত। সেগুলো বিশ্বনাথ বলতে পারে কিনা প্রধান দেখছিলেন। সংক্ষেপে বিশ্বনাথ যা বলছে তাই প্রকৃত তথ্য কিনা সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন। দিনগুলো যেন ছাব্বিশ ঘণ্টার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদ যখন শেষ হল তখন আমরা যারপরনাই ক্লান্ত। কিন্তু মন ছিল পরিতৃপ্তিতে ভরপুর।

আমাদের পরীক্ষা চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করেছিল। এতটা আমরা আশাই করিনি। যা কিছু জানার দরকার ছিল প্রধান তার সবটাই জানতে পেরেছিলেন। এর ফলে আমাদের কূটনৈতিক তৎপরতা অভিযানও খুব জোরদার হয়েছিল। আমরা যুদ্ধ এড়াতে পেরেছিলাম। সেসব তো আপনারা খবরের কাগজে সবই পড়েছেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমার যে কি আনন্দ হয়েছিল তা আপনারা বিজ্ঞানী না হলে ঠিক বুঝতে পারবেন না।

প্রধান তো আমাকে হৃদয় উজাড় করে অভিনন্দন জানালেন। কথাও দিলেন যে পরম বিশিষ্ট সেবা পদক ও পুরোদস্তুর কর্ণেল পদের জন্য আগামী বছর তিনি

আমার নাম সুপারিশ করবেন।

প্রায় এক সপ্তাহ আগে তাড়াহুড়ো করে আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। লালি নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তা করে করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এবার প্রধান আমাকে নির্দ্বিধায় ছুটি দিলেন। বিশ্বনাথের শরীরের অবস্থা তখন স্বাভাবিক।

অতএব, ভবঘুরে তো আবার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করল। তারপর টানা এক সপ্তাহ ধরে চলল লালির জন্মদিন উদ্‌যাপনের উৎসব।

এরপর প্রায় একমাস কেটে গেল। কাল বড় দ্রুত অতিবাহিত হয়। আবার ডাক এল প্রধানের দপ্তর থেকে। আমি ভাবলাম যে বিশ্বনাথের অবস্থা নির্ঘাৎ খারাপ দিকে মোড় নিয়েছে। হয়তো কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া বা এলাহির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কালবিলম্ব না করে আমি সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সদর দপ্তরে পৌঁছলাম। এবারে প্রধান কিছু বলার আগেই আমি বিশ্বনাথের খবর জানতে চাইলাম।

তিনি চাঁছাছোলাভাবে বললেন, 'সে ভালই আছে' এবং আমার দিকে একটা চিঠির খাম এগিয়ে দিলেন।

খামটা খুললাম। গোলাপী কাগজে মেয়েলী হস্তাক্ষরে লেখা। পঙ্‌ক্তিগুলি একদিকে হেলে পড়েছে। ঠিকই ধরেছিলাম। তলায় নাম দেখলাম 'পার্বতী'। কিন্তু চিঠির অর্থ কিছুই উদ্ধার করতে পারলাম না। প্রধানের দিকে তাকালাম। এই হেঁয়ালির অর্থ?

প্রধান বললেন, 'সদাশিবের স্ত্রী'। কিন্তু এটা আমার প্রশ্নের জবাব নয়।

এবং চিঠিতে যা লেখা তাতে ব্যাপারটা বেশ জটিল বলে ঠেকল। গোটাটাই হচ্ছে পার্বতীর তিক্ত অভিযোগ। সে জানতে চেয়েছে যে দপ্তর তার স্বামীর ওপরে কি করেছে? তার মধ্যে নাকি আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। তার স্বামী আছে ঠিকই কিন্তু তার চেহারা পাল্টে গেছে। ভাবভঙ্গি পাল্টেছে।

এমন কি তার দৈহিক গড়নও বদলে গেছে। সামরিক বাহিনী থেকে নিশ্চয়ই তার স্বামীকে তুক জাতীয় কিছু করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পার্বতী সদুত্তর চায়।

আমি তো একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম। সদাশিব তো মৃত। আমি নিজে তার দেহ দাহ করার সময় উপস্থিত ছিলাম। কে এই ছোকরা যে হতভাগা মেয়েটাকে এইভাবে বোকা বানাচ্ছে?

'আপনারা কি পার্বতীকে সদাশিবের মৃত্যু সংবাদ দেননি?'

'দিয়েছিলাম। এই কারণেই ব্যাপারটা নিয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে। হতে পারে যে এটা শত্রুপক্ষের কোনো গুপ্তচরের কাণ্ড!'

'কিন্তু পার্বতীর এই ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছিনা। সে বলছে যে এই লোকটা সদাশিবের থেকে অনেক দিক দিয়েই আলাদা। তবুও কেন সে নিশ্চিত যে ঐ লোকটা সদাশিব, কোনো প্রতারক নয়?'

'এটা তো আমারও মগজে ঢুকছেনা। হয়তো মেয়েটার পক্ষে মানসিক উত্তেজনার মাত্রাটা বর বেশি হয়ে পড়েছে। মাথাটা হয়তো বিগড়েই গেছে বেচারির। এই জন্যেই তো আপনাকে ডাকিয়ে আনা। চলুন, একবার পার্বতীর সঙ্গে দেখা করে আসি। যাবেন নাকি?'

'অবশ্যই যাবো, স্যার।'

পার্বতীই দরজা খুলেছিল। আমরা নিজেদের পরিচয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল তার একতরফা অভিযোগ। শত্রুপক্ষের কামানও বোধ হয় এত জোরে দাগা হয় না।

'আপনারা ওর ওপর কি করেছেন, হুজুর?' পার্বতীর গলায় করুণ অনুনয়। 'যখন ও গেল তখন ওর মনে কত আনন্দ, শরীর কত ভাল, কত ভাবত আমার কথা। আর এখন? সেই লোকটাই বিলকুল পাল্টে গেছে। শুধু তার মুখ, তার শরীর বা..বা...আমি বোঝাতে পারছিনা। কিন্তু সে আর তেমন নেই। একদম বদলে গেছে।'

'তাই তো। তুমি বুঝতে পারছোনা মা। ও সদাশিবই নয়।' প্রধানের কণ্ঠে সহানুভূতির সুর। 'সদাশিব দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে। বীরের মৃত্যু বরণ করেছে। আমার বলতে খারাপ লাগছে তবুও...'

'না! না! সদাশিব বেঁচে আছে। ভাল আছে। ঐ তো ঘুমোচ্ছে পাশের ঘরে।'

'কিন্তু মা, তুমি নিজেই তো বললে যে যে...মানে ওঘরে যে ঘুমোচ্ছে...তাকে সদাশিবের মত দেখতে নয়। আচরণও অন্যরকম। এবার নিজেই বলো, এ কোনো প্রতারক বাদে আর কেউ কি হতে পারে?'

'না হুজুর। আমি নিশ্চিত যে ওই হল সদাশিব। তা না হলে সে কি করে তার জীবন, তার ছোটবেলার জীবন, আমাদের সব, সব কথা জানবে। সব খুঁটি নাটি সবকিছু। আর তা ছাড়া...এমন কতগুলো..' পার্বতী একটু থতমত খায়। তারপরেই নতুন উদ্যমে কিছুটা বেপরোয়া ভাবেই বলে, 'এমনকি আমাদের একান্ত গোপন কিছু ব্যাপার, যা আর কেউ জানতে পারেনা।'

কোনো সন্দেহই নেই যে লোকটা একটা পাকা ধড়িবাজ। আমরা পার্বতীকে বললাম ওকে ডাকতে। প্রধান তাঁর বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত। লোকটি এই ঘরে এসে ঢুকল।

আমাদের তো প্রকৃতই পালসের ঘায় মূর্ছা যাবার দশা! কে আবার? বিশ্বনাথ।

'নচ্ছার! দাঁড়া তোকে মজা দেখাচ্ছি...' তাড়তাড়ি আমি প্রধানকে থামালাম। কি ঘটেছে সেটা কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলাম। কোনো মতে পার্বতীকে কিছুটা শান্ত করলাম। সেইসঙ্গে প্রধানকেও। বিশ্বনাথকে বললাম সঙ্গে আসতে। ওর সঙ্গে শুধু অল্প একটু কথাবার্তার আমার দরকার ছিল। আঁচ আমি ঠিকই করেছিলাম।

বিশ্বনাথকে ছেড়ে দিয়ে আমরা আবার সদর দপ্তর অভিমুখে রওনা দিলাম।

জিপের গতি বাড়ছিল। প্রধানকে বললাম, 'আপনাকে যখন বিশ্বনাথের কথা জিজ্ঞেস করলাম তখন আমাকে কিছু বলেননি কেন?'

'বললাম তো সে ভালই আছে। বলিনি আপনাকে? নিজের চোখেই তো দেখলেন। আমাদের কাজটা শেষ হবার পরে আমি ওর ছুটি মঞ্জুর করে দিয়েছিলাম। কি করে জানব যে নচ্ছারটা এখানে এসে জুটবে? এসে মেয়েটাকে বোকা বানাবে?'

'ওর মধ্যে বিশ্বনাথের কোনো দোষ নেই, স্যার। বুঝতে পারছেন না কি ঘটেছে। সদাশিব তার জীবনকালে যা কিছু জানতে পেরেছিল তার স্মৃতি তার মস্তিষ্কে মজুত ছিল। এর একটা অত্যন্ত ছোট্ট অংশ আমাদের জানার দরকার ছিল। কিন্তু আমরা পুরো আর.এন.এ. সংগ্রহ করে সবটাই বিশ্বনাথের দেহে ইঞ্জেকশন করেছিলাম। এর ফলে সদাশিবের স্মৃতির পুরোটাই বিশ্বনাথের মস্তিষ্কে সংস্থাপিত হয়। এই কারণেই সে প্রকৃত অর্থেই বিশ্বাস করে যে সে-ই সদাশিব। পার্বতীকেও তাই সে এটা বুঝিয়েছে। আর বিশ্বনাথের নিজের যে স্মৃতি—সেটাতো পুরোটাই রয়েছে। এখন তার সঙ্গে সংস্থাপিত স্মৃতি জড়িয়ে জট পাকিয়ে গেছে। খুব ঝামেলার ব্যাপার। এ যেন একটা টেপে আগে যা তোলা ছিল তা মুছে না ফেলেই তার ওপরে নতুন কিছু তোলা হয়েছে। একটা ফিল্মেই দুটো ছবি উঠে গেলে যেমন হয়।'

সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানকে তো আমি সবটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে সক্ষম হলাম। কিন্তু কি করে আমি পার্বতীকে বোঝাবো? ও তো পাগল হয়ে যাবে। তোলপাড় হয়ে যাবে ওর মন। কি করে পার্বতীকে বলব যে ওর স্বামীর ওপরে গিনিপিগের মত পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। আর তা ছাড়া পার্বতী তো একা না। বিশ্বনাথও রয়েছে। ও এখন কোনোকিছুরই কূলকিনারা করতে পারছেনা। সবটা খুলে বললে ওর অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ভাবা যায়? দুজন মানুষের জীবন নষ্ট করে দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত হতে আমি চাই না।

হায় ঈশ্বর! এত বছর সামরিক বাহিনীতে কাটালেও আমার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোতে মরচে ধরেনি।

এখন সবটা শুনলেন তো! সেই দিন থেকে আমরা এই গোলকধাঁধার মধ্যে

আটকা পরে গেছি। আমি আর সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান। বিশেষ করে আমি। সোজাসুজি স্বাভাবিকভাবে কিছু আর ভাবতে পারিনা। রাতের পর রাত ঘুম হয় না। সদাশিবের আত্মা যেন আমায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। দয়া করে দেখুন না যদি আমাকে একটা মুক্তির উপায় বাতলাতে পারেন।

যদি পারেন তো একটা চিঠি দিতে ভুলবেনা। নাম ও ঠিকানা বলছি কর্ণেল জামখেদকার, আর্মি মেডিকাল কোর, নয়াদিল্লি।

মারাঠী গল্প

দ্বিতীয় আইনস্টাইন

লক্ষ্মণ লোনধে

সারা ভারত চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান (অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকাল সায়েন্সেস) একটি বিশাল চিকিৎসা কেন্দ্র। এর দ্বিতীয়, চতুর্থ ও নবম তলায় রয়েছে তিনটি নিবিড় শুশ্রূষা কেন্দ্র (ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট)। তার মধ্যে নবম তলারটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত। ঐ নবম তলার কেন্দ্রটিতে গত সপ্তাহ ধরে অভূতপূর্ব কর্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা ড: শ্রীনিবাসনকে ভর্তি করা থেকে এই চাঞ্চল্যের সূত্রপাত। ক্যানসার রোগে তাঁর ফুসফুস আক্রান্ত। নবম তলার এই নিবিড় শুশ্রূষা কেন্দ্রটির অধিকর্তা হলেন ড: চিতালে। এক সপ্তাহ চিকিৎসা চলার পরেও ড: শ্রীনিবাসনের অবস্থায় উন্নতির কোনো চিহ্ন চোখে পড়েনি। তাঁর ডান দিকের ফুসফুসে কর্কট রোগাক্রান্ত ক্ষতটি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। ড: চিতালে ভালভাবেই জানতেন যে এ ক্ষেত্রে কোনোবিধ উন্নতির আশা বড়ই ক্ষীণ। সর্বনাশা এই ব্যাধি ড: শ্রীনিবাসনের জীবন শেষ না করে ছাড়বেনা। এবং শেষের সেই দিনটিও খুব দূরে নয়। ড: চিতালের কাছে এটা দিবালোকের মতই স্পষ্ট ছিল।

সকাল তখন আটটা। রোগীদের দর্শনপ্রার্থীদের ভিড় প্রতি মিনিটে বাড়ছে। রাতে যে ডাক্তার ও অন্যান্যরা দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের কর্তব্যের পালা এখন শেষ হবে, পরের দফার দায়িত্ব যাঁদের তাঁরা আসবেন। বাইরের রাস্তায় ফল বিক্রেতাদের ব্যবসা দারুণ জমে উঠেছে।

কাঁটায় কাঁটায় আটটায় ড: চিতালের গাড়ি প্রতিষ্ঠানে এসে পৌঁছল। প্রবেশপথে ড: চিতালে নেমে গেলেন। চালক গেল গাড়িটিকে যথাস্থানে রাখতে। প্রবেশদ্বারে প্রহরী তাঁকে সেলাম করল। ড: চিতালে কিন্তু নিজের চিন্তায় বিভোর। তিনি সোজা এগিয়ে চললেন লিফটের দিকে। ফিস ফিস করে কে যেন বলল 'বড়ে ডক্টর সাহাব আয়ে হাঁয়' (বড় ডাক্তার বাবু এসে গেছেন)। লিফটচালক অন্যান্যদের সরিয়ে ড: চিতালেকে পথ করে দিল। নিচুস্বরে তাঁকে সুপ্রভাত জানিয়ে সে

লিফটের কোণে সরে এসে বোতাম টিপল। লিফট উঠতে থাকল। নবম তলায় পৌঁছতে লিফট থামল এবং চালক দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ড: চিতালেকে পথ করে দিল।

পুরো নবম তলাটিতেই কেন্দ্রীয় শীতাতপব্যবস্থা রয়েছে। নিবিড় শুশ্রূষা কেন্দ্রের প্রধান দরজায় যে রক্ষী দাঁড়িয়েছিল সেও ড: চিতালেকে সসম্ভ্রমে সেলাম করে দরজা খুলে দিল।

ভেতরে পা দিতেই দুটো ব্যাপার তাঁর চোখে পড়ল। প্রথমটি হল ভেতরটা বেশ শীতল ও মনোরম এবং দ্বিতীয়টি হল একদল ব্ল্যাক ক্যাট কম্যাণ্ডোর উপস্থিতি। শীতল বাতাসে বেশ প্রফুল্ল বোধ করলেও ঐ কম্যাণ্ডোদের দেখে তাঁর মেজাজটা বিগড়ে গেল। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর কিছুই করার ছিলনা। ড: শ্রীনিবাসন একজন অতীব, অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি শুধু একজন বিজ্ঞানীই নন, প্রধানমন্ত্রীর প্রায়োগিক উপদেষ্টাও বটে। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি চিকিৎসার জন্য এলেও দেখে যেন মনে হচ্ছিল যে সেনাবাহিনীই তাঁর জীবনরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে। এবং তিনি যদি মারা যান (মারা তিনি যাচ্ছিলেন অবশ্যই) তাহলে যেন জোর করে তাঁর দেহ ও আত্মাকে একত্র রাখার পবিত্র দায়িত্বটি সেনাবাহিনীর। কথাটা ভাবার সময় ড: চিতালের মুখে একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠেছিল। আত্মার অস্তিত্ব এবং মৃত্যুর পরে আত্মার দেহ ত্যাগ জাতীয় কোনো কুসংস্কারমূলক বিশ্বাসই ড: চিতালের মত চিকিৎসকের ছিলনা। কিন্তু নিবিড় শুশ্রূষা কেন্দ্রে প্রতিরক্ষা বাহিনীর এই মোতায়েন দেখে মনে হচ্ছিল ঐ কারণেই যেন এদের এখানে রাখা হয়েছে।

ড: চিতালে তাঁর নিজস্ব কক্ষে গেলেন। পরিচারক সেলাম করল। তাঁর সেক্রেটারি এবং জনৈকা নার্স অভিবাদন জানাল। বিগত দশ ঘণ্টা ড: শ্রীনিবাসনের অবস্থা কেমন ছিল সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন নার্সটি ড: চিতালেকে দিয়ে সসঙ্কোচে এক কোণে সরে দাঁড়াল।

ড: চিতালে বললেন, 'রোগীদের দেখতে যাওয়ার আগে আমি একটু সময় নেব। প্রয়োজনে আমি আপনাদের ডেকে পাঠাব কিন্তু আপাতত আমাকে দয়া করে আধ ঘণ্টা একলা থাকতে দিন। আমি একটু ভাবতে চাই।' সেক্রেটারি ও নার্স, উভয়েই ঘর থেকে চলে গেল।

ড: চিতালে তখন একা। ড: শ্রীনিবাসনের পরিস্থিতি বিষয়ক প্রতিবেদনটিতে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন। তাঁর নজর হঠাৎ গিয়ে পড়ল ঘরের কোণে ফুলদানিতে রাখা এক গুচ্ছ তাজা গোলাপফুলের ওপর। গোলাপফুল সম্বন্ধে বরাবরই তাঁর একটা দুর্বলতা।

হঠাৎ, 'চুলোয় যাক!' বলে ড: চিতালে চেঁচিয়ে উঠলেন এবং বিরক্তিতে ঘুষি মারলেন টেবিলের ওপরে জড়ো করে রাখা এক তাড়া কাগজের ওপরে। ঐসব কাগজে ড: শ্রীনিবাসনের চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা তথ্যাদি ছিল।

ড: শ্রীনিবাসনের আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে আসছে। বয়স হয়েছে সাতষট্টি। কি কেমোথেরাপি, কি রেডিওথেরাপি—কিছুতেই এই মারাত্মক ক্যানসার দমন করা যাচ্ছেনা। এই বয়সে ফুসফুসে অস্ত্রোপচারও রোগী সইতে পারবেনা। আর তাছাড়া ফুসফুস সংস্থাপন বিশ্বের কোনো দেশেই সফল হয়নি। ভারতে তো প্রশ্নই ওঠেনা।

ড: চিতালে স্বগতোক্তি করলেন, 'ড: শ্রীনিবাসনকে মরতে হবেই। আমার কিছু করার নেই।' মনে হল যেন কোনো বিচারপতি প্রাণদণ্ডের রায় দিলেন। এক্ষেত্রে অবশ্য প্রকৃতিই রায়টি দিয়েছিল এবং তা নাকচ করা ড: চিতালের সাধ্যে ছিল না।

ড: চিতালের কানে হঠাৎ ব্রিগেডিয়ার খান্নার সেই কথাগুলো এমনভাবে স্পষ্ট ধ্বনিত হল যে সামনে দাঁড়িয়ে যেন সামরিক অফিসারটি বলছেন, 'কিন্তু ড: শ্রীনিবাসনের মরা চলবেনা। বাঁচতে তাঁকে হবেই। আপনাকে যে করে হোক ওঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

গতকাল একটি উচ্চস্তরের বৈঠক ছিল। ড: চিতালে অবশ্য উক্ত বৈঠকটিতে খুব একটা গুরুত্ব দেননি। তার কারণ হল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি এবং ব্রিগেডিয়ার খান্না ব্যতিরেকে চিকিৎসা জগতের আর কেউই ছিলেন না। অন্যরা ছিলেন রাজনীতি, সামরিক বাহিনী ও বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের নানা হোমরা চোমরা—চিকিৎসা জগতের নয়।

এই বৈঠকে বিজ্ঞানীরা এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে বিজ্ঞানের জগতে এলবার্ট আইনস্টাইনের পরই ড: শ্রীনিবাসনের স্থান। পদার্থবিদ্যায় গবেষণার জগতে নিউটন এবং আইনস্টাইনকে দুই অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ বলে মনে করা হয়। ড: শ্রীনিবাসন সম্ভবত তৃতীয় অভ্রভেদী শৃঙ্গের স্থান গ্রহণ করতে চলেছেন। আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার তত্ত্বটি প্রণয়ন করেন এবং প্রমাণ করেন যে বস্তু ও শক্তি (এনার্জি) হচ্ছে অবিভাজনীয়। এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই মানুষ পারমাণবিক শক্তির ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম হয়। জীবনের শেষদিন অবধি আইনস্টাইন অপর একটি তত্ত্ব প্রমাণের জন্য তুমুল প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। যেটি হল ঐক্যবদ্ধ ক্ষেত্রের তত্ত্ব (ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি)। এই তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে বৈদ্যুতিক শক্তি, চৌম্বক শক্তি এবং মহাকর্ষের বল হল আদপে এক একক আদি শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র। একবার এটি প্রমাণ করতে পারলে মহাকর্ষের

বলটিকে দূরীভূত করার বিষয়ে পরীক্ষা চালানো সম্ভবপর। অথবা, তড়িৎ-চৌম্বকীয় শক্তির ভিত্তিতে মানুষ পাল্টা একটি মহাকর্ষ বিরোধী শক্তির সৃষ্টি করতে পারে। তখন মানুষ মহাকর্ষের বলের প্রভাব দূরীভূত করে মহাবিশ্বের যে কোনো স্থানে যান প্রেরণ করতে পারবে। অন্যভাবে বললে এর ফলে পুরাণ বর্ণিত সেই দশদিকেই মানুষের অবাধ বিচরণ সম্ভবপর হবে। দুর্ভাগ্যবশত এই তত্ত্বটি নিয়ে কার্যরত থাকার সময়েই আইনস্টাইনের জীবনাবসান ঘটে এবং তাঁর সেই অসম্পন্ন কাজ তখনও শেষ হয়নি কারণ আইনস্টাইনের সেই গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত ক্ষমতা কারো মধ্যেই ছিলনা। কতিপয় পদার্থবিদ্যা ও গণিতের পণ্ডিত অবশ্যই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষ অবধি ব্যাপারটি তাঁদের সাধ্যাতীত বলে তাঁরা হাল ছেড়ে দেন।

আইনস্টাইনের অসম্পন্ন গবেষণার সূত্র ধরে ড: শ্রীনিবাসন কাজ শুরু করেন এবং বিজ্ঞানী মহলের ধারণায় তিনি ঠিক পথেই এগোচ্ছিলেন। তরুণ বয়সেই তাঁর বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণাপত্রগুলির মধ্যে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর ছিল এবং ভারত সরকারও শ্রীনিবাসনের কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিল। সেই সময় থেকেই, যেভাবে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার দায়িত্ব নেওয়া হয়, সেইভাবেই শ্রীনিবাসনের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয় সরকার। ঐক্যবদ্ধ ক্ষেত্রের তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর পরবর্তী গবেষণা যাতে সম্পূর্ণ গোপন থাকে তার জন্য সর্ববিধ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। তখন থেকেই ড: শ্রীনিবাসন একজন অতীব, অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। এইসব কারণেই তাঁর মারাত্মক ব্যাধি এবং সারা ভারত চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে তাঁকে ভর্তি করার ব্যাপারটিও গোপন রাখা হয়েছিল।

পূর্ব বর্ণিত উচ্চস্তরের বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা হল : 'কয়েক শতকের মধ্যে ক্বচিৎ এমন কোনো ক্ষণজন্মা প্রতিভা জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ মেধাবী এমন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের জন্য মানবজাতিকে যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করতে হয়। আমরা যারপরনাই ভাগ্যবান যে ড: শ্রীনিবাসন আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। অতএব যে করে হোক তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

একমাত্র ড: চিতালে এবং সম্ভবত ব্রিগেডিয়ার খান্নার জানা ছিল যে ক্যানসারের রোগীকে বাঁচানো এক কথায় অসম্ভব, বিশেষত যখন ক্যানসার ফুসফুসের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু ড: শ্রীনিবাসনকে বাঁচিয়ে রাখার চূড়ান্ত দায়িত্বটি ড: চিতালের ওপরেই ন্যস্ত হয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার খান্না জানতেন যে এটা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু দায়িত্বটি যেহেতু ড: চিতালের ঘাড়ে চাপানো

হয়েছিল তাই সুযোগ বুঝে তিনিও অন্যদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ড: শ্রীনিবাসনের জীবন রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বারংবার ঘোষণা করে তাঁর ওপরওয়ালাদের মন কাড়তে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

এর ফলে এক জাতীয় উভয়সঙ্কটের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন ড: চিতালে। ধরি মাছ না ছুঁই পানির ভঙ্গিতে তিনি বলেছিলেন, 'কোনোরকম ছোটখাট খামতিও যাতে না হয় তার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।' কিন্তু তাঁর এই কথা বৈঠকের কাউকেও খুশি করতে পারেননি।

অবশ্য ড: চিতালে নিজেও খুশি বোধ করেননি।

কিছুক্ষণ পরে ড: চিতালে উঠে দাঁড়ালেন এবং মনস্থ করলেন যে ড: শ্রীনিবাসনকে এবার তিনি দেখতে যাবেন।

ক্যানসার রোগীদের ক্ষেত্রে এই বিশেষত্বটি দেখা যায় যে যতক্ষণ না এই রোগ অন্তিম পর্বে গিয়ে পৌঁছয় ততক্ষণ রোগীর দেহে অন্যবিধ জটিলতা দেখা দেয়না এবং মনে হয় যে রোগী যেন স্বাভাবিক অবস্থাতেই আছে। সে কথা বলতে পারে এবং মানসিকভাবেও প্রফুল্ল থাকে। এমনকি ড: শ্রীনিবাসনকেও দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। সদাই হাসিখুসি। অতীব, অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলেই তাঁকে নিবিড় শুশ্রূষা কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে তাঁকে সর্বাধিক বিশ্রামে থাকতে হবে।

ড: শ্রীনিবাসন হলেন মূলত খোলামেলা মনের এক ঝাড়াঝাপটা মানুষ। চমৎকার কৌতুকরসবোধ সম্পন্ন। ড: চিতালে এটাকে খুবই মূল্যবান মনে করেছিলেন কারণ সচরাচর দেখা যায় যে রোগী যখন বুঝতে পারে তার অসুস্থতা আর সারবে না তখন সে মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রথমে তার মানসিক মৃত্যু ঘটে। তারপরে দেহ বিকল হয়। অপরপক্ষে, কোনো ব্যক্তি যদি জীবনকে সত্যিই ভালবাসে তাহলে সে দ্রুত সেরে ওঠে। অবশ্য অসুখটি যদি মারাত্মক না হয় তবেই।

ড: শ্রীনিবাসন খাটে শুয়েছিলেন। সামনের দিকে চুল পাতলা হয়ে যাওয়ার ফলে তাঁর চওড়া কপালটি আরও চওড়া দেখাচ্ছিল। তুষারশুভ্র চুল তাঁর বয়সের সঙ্গে

বেশ মানানসই। দাড়ি রেখেছেন তিনি। তাও পেকে গেছে। তাঁর মুখে ক্লান্তির ছাপ থাকলেও অন্তর্নিহিত কুটিলতা ও স্বাভাবিক মাধুর্যও টের পাওয়া যাচ্ছিল।

ড: চিতালে ঘরে প্রবেশ করতেই ড: শ্রীনিবাসন তাঁকে হেসে স্বাগত জানিয়ে বললেন, 'আসুন, ডাক্তারবাবু, আসুন। আপনাকে একটু ক্লান্তই দেখাচ্ছে যেন। আমার মত রোগীরা সত্যিই ডাক্তারদের কাছে আপদের মত। ডাক্তারদের এরকম আপদ সামলানো সবসময় এড়ানো উচিত। বলুন, ঠিক বলেছি কি না?'

ড: চিতালে হাসলেন। এই প্রথম বোধহয় স্নায়বিক উত্তেজনা একটু কমল। ড: শ্রীনিবাসনের লঘু মন্তব্যই দাওয়াই-এর কাজ করেছিল।

'এবারে বলুন তো, আর কতটা সময় আপনি আমাকে দেবেন? আমি কিন্তু সেরকম নাছোড়বান্দা ভাড়াটে নই যে বার বার মেয়াদ বাড়াবার তদ্বির করব।'

'আপনার মেয়াদ বাড়াবার আমি আর কে ড: শ্রীনিবাসন। আপনি যেন আরও দীর্ঘ, দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকেন—এই আমার কামনা। আমরা সকলেই তাই চাই। অবশ্যই এখন যেমন আছেন সেভাবে নয়। সত্যি বলতে আমি চাই যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি ছাড়া পেয়ে যান। যে অবস্থায় এই হাসপাতালে আপনি এসেছিলেন সে অবস্থায় কিন্তু নয়। স্বাস্থ্যবান মানুষ হিসেবে আপনাকে আমি দেখতে চাই। তরতাজা, ঝাড়াঝামটা।'

'হ্যাঁ সত্যিই। যেতে আমাকে হবেই। কত কাজ বাকি পড়ে আছে আর আমি এখানে এই অবস্থায় আটকে পড়ে আছি!'

ড: শ্রীনিবাসনের কণ্ঠস্বরে মনে হচ্ছিল যেন জোর করে কোনো প্রেমিককে তার প্রেমাস্পদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। তাঁর প্রিয় গবেষণার সঙ্গে ড: শ্রীনিবাসনের সম্পর্ক এমনই নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ ছিল।

ড: চিতালের কণ্ঠে অভিযোগের সুর, 'এই সবকিছুর জন্য দায়ী, ড: শ্রীনিবাসন, আপনার ধূমপান। অত্যধিক ধূমপান।'

'কি করব বলুন? হালকাভাবে কোনো কিছুই আমি নিতে পারিনা। কোথাও যদি আমি জড়িত হই তাহলে একেবারে ওতপ্রোতভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ি—তা সে কোনো মহিলাই হোক বা আমার গবেষণাই হোক বা আমার ঐ ধূমপান। এ বিষয়ে আপনি কি বলেন?'

ড: শ্রীনিবাসনের এই অকপট সারল্য ড: চিতালের বেশ পছন্দ হয়েছিল। সাধারণ কথাবার্তার সময় ড: শ্রীনিবাসন কি অমায়িক! কে বলবে যে তিনি একজন বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী। কি সহজ, সরল ব্যবহার। সুন্দর পরিহাসবোধ। ক্যানসার যখন তার ফুসফুস গ্রাস করছে তখন ড: শ্রীনিবাসন বলছেন, 'আচ্ছা গাভাসকার সম্বন্ধে আপনার

কি মত বলুন তো। এবার দেখবেন নির্ঘাত ও আর একটা সেঞ্চুরি করে ফেলবে। পারবেনা বলছেন? হয়ে যাক বাজি। ধরুন আমি যদি বাজি হেরে যাই...অবশ্য বাজিতে হারার আগেই আমি অক্কা পেতে পারি। কাজেই ভাল করে ভেবেচিন্তে বাজিটা আপনাকে ধরতে হবে!'

ড: চিতালের কণ্ঠস্বরে সম্ভ্রমের ভাব ফুটে ওঠে, 'আপনি তখন বলছিলেন না যে আমার মধ্যে চাপা উত্তেজনা আপনার চোখে পড়েছে। সত্যিই ছিল। আর নেই।

জানেন, আপনাকে কি বলা হয়? আপনার নাম দ্বিতীয় আইনস্টাইন।'

'তাই? ওটা কোনো ব্যাপারই নয়। ঐক্যবদ্ধ ক্ষেত্রের তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার গবেষণাটা শেষ হতে দিন। দেখবেন লোকে তখন আইনস্টাইনের নাম দেবে প্রথম শ্রীনিবাসন।'

নিজের বুদ্ধিমত্তার ক্ষমতায় চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাস শ্রীনিবাসনের কথায় ফুটে উঠেছিল। সত্যি বলতে নিজের আয়ুষ্কাল থেকে যদি বছর দুয়েক অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়া যেত তাহলে ড: চিতালে তখন তাই করতেন। কিন্তু তা হবার নয়।

ড: চিতালে মনে মনে বললেন, 'মৃত্যু ওঁর অবধারিত। আমার কিছুই করার নেই।' নিজের আশঙ্কার কথা মুখ ফুটে তিনি বলতে পারেননি বলে ভেতরে ভেতরে তাঁর অসহ্য বোধ হচ্ছিল।

নার্স এবং পরিচারককে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে তিনি নিজের কক্ষে ফিরে গেলেন।

ড: চিতালে অনুভব করছিলেন যে ড: শ্রীনিবাসনের আসন্ন মৃত্যু তাঁর নিজের ব্যর্থতাই প্রমাণ করবে। অথচ এটাও তিনি জানতেন যে শ্রীনিবাসনের মৃত্যু ঘটলেও তার জন্য তাঁকে কেউ দায়ী করতে পারবেনা। মরণের অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে মানুষমাত্রেই অবহিত। এমনকি সামরিক বাহিনীর যন্ত্রবত ওপরওয়ালারাও সেটা জানে। ড: চিতালে উপলব্ধি করছিলেন যে তুমুল বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে তাঁর এই যুদ্ধে পরাজয়ই ঘটবে। কিন্তু সেইসঙ্গে আন্তরিকভাবে তিনি চেয়েছিলেন যে ড: শ্রীনিবাসন আরও কিছুকাল বেঁচে থাকুন।

পরের দিন সকালে ড: চিতালে ঘরে ঢুকেই ড: শ্রীনিবাসনকে বললেন, 'সুপ্রভাত, দ্বিতীয় আইনস্টাইন!' গলায় বেশ খুশির ভাব।

'সুপ্রভাত।'

রোগীর বিছানার কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন ড: চিতালে। কথা বলবেন। আসলে তিনি ঠিক করেছিলেন যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে ড: শ্রীনিবাসনের সঙ্গে তিনি আলোচনা করবেন।

'ড: শ্রীনিবাসন, ছোটবেলায় অনেক কীর্তনের আসরে আমি যেতাম। সেখানে যে ধর্মীয় পাঠ হত তাতে বার বার ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সত্য ও মায়ার প্রসঙ্গ উঠত। এইভাবে আত্মা ও দেহর উদাহরণ দিয়ে অস্তিত্বের মর্মার্থ বোঝাবার চেষ্টা...'

'দাঁড়ান! দাঁড়ান! হায় ভগবান! আপনি কি আমাকে আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে জ্ঞান বিতরণ করতে এসেছেন? তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে যে আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি শুনেছি যে ফাঁসির আগে আসামীদের নাকি 'গীতা'-র শ্লোক পড়ে শোনানো হয় এটা কি সেরকম ব্যাপার নাকি?'

'না। তা নয়, ড: শ্রীনিবাসন! দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি আপনাকে অমর করে রাখতে চাই। আমাদের ধর্মকথায় সাতজন মৃত্যুহীন অমরের নাম আমি ভাবলাম যে আর একজন যোগ হলে কেমন হয়?'

'বেশ, বেশ, বলুন তাহলে। আপনি তো কীর্তনের কথা বলছিলেন...'

"হ্যাঁ। তা সেই কীর্তনীয়া শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করতেন, 'তোমরা যখন বলো যে আমার হাত, আমার পা, আমার হৃদয় তখন কি বোঝাতে চাও বলো দিকি? তুমি যখন বলো আমার হাত, তার মানে দাঁড়ায় তুমি তোমার হাতের থেকে আলাদা কিছু। কথাটা ঠিকই বলো কারণ তোমার ঐ হাত যদি ধ্বংস হয়ে যায় তুমি কিন্তু ধ্বংস হবেনা। তাই যখন বলো আমার মাথা, আমার কান, আমার চোখ তখন কোন্ আমি-র কথা বলো ভেবে দেখেছো?' কিছুক্ষণ নীরব থেকে কীর্তনীয়া নিজেই এর জবাব দিতেন, 'ঐ আমি হল আত্মা—ঐশ্বরিক বিশ্বব্যাপী আত্মারই সে হল এক কণামাত্র'..."

'আচ্ছা ড: চিতালে, এই যা সব বলছেন আপনি এতে আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন? আমরা দুজনেই বিজ্ঞানী এবং আমি যতদূর জানি বিজ্ঞানীরা এখনও আত্মার অস্তিত্ব মেনে নেননি।'

'তা তো বটেই! আমি এখনও শেষ করিনি। যা বলতে চাই আমাকে শেষ করতে দিন। কীর্তনীয়ার কথাটা আমি উদাহরণ হিসেবে এনেছিলাম। আমি যা বোঝাতে চাইছি সেটা একেবারেই অন্য ব্যাপার।'

'বেশ, বলে যান...'

'এখন ঐ কীর্তনীয়ার বক্তব্যে 'আত্মা'-র জায়গায় 'মস্তিষ্ক' বসালে কেমন দাঁড়ায়?'

'আপনি কি বোঝাতে চাইছেন সেটা একটু খোলামেলাভাবে বলুন তো এবার।'

ড: চিতালের মনে যে কথা ছিল তা তিনি এবারে ড: শ্রীনিবাসনকে সোৎসাহে বোঝাতে শুরু করলেন। চিত্তাকর্ষক এই ভাবনাটি গত রাতে বিছানায় শুয়ে ড: চিতালের মাথায় সহসা খেলে যায়। এবং ব্যাপারটি নিয়ে তিনি যতই ভেবেছেন ততই তাঁর মনে হয়েছে যে এটা সম্ভবপর। বাস্তবে এটা করে ফেলাও যায়। অবশ্য এটা ঠিক যে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যাপারটি এখনও প্রমাণিত হয়নি। কে জানে, হয়তো আর একটি অসামান্য তত্ত্ব প্রতিপাদনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য ড: শ্রীনিবাসনের মত যুগশ্রষ্টা বিজ্ঞানীর হতে চলেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই যুগান্তকারী পরীক্ষায় ড: শ্রীনিবাসনকে গিনিপিগের মতই ব্যবহার করা হবে। কিন্তু তার আগে ড: শ্রীনিবাসনের আগাম সম্মতি পাওয়া একান্তই প্রয়োজনীয়। পরীক্ষাটি যদি সফল হয় তাহলে প্রকৃত অর্থে ড: শ্রীনিবাসন বেঁচে থাকবেন। শুধু বেঁচেই থাকবেন না, প্রকৃতির রহস্য উদঘাটিত করার গবেষণাও চালাতে পারবেন। প্রমাণ করতে সক্ষম হবেন যে আইনস্টাইন ছিলেন আদপে প্রথম শ্রীনিবাসন।

ড: চিতালে বললেন, 'ড: শ্রীনিবাসন, আমরা দুজনেই হলাম বস্তুবাদী বিজ্ঞানী। আমার বক্তব্য আধ্যাত্মিক যুক্তি দিয়ে শুরু করার কারণ হল স্পষ্টভাবে ব্যাপারটা আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম। আরও খোলামেলা করে বললে 'মানুষ' বলতে আমরা যা বোঝাই সেটা 'আত্মা' নয়। 'মানুষ' হল প্রকৃতপক্ষে কেবলই 'মস্তিষ্ক'। মাথার খুলির মধ্যে যতক্ষণ বাদামি পদার্থের আধা কিলো গোলাকার জিনিসটি প্রাণবন্ত থাকবে, ঠিকঠাক কাজ করবে ততক্ষণই আমাদের জীবন। যখন তা কাজ করবেনা তখন আমরা মৃত। দেহের আর প্রতিটি অঙ্গই এর জন্যই কাজ করতে পারে। তাই মস্তিষ্ক বদলানো সম্ভব না, কিয়দংশে একে পরিবর্তিতও করা যায় না। রামের দেহে যদি শ্যামের হৃদ্‌যন্ত্র, যদুর চোখ ও মধুর মূত্রগ্রন্থি বসানো হয় তখন তার নাম রামশ্যামযদুমধু হয়ে যায় না। রাম রামই থাকে। অন্য সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গই হল মস্তিষ্কের দাস, মস্তিষ্কের হুকুমই তামিল করে তারা।' ড: চিতালে এই বলে থামলেন। মন থেকে যথেষ্ট পরিমাণে বোঝা নামাতে পেরে তাঁর বেশ স্বস্তি বোধ হচ্ছিল।

ড: শ্রীনিবাসন ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দিলেন, 'ঠিক আছে। আর আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হবেনা। চিকিৎসা আমার ক্ষেত্র নয় কিন্তু আপনি কি বলতে চাইছেন সেটা আমি বুঝতে পেরেছি।' ড: চিতালে যা ভেবেছেন সে সম্বন্ধে ড: শ্রীনিবাসনের মস্তিষ্ক হয়তো আগেই সে কথা ভেবেছে।

'ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, ড: শ্রীনিবাসন। কোনো ধারণা আয়ত্ত করার ব্যাপারে আপনার ক্ষমতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই আমার থাকতে পারেনা—এমনকি সামান্য একটা কিছু বোঝাতে চেষ্টা করাটাও আপনাকে হেয় করা হয়।' সেটা আমার

উদ্দেশ্য নয়। আসলে ব্যাপারটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আরও কিছুটা আলোচনা আমি করতে চাই। যদি অনুমতি দেন।'

সারল্যমণ্ডিত হাসিমুখে ড: শ্রীনিবাসন বললেন, 'বেশ তো। বলুন না।'

'ড: শ্রীনিবাসন, আপনার একটি ফুসফুস কাজ করছেনা। আমরা এটিকে মেরামত করতে পারিনা বা বদলে অন্য ফুসফুস বসাতেও পারিনা। কিন্তু একটি একক অঙ্গের দক্ষতার ওপরে আপনার অস্তিত্ব নির্ভর করবে এমন কোনো কথা নেই। আপনার মস্তিষ্কই হলেন আপনি। ক্যানসারে আক্রান্ত আপনার ঐ ফুসফুস আপনার গোটা দেহটিকেই বিকল করে দেবে। সেটা আমি ঠেকাতে পারবনা। কিন্তু আপনার মস্তিষ্ককে আমি রক্ষা করতে পারি এবং আপনি আপনার মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে জগতে আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবেন।'

ড: শ্রীনিবাসন বললেন, 'কিন্তু এইভাবে অস্তিত্ব আমার নিজের বা পৃথিবীর কোন্ কাজে লাগবে?'

'সেটাও আমি ভেবেছি। আপনি সেরকম বিজ্ঞানী নন যাঁরা পরীক্ষাগারে হাতে নাতে গবেষণা করেন। ঐভাবে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করতে হয়। আপনার সমগ্র গবেষণার ভিত্তি হচ্ছে বিমূর্ত গণনা ও মৌলিক চিন্তা। তাই নয় কি? এবং অবশ্যই এই গবেষণায় আপনি অন্যান্য বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব ও গণনাও বিবেচনাধীনে রাখেন। কিন্তু সেটার দায়িত্ব নেওয়াই যায়। এ ব্যাপারে আমি ইতিমধ্যেই দিল্লি আই.আই.টি. (ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি)-র বৈদ্যুতিক (ইলেকট্রনিক্স্) বিভাগের প্রধান ড: ভাটনগরের সঙ্গে আলোচনা করেছি। আলোর রশ্মি আমাদের চোখকে সংবেদনশীল করে তোলে এবং যা কিছু দৃশ্যমান হয় সে সম্বন্ধে তথ্য-তড়িৎ-তরঙ্গের রূপে মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়। চোখ থেকে বার্তা কিভাবে মস্তিষ্কে যায় সে সম্বন্ধে ড: ভাটনগর বিশদ গবেষণা করেছেন। তিনি মনে করেন যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে আপনার মস্তিষ্কে তড়িৎ স্পন্দন পাঠানো সম্ভব। সংক্ষেপে বললে আংশিকভাবে আপনার দৃষ্টিক্ষমতা থাকবে। এবং মস্তিষ্ক জীবিত থাকবে বলে বিনা বাধায় আপনার চিন্তার প্রক্রিয়াটিও সচল থাকবে। আর কি চাই?'

এক মুহূর্ত নীরব থাকার পর ড: শ্রীনিবাসন বললেন, 'না। না, ড: চিতালে, এটা একটা বীভৎস ব্যাপার। আমাকে কি পেয়েছেন আপনি? আমি কি একটা কম্পিউটার! তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা আপনি করবেন। ভেতরের প্রক্রিয়াটি ঠিকই চলবে যাতে বিনা বাধায় প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্যটি বেরিয়ে আপনাদের হস্তগত হয়। না, ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না। আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমি কোনো জন্তু

নই যার কাছে জীবনের দুঃখ বা আনন্দের কোনো ভূমিকাই নেই।'

'এক মিনিট দাঁড়ান। তাহলে আপনি আনন্দ উপভোগ করতে চাইছেন? আপনি দুঃখবেদনা চাইছেন? এখনই, যে অবস্থায় আপনি রয়েছেন, আমরা আপনাকে আনন্দের অনুভূতি দিতে পারি এবং তার জন্য আপনার দেহের দরকার হবেনা। মস্তিষ্কের এমন কয়েকটি কেন্দ্রের সন্ধান আমরা জানি যেখানে ইলেকট্রোড (বিদ্যুদবাহ) বসানো যায় এবং এর মাধ্যমে বাইরে থেকে উদ্দীপনার সৃষ্টি করলে আপনি অভূতপূর্ব আনন্দ পাবেন। আপনার জন্যে এর ব্যবস্থা আমরা করব।'

'চমৎকার! অর্থাৎ আমার আনন্দ পাওয়ার ব্যাপারটিও আপনারা নিয়ন্ত্রণ করবেন! স্কুলের শিশুদের জন্যে যেমন এক একটা ক্লাস বরাদ্দ থাকে সেভাবেই একটা সময়ের জন্যে আপনারা আমাকে আনন্দ দেবেন। সময় হলে আপনি বলবেন, 'আসুন ড: শ্রীনিবাসন, তিনটে বেজেছে। এখন আপনি আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন!' তাই নয় কি?'

এরপরে যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল তার মধ্য দিয়েও ড: চিতালে কিন্তু ড: শ্রীনিবাসনকে নিজের ধারণাটি গ্রহণ করাতে অপারগ হলেন।

শেষে, উঠে চলে যাবার সময়ে ড: চিতালে বললেন, 'ড: শ্রীনিবাসন, আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে আপনার ওপরে কিছু চাপিয়ে দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবুও, আমি বলব যে ব্যাপারটা আপনি আবার ভেবে দেখুন। দেহ ও মস্তিষ্ক, উভয়ের বিনাশের চেয়ে অন্তত মস্তিষ্কটি বাঁচিয়ে রাখা বোধহয় ভাল।'

'ড: চিতালে, দয়া করে আমার জায়গায় আপনি নিজেকে কল্পনা করুন। করে বলুন যে আমার জায়গায় থাকলে আপনি কি অনুরূপ প্রস্তাবে রাজী হতেন?'

ড: চিতালে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, রাজী হতাম।'

'আপনার কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে ড: চিতালে।'

•

সেইদিন দুপুরের নিয়মিত বৈঠকে ড: চিতালে তাঁর পরিকল্পনার ব্যাপারটি উচ্চ-স্তরীয় কমিটির সদস্যদের কাছে পেশ করলেন। সেইসঙ্গে তিনি এটাও বললেন ড: শ্রীনিবাসন তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ব্রিগেডিয়ার খান্না ড: চিতালে-কে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, 'ড: শ্রীনিবাসন ব্যাপারটিকে জটিল করে তুলছেন। শুধু আমাদের দেশই নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্যও যে এই গবেষণা কতটা প্রয়োজনীয় সেটা তাঁর জানা উচিত। আর এখন

তাঁর যে অবস্থা তাতে এরচেয়ে ভাল বিকল্প আর হয় না। আচ্ছা ড: চিতালে, বলুন তো ড: শ্রীনিবাসন যখন তাঁর গবেষণা শেষ করবেন তখন আমরা জানব কি করে? তিনি কি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন?'

'অবশ্যই পারবেন। সত্যি বলতে সেটা যদি সম্ভব না হত তাহলে এই পরীক্ষাটিই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। এমনভাবে ব্যবস্থা করা হবে যাতে তিনি আমাদের নিজের কথা বলতে পারবেন।'

'কি ভাবে?'

'দেখুন, মস্তিষ্কের কোন অংশটি বাকশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে আমরা জানি। মানুষ কথা বলে কি করে? স্বরতন্ত্রী-র কম্পনের বিচিত্র প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট শব্দ সৃষ্টি করে। এই শব্দই ভাষা। কথাগুলি মস্তিষ্কে থেকে যায় এবং এগুলিকে প্রকাশ করে বাকশক্তির কেন্দ্র যা আবার স্বরতন্ত্রীর কম্পনকে নিয়ন্ত্রণ করে। আপনি যদি কিছু প্রকাশ করতে চান তাহলে কণ্ঠস্বর প্রক্ষেপক বাক্সটিতে প্রয়োজনীয় বার্তা পৌঁছে যাবে।'

'কেউ যদি কিছু প্রকাশ করতে না চায়?'

'সে ক্ষেত্রে স্বরতন্ত্রীতে কোনো বার্তা পৌঁছবেনা।' সাফ সাফ জবাব দিলেন ড: চিতালে।

এইসময় জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি বলে উঠলেন, 'সেরকম হলে আপনার পরীক্ষা নিয়ে গর্ব করার খুব একটা কারণ থাকবেনা। কারণ আপনার পুরো প্রচেষ্টাই তখন ভেস্তে যাবে। আমরা প্রয়োজনীয় সর্ববিধ তথ্য ড: শ্রীনিবাসনের মস্তিষ্কে পাঠাতে পারি। নিজের মস্তিষ্কের মধ্যেই তিনি তাঁর গবেষণার কাজটি শেষ করবেন। অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ ক্ষেত্রের তত্ত্বটি তিনি আবিষ্কার করবেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছার বিরোধিতা করার জন্য তিনি আমাদের সেটা নাও জানাতে পারেন। এই পরিকল্পনায় তাঁর সম্মতির ওপরে নির্ভর করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।'

ড: শ্রীনিবাসনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর মস্তিষ্কের মাধ্যমে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে ড: চিতালেরও প্রথম দিকে সায় ছিলনা। কিন্তু পরে নিজের পরিকল্পনাটি এমনভাবে ড: চিতালেকে গ্রাস করে ফেলেছিল যে তিনি এর মায়ায় একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এ হবে এক যুগান্তকারী পরীক্ষা যা মানুষের ওপরে কখনও করা হয়নি। ক্লেভল্যান্ড-এর ড: হোয়াইট বাঁদরের মস্তিষ্ক বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক পারেননি। এখন মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ে এই পরীক্ষা যদি সফল হয় এবং তাও ড: শ্রীনিবাসনের মত অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন মানুষের ক্ষেত্রে তাহলে তো আরও বেশি করে সাধুবাদ ও প্রশস্তি জুটবে। একদিকে বিশ্বের

ভাগ্যে জুটবে ঐক্যবদ্ধ ক্ষেত্রের তত্ত্ব এবং অন্য দিকে বৈজ্ঞানিক প্রগতির সুবাদে ড: চিতালে হয়ে উঠবেন অমর যশের অধিকারী। বলা যায়না, লোভনীয় নোবেল পুরস্কারও মিলে যেতে পারে! নিজের স্বার্থেই এই পরীক্ষাটি চালানো ড: চিতালের কাছে চূড়ান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল।

এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ড: চিতালের চোখে নিষ্ঠুরতার এক ভাব ফুটে উঠেছিল। তিনি বললেন, 'আপনি ভুল করছেন, জেনারেল! যতটা মনে করা হয় মানুষের চিন্তা কিন্তু তার ততটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। আর তা ছাড়াও, সচেতন অবস্থায় মানুষ যা প্রকাশ করেনা সেটা কিন্তু সম্মোহনের আবেশে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।'

'কিন্তু ড: শ্রীনিবাসন যদি সহযোগিতা করতে রাজী না থাকেন তাহলে তাঁকে আমরা সম্মোহিত করব কি করে? সম্মোহন করতে হলে তো গোটা মানব দেহরই দরকার হবে...'

'না, সেক্ষেত্রেও যা দরকার হবে সেটাও মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ককে সম্মোহনের আবেশে আচ্ছন্ন করার মত ওষুধ আমাদের আছে। অন্যভাবে অর্থাৎ গোটা দেহ থাকলে আমরা ঐ ওষুধ ব্যবহার করতে পারতামনা কারণ গলার কাছে যে রক্তের প্রতিবন্ধক ব্যবস্থা রয়েছে তা ঐ ওষুধকে মস্তিষ্কে যেতে দিত না। কিন্তু ড: শ্রীনিবাসনের ক্ষেত্রে আমরা এই বাধাটি সরিয়ে দেব যাতে ঐ ওষুধ ঠিকমত তাঁর মস্তিষ্কে পৌঁছতে পারে। আর একটা ব্যাপার হল...'

'কি আর একটা ব্যাপার?'

ড: চিতালের চোখে সেই অমানুষিক ভাবটা আরও স্পষ্ট। 'মস্তিষ্কে বেদনা ও আনন্দ উপলব্ধি করার জন্য দুটি কেন্দ্র রয়েছে। বেদনা অনুভবের ভীতি প্রদর্শন করে আমরা তাঁকে দিয়ে কথা বলাতে পারি। অপরাধীদের স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য পুলিশ এরকম ব্যবস্থা নিয়ে থাকে...'

'সকলের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা মোটেই সফল হয়নি। বন্দী, বিশেষত রাজনৈতিক বন্দীরা সফলভাবে একে প্রতিরোধ করেছে। স্বাধীনতার আগে অনেকবার দেখা গেছে যে বৃটিশ কর্মচারীরা ভীতি প্রদর্শন করে স্বীকারোক্তি আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে। নকশাল পন্থীরাও প্রমাণ করে দিয়েছে যে ঐ ধারণাটি একেবারেই ভ্রান্ত।'

সামরিক বাহিনী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের তরফ থেকে তাঁর প্রস্তাবিত পরীক্ষা সম্বন্ধে বিরোধিতা ড: চিতালে আশা করেননি। তাই তিনি একটু থতমত খেয়ে পুরো ব্যাপারটা আর একবার চিন্তা করে নিলেন। তারপর বললেন, 'অবশ্যই ড: শ্রীনিবাসনের সঙ্গে পুনরায় দেখা করে সহযোগিতা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ

জানাবো। কিন্তু তিনি যদি সহযোগিতা করতে গররাজী হন তাহলে আমার পরীক্ষার ব্যাপারে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমি আপনাদের অনুমতি চাইব। একইসঙ্গে আপনারা পরীক্ষার ব্যাপারে আমাকে অনুমতি দিতে প্রত্যাখ্যান করবেন আবার বলবেনও যে ড: শ্রীনিবাসনকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমার মনে হয় এটা ঠিক নয়। আমার পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব তার জন্যই আমি অনুমতি চাইছি। এখন আমাকে এই স্বাধীনতা দিতে আপনাদের মধ্যে যদি আপত্তি থাকে, তাহলে, আমি কিন্তু বলব যে অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য আমার ওপর আর পিড়াপিড়ি করবেননা। কারণ সেটা যুক্তিসঙ্গত হবেনা।' বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে ড: চিতালে বক্তব্য শেষ করলেন।

বৈঠকও সেইসঙ্গে সাঙ্গ হল।

যখন থেকে ড: শ্রীনিবাসনের মস্তিষ্ক বাঁচিয়ে রাখার চিন্তাটি তাঁর মাথায় খেলেছিল সেই থেকে পরিকল্পনাটি নিয়ে ড: চিতালে একেবারে যেন মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। এইবার তিনি শুরু করলেন এক দ্বিমুখী প্রচেষ্টা—প্রথমটি হল এই পরীক্ষার ব্যাপারে ড: শ্রীনিবাসনের সম্মতি আদায় করা, এবং দ্বিতীয়টি হল ড: শ্রীনিবাসন যদি তাঁর অসম্মতিতে অবিচল থাকেন তাহলে খোদ প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পরীক্ষার অনুমোদন লাভ করা। ব্যাপারটি অনতিবিলম্বেই প্রধানমন্ত্রীর কানে পৌঁছল।

ড: চিতালে প্রধানমন্ত্রীকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে ড: শ্রীনিবাসন যদি তাঁর গবেষণা শেষ হবার পরে স্বেচ্ছায় তত্ত্বটি সম্বন্ধে তথ্যদানে আপত্তি করেন তাহলেও মস্তিষ্কের স্মৃতিভাণ্ডার থেকে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সহায়তায় সবকিছুই জানা যাবে। এই ব্যবস্থার সাহায্যে সঙ্কেত পাওয়া যাবে যা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ড: চিতালে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি পেলেন কিন্তু ড: শ্রীনিবাসনকে ঐ প্রস্তাবে রাজী করাতে তিনি সক্ষম হননি।

সেই ঐতিহাসিক অস্ত্রোপচারের দিনটি এল! সাফল্যের সঙ্গে ড: শ্রীনিবাসনের মস্তিষ্কটি বের করে আনা হল। সদৃশ শোণিত শ্রেণীর তাজা রক্ত মস্তিষ্কে সরবরাহ করার জন্য কৃত্রিম রক্তবাহী নল লাগানো হল। অশুদ্ধ রক্ত পাম্প্ করে বের করার ব্যবস্থা হল। তাজা রক্তের মাধ্যমে ড: শ্রীনিবাসনের মস্তিষ্কে খাদ্য ও বাতাস

সরবরাহ করা হচ্ছিল। মস্তিষ্কের স্মৃতিভান্ডার এবং অন্যান্য সংবেদন কেন্দ্রগুলিতে বিশেষ ধরণের ইলেকট্রোড (তড়িদ্‌দ্বার) লাগানো হল যাতে করে আনন্দের অনুভূতি জাগানো যায়। বাক্‌শক্তির কেন্দ্রটি যুক্ত করা ছিল একটি কৃত্রিম কণ্ঠস্বর প্রক্ষেপণের বাক্সের সঙ্গে। মাথার খুলির মধ্যে মস্তিষ্ক যেভাবে অবস্থান করে সেভাবেই ড: শ্রীনিবাসনের মস্তিষ্ক বিশেষ ধরণের তরলের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় ছিল। জীবাণুমুক্ত পরিবেশে মস্তিষ্কটি রাখার জন্যে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে তাকে গোলাকার এক কাচের পাত্রে রাখা হয়েছিল। তাপমাত্রাও নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় ছিল। এইভাবে তাঁর মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে ড: শ্রীনিবাসনের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল।

ড: শ্রীনিবাসনের মস্তিষ্ক কৃত্রিম কণ্ঠস্বর প্রক্ষেপণের বাক্সের মাধ্যমে বলল, 'ড: চিতালে, তাহলে দেখা যাচ্ছে শেষ হাসিটা আপনিই হাসলেন।'

ড: চিতালের মনে তখন তুমুল আনন্দের হিল্লোল।

তিনি বললেন, 'আমি দুঃখিত, ড: শ্রীনিবাসন। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমি এটা করতে বাধ্য হয়েছি। বিশ্বাস করুন, আমার আর কোনো উপায় ছিলনা। কারণ এই গবেষণার ওপরে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর...'

'থাক। যথেষ্ট হয়েছে। এগুলো আপনার আমাকে বলার কোনো দরকার নেই। কথাগুলো কি আমার জানা নেই?'

'ড: শ্রীনিবাসন, এতক্ষণ আপনি ঘুমিয়েছেন। এবার আপনার গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়গুলি পাঠ করার সুযোগ আপনাকে আমরা দিচ্ছি।'

'তা তো বটেই। এখন আর কিই বা আমার করার আছে। তাই নয় কি?' ড: শ্রীনিবাসনের কণ্ঠে বিদ্রূপের আভাস।

ড: শ্রীনিবাসন যে বিরক্তি প্রকাশ করছেন সেটা ড: চিতালে বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে শীঘ্রই এই অবস্থাটা ড: শ্রীনিবাসন কাটিয়ে উঠবেন এবং নিজের গবেষণায় নিমগ্ন হয়ে যাবেন।

ড: চিতালের চিন্তায় কোনো ভুল ছিল না। কয়েকদিনের মধ্যেই ড: শ্রীনিবাসন তাঁর গবেষণার মধ্যে ডুবে গেলেন।

একদিন, ড: শ্রীনিবাসন শেষ অবধি ঘোষণা করলেন যে তাঁর গবেষণার কাজ তিনি সম্পন্ন করেছেন এবং ঐক্যবদ্ধ ক্ষেত্রের তত্ত্বটি এবারে তিনি সূত্রাকারে পেশ করবেন।

নির্দিষ্ট সেই দিনটিতে সারা ভারত চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের নবম তলায় প্রায়

সকল অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের জমায়েত হয়েছিল। ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখার জন্য খোদ প্রধানমন্ত্রীও এসেছিলেন।

ড: শ্রীনিবাসন তাঁর ঐক্যবদ্ধ ক্ষেত্রের তত্ত্ব উপস্থাপন করবেন। সভার সর্বত্র মাইক্রোফোনের ছড়াছড়ি যাতে করে সকলেই স্পষ্টভাবে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পান। তাঁর বলার সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলি টেপরেকর্ডে ধরে রাখার ব্যবস্থাও ছিল।

ড: শ্রীনিবাসনকে জানানো হল যে অভ্যাগতরা সকলে এসে গেছেন। স্বর প্রক্ষেপণ বাক্সের মাধ্যমে তাঁর ধীর, মাপা কণ্ঠস্বর ভেসে এল :

'আমি জানি যে আপনারা সকলেই ঐক্যবদ্ধ ক্ষেত্রের তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আমার গবেষণা সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু জানাতে আমি অস্বীকার করছি। তার কারণ, আইনস্টাইনের মতই, আমিও, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে এরকম এক উদ্ভাবনের দায়িত্ব গ্রহণ করার মত প্রাপ্তবয়স্ক, মানবজাতি এত দিনেও হয়ে উঠতে পারেনি। এই উদ্ভাবনকে কিভাবে মানুষ কাজে লাগাবে? অন্য সংস্কৃতি, অন্য সভ্যতার কাছে সে এর সাহায্যে সুদূরে অভিযান চালিয়ে পৌঁছবে। কিন্তু তখন নিজের সঙ্গে সে কি ধরণের সংস্কৃতি নিয়ে যাবে? এমন এক সংস্কৃতি নিয়ে যাবে যার বশে প্রকৃতির অঢেল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমরা মানুষকে ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করাই, অন্যকে শোষণ করি, মানুষের ওপর অত্যাচার করি। এই সংস্কৃতি অন্য জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই আমার মতে মানুষ এখনও ঐক্যবদ্ধ ক্ষেত্রের তত্ত্ব গ্রহণ করার মত সংস্কৃতিমান হয়ে ওঠেনি। আর এইসঙ্গে এটাও আমার ভালমতই জানা আছে যে আমার সব চিন্তাই আমার মস্তিষ্কের স্মৃতিভাণ্ডারে সঞ্চিত রয়েছে এবং সহযোগিতা করতে আমি যদি রাজী না হই তাহলে আপনারা সোৎসাহে তা টেনে বের করবেন। একভাবে বললে আপনারা আমার চিন্তা চুরি করবেন। বেশ। কিন্তু এক্ষেত্রেও আপনারা সফল হবেন না কারণ সেই চিন্তা কাগজের ওপরে সাঙ্কেতিক রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে আইনস্টাইনের যে খসড়া লেখাপত্র পাওয়া গেছে কেউই তার পাঠোদ্ধার করতে পারেনি। ঐ সাঙ্কেতিক রেখাচিত্রের ব্যাখ্যা মানুষ কি করে করবে? তার জন্য আপনাদের তৃতীয় আইনস্টাইন বা হয়তো চতুর্থ আইনস্টাইনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে এই তত্ত্ব গ্রহণ করার মত যোগ্যতা অর্জন করা অবধি।

'দুটি কারণে আমি ড: চিতালে-কে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এইভাবে আমাকে বাঁচিয়ে রেখে তিনি আমাকে আমার গবেষণার কাজ শেষ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু আরও বেশি করে তাঁকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই এই কারণে

যে তিনি আমাকে দেখিয়েছেন যে মানুষের মন কেমন শয়তানের কারখানা হতে পারে। তাঁকে দিয়েই আমি দেখেছি যে একজন বিজ্ঞানী কতটা নিচে নামতে পারে! সত্যি বলতে এইসবকিছুই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আমাকে সাহায্য করেছে।'

কৃত্রিম স্বর প্রক্ষেপণের বাক্স থেকে যে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল তা স্তব্ধ হল। স্তব্ধ হল চিরতরে!

অন্ধকারের বুক বেয়ে

সুবোধ জবাদেকার

প্রিয় তেজা,

মনে হয় তোর প্রতিশ্রুতি তুই ভুলে গেছিস। সত্যি আমি তোর ওপরে খুব রেগে গেছি। তোরই প্রথম আমাকে চিঠি লেখার কথা ছিল। এখানে পৌঁছেই আমি এখানকার রাঁধুনি লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম। কোনো চিঠি নেই। আসার সময়ে, রাস্তা থেকে তোকে যে চিঠি আমি দিয়েছিলাম তার জবাবও তুই দিসনি।

বাবা বলছেন যে বোম্বাইতে খুব গণ্ডগোল চলছে। রাশিয়া আর আমেরিকা—দুই পালের গোদা নাকি যুদ্ধং দেহি হয়ে রয়েছে। তাই সকলেই ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। চারদিকে অসম্ভব ত্রাস আর বিভ্রান্তি। এমনই অবস্থা যে চিঠিপত্রও ঠিকসময়ে গন্তব্যে পৌঁছচ্ছেনা।

আমি কিন্তু আসলে বিশ্বাস করিনা যে রাশিয়া আর আমেরিকা অনেক, অনেক দূরের দেশ। পৃথিবীর একেবারে আরেক কোণে অবস্থিত। তোর নিশ্চয়ই মনে আছে যে গত বছর স্কুলে আমাদের ভূগোলের দিদিমণি বলেছিলেন যে এখানে যখন দিন তখন রাশিয়া ও আমেরিকায় রাত। এটা বলে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন সেটা আমি ঠিক ঠিক উপলব্ধি করিনি। তবে নিশ্চয়ই এর মানে এই যে ঐ দেশগুলো অনেক দূরে অবস্থিত। অনিতা পিসী যখন আমেরিকায় গিয়েছিল তখন ভগবান জানেন যে কত ঘণ্টা তাকে বিমানে কাটাতে হয়েছিল। সত্যি বলতে বাবার ঐ যুদ্ধের গল্পে আমার খুব একটা বিশ্বাস নেই। তুই যা আলশে, নির্ঘাৎ তুই আমাকে চিঠি লিখে উঠতেই পারিসনি।

লক্ষ্মীটি তুই কথা দে যে এই চিঠিটা পেয়েই আমাকে চিঠি দিবি।

এখানে আমাদের আসার পর প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেল। ছুটি কাটাতে এই জঙ্গলে আসার ব্যাপারটা বাবার মাথাতেই খেলল বটে। মা আর আমার তো অনিচ্ছাই ছিল। তুই তো এটা জানিস। জানিস না? আমরা বরং চেয়েছিলাম

কাশ্মীর বা কোনো পাহাড়ী জায়গায় যেতে। আন্দামানের এই জঙ্গলে ছুটি কাটাবার ব্যাপারটা মোটেই আমার মনে ধরেনি। মা আর আমি বাবার সঙ্গে তর্কও জুড়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি একটু একটু আমার মত পাল্টাচ্ছি। মুখে না স্বীকার করলেও মনে হয় যে মারও এই জঙ্গল খুব ভাল লেগে গেছে। জায়গাটা অসম্ভব সুন্দর। যেদিকে চোখ যাবে শুধু সবুজ আর সবুজ। প্রকৃতির সৌন্দর্য বলতে যে কি বোঝায় সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। আমাদের রাঁধুনি লোকটা বলল হিন্দি ফিল্ম 'প্যার কি পিয়াস' এখানেই তোলা হয়েছিল। আমরা বোম্বাইতে ফিরলে, তুই আর আমি, একসঙ্গে ছবিটা দেখব। সকালবেলায় এত রকম ছোট্ট ছোট্ট সুন্দর পাখি দেখা যায় যে কি বলব! ওদের দেখলে তুই আনন্দে পাগল হয়ে যেতিস। কেন যে তুই আমাদের সঙ্গে এলিনা! সবাই মিলে কি মজাই না হত... দাঁড়া, তোকে আরও কয়েকটা কথা বলা হয়নি।

আমরা এখানে উঠেছি পুরনো দিনের ডাক বাংলোতে। ছোট্ট একটা টিলার ওপরে ডাক বাংলোটা বানানো। বৃটিশ রাজত্বের সময় এটাই ছিল কালেক্টরের বাড়ি। বাড়িটা বেশ ছড়ানো ধরনের আর এর একটা ভূগর্ভস্থ অংশও রয়েছে, ভাবতে পারিস? কল্পনা কর যে সেখানে এমনকি একটা কুয়োও রয়েছে! কিন্তু কুয়োর জলের গন্ধটা একদম পচা। ঐ জল আমরা ছুঁই না। কাছেই রয়েছে একটা ছোট্ট নদী। তার জল আমরা খাই রে। মে মাসেও তার জল কি ঠাণ্ডা! ঠিক যেন ফ্রিজে-র জল খাচ্ছি।

এখানে আমাদের সঙ্গে একটি বাঙালী পরিবারও রয়েছে। আমি তাঁর নাম দিয়েছি ডাক্তারকাকু। খুব চমৎকার লোক যদিও তিনি সারাক্ষণ সিগারেট খান। ডাক্তারকাকু আমার সঙ্গে গল্প করেন। তাস খেলেন। চমৎকার কত গান গেয়ে শোনান। ডাক্তারকাকুর স্ত্রী সবসময় হয় কিছু পড়ছেন বা লিখছেন। শুনলাম তিনি বাংলার এক নামজাদা লেখিকা। ওঁদের ছেলে কিট্টু যে কি মজার কি বলব। আমার সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়ে গেছে। কিণ্ডারগার্টেনের উঁচু ক্লাসে পড়ে। ওর সঙ্গে খেলে বেড়াতে কি ভালই না লাগে। কিট্টু আমাকে বলে 'দিদি'। সারাক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে লেগে আছে।

তোর জন্যে খুব মন কেমন করে। অন্তত দিনের মধ্যে একশোবার। কেমন আছিস রে তুই। তুই কি আমাকে ভুলেই গেলি? তা না হলে এই এত দিন আমাকে তুই চিঠি লিখিসনি কেন? ডাকঘর এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে। আমাদের যে রান্না করে সেই খান চাচা সপ্তাহে দুবার সদরে যায় আনাজপাতি

কিনতে। ফেরার সময়ে চিঠি থাকলে নিয়ে আসে। আমি খান চাচার পথ চেয়ে বসে থাকি যদি তোর চিঠি আসে।

যত তাড়াতাড়ি পারিস জবাব দিবি।

একান্তই তোর,
সঞ্জ্যোৎ

প্রিয় তেজা,

এতদিন হয়ে গেল তুই আমাকে চিঠি দিলি না কেন? মনে হয় যে তুই আমাকে ভুলেই গেছিস। অবশ্য আমাকে তোর মনে পড়বেই বা কেন? ওখানে তো রুচি, মানসী—তোর কত বন্ধুই না রয়েছে। যে দূরে চলে গেছে সেই বন্ধুকে কে আর মনে রাখে? চোখের বাইরে তো মনেরও বাইরে! তাই নয় কি?

সত্যি করে বলনা, তেজু, আমাকে কি ভুলেই গেলি? আশা করি যে তোদের ওখানে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। কয়েকদিন ধরে দেখছি বাবা অসম্ভব চিন্তিত। সারাক্ষণ ট্রানজিসটার রেডিও কানে লাগিয়ে বসে আছে। গত সন্ধ্যায় ডাক্তারকাকুর সঙ্গে বাবার এক দীর্ঘ আলোচনা হল। ওদের খটোমটো সব কথা মাথায় না ঢুকলেও আমেরিকা, রাশিয়া, বোমা, যুদ্ধ—কয়েকটা শব্দ বার বার ঘুরে ফিরে আসছিল। বাবা যখন তর্ক করে তখন মনে হয় যেন লড়াই চলছে। বাবা তখন আর নিজের বশে থাকে না। এত জোরে টেবিল চাপড়ায় যে আমার ভয় লাগে। গতকালই, আলোচনার মধ্যে, বাবা হঠাৎ গলা নামিয়ে ডাক্তারকাকুকে কি যেন সব গোপন কথা বলল। মাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু মা কিছুতেই বলবেনা। তখন আমি কেঁদেকেটে একসা করলাম।

আজ সকাল থেকে রেডিওতে কোনো বাজনা নেই, গান নেই। ভাল করে কিছু শোনাই যাচ্ছেনা। শুধুই বিদঘুটে সব শব্দ। বাবা, মা, কাকু ও কাকী দেখলাম বেজায় ভয় পেয়েছেন। কি জানি বাপু রেডিও বিগড়ে গেলে এত ঘাবড়ে যাবার কি আছে। কখনো না কখনো সব যন্ত্রই তো গড়বড় করে। তোকে বলব কি, মা হঠাৎ প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেল। ডাক্তারকাকু মা-কে পরীক্ষা করে দেখলেন। ইঞ্জেকশন দিলেন।

তুই তো জানিস আমি ইঞ্জেকশন কি ভয় পাই। চুপচাপ ওখান থেকে সরে পড়ে আমি বারান্দায় পালিয়ে এলাম। তখনই ভাবলাম যে তোকে চিঠিটা লিখব। লেখার পর অনেক ভাল লাগছে।

তেজু, তোকে একটা খুব গোপন কথা জানাচ্ছি। কিন্তু আগে তুই কথা দে যে কাউকে বলবিনা। এমনকি রুচি ও মানসীকেও নয়। শোন তবে বলি। মা-র বাচ্চা হবে, বুঝলি? গত রাত্তিরেই মা আমাকে কথাটা বলেছে। ভয় পেয়ে আমি তো কাঁদতেই শুরু করে দিলাম। শুধু আমাকে আশ্বস্ত করার জন্যই মা আমাকে কথাটা বলেনি। সত্যিই মা-র বাচ্চা হবে। এখনও দেরি আছে। অন্তত পাঁচ ছ'মাস তো লাগবেই। তাই মা আমাকে বলেছে এখনই কাউকে না জানাতে। দোহাই তোকে, কাউকে বলবিনা।

মা আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে আমার কি চাই—ছোট্ট একটা ভাই না বোন? কিট্টুর মত একটা ভাই পেলে আমার খুব ভাল লাগবে। কিন্তু আমরা তো এটা ঠিক করতে পারিনা, তাই নয় কি? তাই আমি মাকে বললাম যে ভাই বা বোন যাই হোক আমার পছন্দ হবে। আমি শুধু চাই যে সে আমার সঙ্গে খেলা করবে। মা আমার কথা ঠিক বুঝতে পারল না। তখন আমি বললাম যে আর যাই হোক, বাচ্চাটা যেন মানসীর ভাই-এর মত না হয়। আমি কি বোঝাতে চাই তুই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিস। পারিসনি? মানসীর ভাই-এর চোখে প্রায় সব সময় কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাবলেশহীন দৃষ্টি। ওর বয়স হয়েছে আট কিন্তু এখনও ও ঠিকমত উঠে দাঁড়াতে পারেনা। দিব্যি গেলে বলছি যে কক্ষনো আমি চাইনা যে আমার ভাই বা বোন ঐরকম হোক।

আজ এখানেই শেষ করছি। মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে। সকাল সবে দশটা কিন্তু আকাশে এত মেঘ যে বাইরেটা অন্ধকার দেখাচ্ছে।

খান চাচা সেই ভোরবেলা সদরে গেছে আনাজ কিনতে। নির্ঘাৎ খান চাচা বৃষ্টিতে ভিজবে।

তোর বাবা-মাকে আমার প্রণাম দিস। আগের চিঠিতে এটা বাদ পড়ে গিয়েছিল। ওঁরা কি কিছু মনে করেছেন? আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

তোর

সঞ্জ্যোৎ

প্রিয় তেজা,

এখানে গাঢ় আঁধার চারদিকে। আজ কত তারিখ আমি জানিনা। তোকে শেষ চিঠি লেখার দিন যে অন্ধকারের কথা লিখেছিলাম তা সেই থেকে রয়েই গেছে। সারাক্ষণই আমরা শুয়ে থাকি। যখন খিদে পায় তখন উঠে আমরা কিছু খাই।

তারপর আবার শুয়ে পড়ি। আর যা খাই আমরা! দিনের পর দিন সেই একঘেয়ে ঝোল।

অবশ্য দিনের পর দিন আমার বলা ঠিক নয় কারণ কতগুলো দিন যে কেটে গেছে আমি জানিনা। এতদিন ধরে সূর্য ওঠেনি। অন্ধকার এবং সারাক্ষণ অন্ধকার বাদে আর কিছুই নেই। খুবই বিরক্তিকর একঘেয়ে লাগছে কিন্তু কিই বা আমার করার আছে?

তোকে একটা কথা জানাতে ভুলে যাচ্ছি। তোকে লেখা শেষ চিঠিটা পাঠানোর পরে আমরা ডাক বাংলোর ভূগর্ভস্থ অংশটায় চলে এসেছি। বাবা বলেছে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। কিন্তু আমরা কোনো কামানের গর্জন বা ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার শব্দ পাইনি। প্রথমে ছিল ধুলোর ঝড়, চারদিকে। প্রথম কয়েকদিন তো আমাদের সেই ধুলোর মধ্যেই নিশ্বাস নিতে হয়েছিল। এমনকি দাঁতেও সেই ধুলো সত্যি কিচ্ কিচ্ করছিল। বাতাস ফিল্টার করার জন্য আমরা মুখে রুমাল বেঁধে নিয়েছিলাম। এখন ঐ ধুলো একটু কমেছে কিন্তু অন্ধকার যেমন ছিল তেমনই রয়েছে। এ কেমন যুদ্ধ কে জানে?

বাবা বলেছে যে প্রচণ্ড বোমা ফেলার জন্য এটা হয়েছে এবং যতক্ষণনা এই ধুলো থিতিয়ে পড়বে ততক্ষণ আলোর দেখা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। সত্যিই কি তাই হবে? নির্ঘাত এবার আমি পাগল হয়ে যাব।

তলার কুয়োর জলের জন্য আমাদের অবস্থাটা আরও খারাপ হয়ে পড়েছে। আগেকার চিঠিতে ঐ কুয়োর কথাটা লিখেছিলাম। মনে পড়ছে? কি দুর্গন্ধ ঐ জলে! কিন্তু সেই জলই আমাদের খেতে হচ্ছে। আর কোনো উপায় নেই। প্রথম যখন ঐ জল আমরা খেয়েছিলাম, আমাদের সকলের বমি হয়ে গিয়েছিল। এখন আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। ঐ জল খেতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি কিন্তু আর কিই বা আমাদের করার ছিল? বাবা বলেছে যে এখনও বেশ কিছু দিন ধরে ঐ কুয়োর জলই আমাদের খেতে হবে।

তোদের ওখানে কেমন অবস্থা আমি জানিনা। ওখানেও কি এমনই অন্ধকার চলছে? নিশ্চয়ই তোদের এরকম নর্দমার মত জল খেতে হচ্ছে না। তোরা নিশ্চয়ই পরিস্কার জল পাচ্ছিস যাতে এরকম দুর্গন্ধ নেই।

অন্ধকার যখন থেকে ঘনিয়ে এল কিট্টু তখন থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সারাক্ষণ তার খালি ঘুম ঘুম পায়। সেই কারণেই বেশির ভাগ সময়টা আমরাও শুয়ে থাকি। কিন্তু আমরা নিজেরা অন্তত পরস্পর কথা বলতে পারি কিন্তু কিট্টু কোনো কথাই বলে না। শুধু থেকে থেকে কাতরায়। তার সারা শরীরে ফুসকুড়ি

ছড়িয়ে পড়েছে।

আজকের চিঠি এখানেই শেষ করছি। এর কারণ এই নয় যে আমি ক্লান্ত। আসলে মোমবাতিটা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এখানে বেশি মোমবাতি আমাদের জ্বালানোর উপায় নেই। আর বাইরে এত ঠাণ্ডা যে আমার হাতদুটো জমে কাঠের মত হয়ে যাচ্ছে। এখানে বিদ্যুৎ নেই। তাই খুব হিসেব করে মোমবাতি জ্বালতে হয়। তোর ওখানে বিদ্যুৎ আছে, এসব সমস্যাই নেই।

আমি নিশ্চিত যে স্কুল খুলে গেছে। কিন্তু সে সব খবর দিয়ে তুই যদি চিঠিও দিস তাহলে ডাকঘর থেকে সেগুলো আনবে কে? খান চাচা সেই দিনের পরে আর ফেরেনি।

তোর বাবা-মাকে আমার প্রণাম জানাস।

তোর

সঞ্জ্যোৎ

প্রিয় তেজা,

মাত্র কয়েক মিনিট আগে কিট্টু মারা গেল। ওর কি হয়েছিল আমি জানিনা। সারাক্ষণ খালি কাঁদত। মাথার সব চুল উঠে গিয়েছিল। শরীরের সব লোম, এমনকি নখও পড়ে গিয়েছিল। চোখদুটো রক্তরাঙা। সারা গায়ে ফুসকুড়ি আর ঘা। হায় রে কিট্টু! ওর এই কষ্ট আমি যেন আর চোখে দেখতে পারছিলাম না।

আমার ভীষণ ভয় করছে। একা একা কেঁদেই চলেছি।

তোর

সঞ্জ্যোৎ

প্রিয় তেজা,

গতকাল আমার মা-র একটি বাচ্চা জন্মায়। কিন্তু জন্মগ্রহণ করার আগেই সে মারা গিয়েছিল। সে যাই হোক আমি বলব এটা ভালর জন্যই হয়েছে। তুই নিশ্চয়ই ভাবছিস যে নিজের একটা ছোট্ট ভাই সম্বন্ধে সঞ্জ্যোৎ এমন কথা বলছে কি করে। কিন্তু কি করব বল? আমার জায়গায় থাকলে তুইও এমন কথাই বলতিস কারণ...সেই শিশুটির হাত, পা কিছুই ছিল না।

ঐ যুদ্ধের কোনো ক্ষতিকারক রশ্মির ফলেই নাকি এরকম হয়েছে। আমি বাবাকে

জিজ্ঞেস করলাম যে এই যুদ্ধের পরে যে শিশুরা জন্মাবে তারা কি সকলেই ওরকম বিকলাঙ্গ হবে? বাবা বলল, 'না! দুতিনবছর পরে যে শিশুরা জন্মাবে তারা স্বাভাবিকই হবে। অবশ্য যদি না...।' বার বার আমি প্রশ্ন করলাম পরেরটুকু বলার জন্যে। বাবা উত্তর দিলনা। বার বার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু কিছুতেই বলল না।

আমি ভেবেছিলাম যে সন্তান হারাবার দুঃখে মা খুব কান্নাকাটি করবে। কিন্তু মা মোটেও কাঁদেনি। মা শুধু আমাকে আঁকড়ে ধরে আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

কাকী একবারই বাচ্চাটাকে দেখতে এসেছিল। দেখেই চিৎকার, তারপর আর্তনাদ করে কাঁদছিল আর পাগলের মত হাত পা ছুঁড়ছিল। বাংলায় কথা বলছিল বলে আমি সব বুঝতে পারিনি। ডাক্তারকাকু কোনোমতে কাকীকে চুপ করালো।

অনেকদিন পরে আমরা একসঙ্গে খেতে বসলাম। অবশ্যই সেই ঝোল আর ভাত কিন্তু একসঙ্গে বসে বেশ ভালই লাগছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার হল আজ সকালে বাইরে আমি যেন ভোরের কিছু আভাস দেখতে পেলাম। ধোঁয়াটে এক ধুলোমাখা আভা দেখে মনে হল ভোর হচ্ছে।

সত্যিই যদি ভোর হয় তাহলে আমি আবার তোর কাছে ফিরে আসব। এই একঘেয়েমি একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রাণ বেরোচ্ছে।

তেজু, এ বছর কে আমাদের ক্লাস টিচার হলেন রে?

তোর

সঞ্জ্যোৎ

প্রিয় তেজা,

কেন যে তোকে চিঠি লিখে চলেছি নিজেই জানিনা। তোর কাছে চিঠিগুলো পৌঁছয় কিনা তাও জানা নেই। বাবা বলে যে চিঠিগুলো ডাকঘরে পৌঁছে দেয়। মাঝে মধ্যে ডাক্তারকাকু আর বাবা টর্চ হাতে করে বেরোয়। বাইরে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। ভেতরেও অসম্ভব ঠাণ্ডা। বাড়ির ভেতরে, একটা কোণে আমরা আগুন জ্বালিয়ে রাখি। সব কাজ আমরা ঐ আগুনের আলোয় করি। আগুন জ্বালাবার জন্যে যখন কাঠের দরকার হয় তখন তা নিয়ে আসার জন্যে বাবা বেরোয়। বেরোবার সময় বাবা একটা মজার দেখতে জোব্বা পরে। বাবাকে ঠিক ভূতের মত দেখায়। ঐ

পোষাকে বাবাকে দেখলে আমি হাসি চাপতে পারিনা।

ডাক্তারকাকু আমার সঙ্গে আর খেলেনা। কিট্টুর মৃত্যুর পরে ডাক্তারকাকু সবসময়েই যেন নিজের মনেই থাকে। সিগারেটের মজুতও তাঁর ফুরিয়েছে প্রায়। নিজেকে আনন্দ দেওয়ার মত খুব অল্পই রয়েছে। কাকী কখনোই বেশি কথা বলত না। কিন্তু এখন দেখি যে কাকী সবসময়েই আপনমনে কি যেন বিড়বিড় করে। কখনও কখনও বাবা ও মা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলে। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। ভীষণ একা লাগে বলে কাঠের আগুনের আলোয় আমি তোকে চিঠি লিখি। যা মনে আসে তাই লিখি। সব চিঠি আমি ডাকে ফেলার জন্য দিইওনা কারণ আমি চাইনা যে বাবা এই ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে যাক। যখন আমাদের সত্যিই দেখা হবে আমি তোকে নিজের হাতেই সবগুলো চিঠি দেব।

আমাদের স্কুল কি শুরু হয়েছে? গত বছর আমার কি ফল হল তাই এখনও জানতে পারলাম না। অবশ্য পাশ আমি করবই কিন্তু কত নম্বর স্থানে আছি তা বলতে পারব না। তোর আর রুচি-র কেমন হল? কি করেই বা জানব? বাবা বলে যে এই অন্ধকারের জন্যে কোনো চিঠি আসে না। তুই কি আমাকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে পারিস? টেলিগ্রাম হলে সেটা দেবার জন্যে ডাকহরকরাকে গভীর রাত হলেও আসতে হবে। বোম্বাইতে এইভাবে টেলিগ্রাম আসতে আমি দেখেছি।

হয়তো এখানেও তেমনই করা হবে। বাবাকে এ বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। আর ধর, কোনোদিন যদি সেই পুরনো সুন্দর দিনগুলোর মত আলো ফিরে আসে আর আমি ওখানে যেয়ে পৌঁছই তাহলে ওরা কি আমাকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করবে নাকি আমার একটা বছরই নষ্ট হবে?

তোর

সঞ্জ্যোৎ

প্রিয় তেজা,

আমাদের এই ছোট্ট পরিবারে চারজন মাত্র এখন বেঁচে আছে—বাবা, মা, কাকু আর আমি।

দিনদুয়েক আগে, দুপুর বেলা, সামান্য একটু আলো ফুটেছিল। আমাদের সেই বাঁধাধরা খাওয়া সেরে তখন আমরা সেই দুর্গন্ধ জল খাচ্ছি। হঠাৎ কাকী সহসা চিৎকার করে বাইরে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। ডাক্তারকাকু শান্ত করার জন্য পিছু

নিয়েছিল কিন্তু বাবা কাকুকে থামিয়ে ঐ মজাদার জোব্বাটা পরতে বাধ্য করল। নিজেও একটা পরল। তারপর দুজনে মিলে কাকীর সন্ধানে বেরোল।

দু-তিন ঘণ্টা পরে ওরা ফিরে এল সঙ্গে কাকীকে নিয়ে। ওদের সঙ্গে ফিরে এলেও সেই থেকেই কাকী ভারি অসুস্থ হয়ে পড়ল। বদহজম আর বমিতে রক্ত উঠছিল কারণ কাকী বাইরের ঐ নদীর জল খেয়েছিল। যুদ্ধের সময়ে ব্যবহৃত কিছু বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ঐ নদীতে মিশে যায়। ঐ বিষই কাকীর অসুস্থতার কারণ।

এর অর্থ হল জীবনের বাকি প্রত্যেকটা দিন আমাদের কুয়ো থেকে ঐ দুর্গন্ধ জল খেয়ে চলতে হবে। পরিস্কার জল পাওয়ার আর কোনো আশাই নেই...উঃ কি দুর্গন্ধ ঐ কুয়োর জলে! গা গুলিয়ে ওঠে! ইচ্ছে করে যদি ওদের চোখে ধুলো দিয়ে কাকীর মত পালিয়ে যেতে পারি।

দুশ্চিন্তা করিস না। ওরকম কিছু আমি করব না। অন্তত...না, কক্ষনো না। এ নিয়ে কথা থাক। আমি আশা ছেড়েই দিয়েছি যে তুই আর কখনও আমাকে চিঠি লিখবি। যাই হোক, অন্তত তুই জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে থাকা তোর বন্ধুর চিঠিগুলো পড়তে পারিস।

তোর

সঞ্জ্যোৎ

পুনশ্চ

বাবার কড়া হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও, তাঁকে জানতে না দিয়ে আমি গোপনে তাঁর পিছু পিছু বাইরে গিয়েছিলাম। ভূগর্ভস্থ কক্ষে চলে যাওয়ার পর এই প্রথম আমার বাইরের পৃথিবীতে পা ফেলা। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করা দায়। চারদিকে যে সবুজ বিষুব অরণ ছিল তা কয়েকটা শুকনো কাঠের গুঁড়িতে পরিণত হয়েছে।

তোদের ওখানেও কি এই অবস্থা...আমি চিন্তাও করতে পারি না।

প্রিয় তেজা,

এটাই আমার তোকে লেখা শেষ চিঠি। গত কয়েকদিন ধরেই আমার জ্বর চলছে। পেটে অসহ্য ব্যথা। টিপলে মনে হয় ভেতরে খুব শক্ত কিছু একটা রয়েছে। ভীষণ দুর্বল লাগছে। এত দুর্বল যে হয়তো আমি আর লিখতে পারব না। আর কোনো চিঠি লেখা হবে না তাই যা কিছু লিখতে চাই সব এই চিঠিতে রইল।

এই চিঠিটা ডাকে ফেলার জন্য আমি বাবাকে দেব না।

আমি চাই যে চিঠিটা তোর কাছে যাক তাই চিঠিটা আমি নিজের পকেটেই রাখছি। যখন দেখা হবে তখন নিজেই আমি তোকে দেব। আমি জানি যে তুই এই পৃথিবীতে আর নেই! সত্যি বলতে অনেকদিন ধরেই জানি। আরও সঠিকভাবে বললে যখন থেকে আমরা ভূগর্ভস্থ কক্ষে থাকতে শুরু করি তখন থেকেই। তবুও তোকে একের পর এক চিঠি আমি লিখে গেছি যখন আমার খুব ভাল করেই জানা ছিল যে চিঠিগুলো নেওয়ার জন্য তুই নেই। কিন্তু যখনই লিখেছি তখনই আমার মনে হয়েছে যে আমি তোর খুব কাছে রয়েছি। তাই এই বিলাসিতা। এটা না করলে আমি পাগল হয়ে যেতাম।

আরও একটা কারণ আছে। বাইরের পৃথিবীটা যে কি ভয়াল ধ্বংসের মধ্যে পড়েছে যে বিষয়ে আমার বাবা-মা ভেবেছিলেন আমি কিছুই জানি না। আমাকে ভুল বোঝাবার জন্য বাবা-মা আর ডাক্তারকাকু খুব চেষ্টা করেছিল। আমিও ঠিক করেছিলাম যে ওদের বুঝতে দেব না যে সবই আমি জানি। ভাণটা আমি বজায় রেখেছি।

বাইরেটা এখন পরিস্কার হয়ে গেছে। কিন্তু বাবা বলেছে যে এখনও প্রায় বছর দুয়েক, বাইরে, সূর্যের আলোয় যাওয়া চলবে না। বাইরের জলও খাওয়া চলবে না। অতএব আরও অন্তত একবছর ঐ কুয়োর দুর্গন্ধ জল খেতে হবে। অবশ্য আমার তাতে করে কোনো দিক দিয়েই খুব একটা কিছু যাবে আসবে না।

তুই হয়তো ভাবছিস যে নিজের সম্বন্ধে এরকম বেপরোয়াভাবে কিভাবে কথা বলছি আমি। আমার মনে হয় যে গত এক বছরে আমি অনেক বড় হয়ে গেছি। মৃত্যুকে আমি একটুও ভয় পাই না। সত্যি বলতে আমার আনন্দই হচ্ছে ভাবতে যে তোর সঙ্গে আমার স্বর্গে দেখা হবে।

আমি ঠিক জানি যে আমার মা-র আরও অনেক সন্তান হবে। আমি বাঁচতে না পারলেও তারা বাঁচবে এবং দীর্ঘদিন ধরে বাঁচবে। কথাটা বাবা বলেছিল। বাবা বলেছিল যে একবছর পরে যে শিশুরা জন্মাবে তারা আমার সেই ভাইয়ের মত হবে না যে মারা গিয়েছিল। আমার ভবিষ্যতের ভাই ও বোনেরা হবে স্বাস্থ্যে ভরপুর ও স্বাভাবিক। তারা স্বাভাবিকভাবেই বড় হয়ে উঠবে এবং পৃথিবীতে সবকিছুই ঠিকঠাক চলবে।

একটা ব্যাপার নিয়ে আমি শুধু ভাবি, বার বার ভাবি। আমার ভাই ও বোনেরা কাদের বিয়ে করবে?

নিশ্চয়ই কোথাও কয়েকটি পরিবার কোনোভাবে রক্ষা পেয়েছে। আশা করি যে সেইসব পরিবারে আবার সন্তান হবে। তাদের মধ্য থেকেই আমার ভাই ও বোনেরা

তাদের সাথীদের বেছে নেবে এবং নতুন করে জীবন শুরু করবে। আমি কি ঠিক বলছি? মনে হয় ঠিকই বলছি।

আসছি, তোর সঙ্গে দেখা করার জন্য।

তোর

সঞ্জ্যোৎ

লোকটা

নিরঞ্জন এস. ঘাটে

সচরাচর কোনো যুবকের সঙ্গে কোনো যুবতীর সাক্ষাৎ হলে সে মেয়েটিকে সত্যিই ভালভাবে দেখতে চেষ্টা করে। ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। হাজার হলেও কোনো সুন্দরী মেয়েকে দেখা তো আর অপরাধ নয়! এমন হতে পারে যে কোনো যুবক কোনো নির্দিষ্ট তরুণীর দিকে দেখল না। কেউ আবার অন্য কোনো যুবককেই হয়তো দেখতে থাকল। কেউ হয়তো ভেবে বসল যে মেয়েটার বয়স যদি আরও কম হত...। যাকগে, ওসব পুরুষদের কথা থাক। আমরা যার গল্প শুনব সে হল সুপুরুষ, সফল এক যুবক যে ছিল সর্ব অর্থেই তারুণ্যে ভরপুর। মেয়েটিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদ্‌স্পন্দনের গতিটা বেড়ে গিয়েছিল। এটা অবশ্য হলফ করে বলা কঠিন কারণ স্টেথোস্কোপ বসিয়ে কেউ আসল ব্যাপারটা মেপে দেখেনি। তবু আমরা বলতে পারি যে তার নাড়ির গতি বেড়ে গিয়েছিল। কপালে ফুটে উঠেছিল বিন্দু বিন্দু ঘাম যার থেকে তার অবস্থার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। আপনমনে সে বিড়বিড় করে উঠেছিল, 'বাপ রে! হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন পাঁজরের গায় মাথা ঠুকছে! অজ্ঞান হয়ে যাব নাকি! এত বছর ধরে কত মেয়ে তো দেখতে ছাড়িনি কিন্তু এমন অসামান্য সুন্দরী কখনও চোখে পড়েনি।'

'ভালবাসা প্রেমিককে পাগল করে দেয়'। এই অতীব সত্য বাক্যটির বয়স মানবজাতির বয়সেরই সমান। তার এই চন্দ্রাহত রূপ দেখে বন্ধুরা প্রথম দিকে ঘটনাটির সত্যতা নিয়ে কিছুটা দোনামোনা করলেও স্বচক্ষে যখন তারা মেয়েটিকে দেখল কেবল তখনই তাদের মালুম হল যে কেন সে বার বার বলেছে যে অন্য কেউ যেন ঐ রূপসীর দিকে না নজর দেয়। যাই হোক, মেয়েটিকে প্রস্তাব দেওয়ার সুযোগ সেই যুবকই প্রথম পাবে। যদি মেয়েটি তাকে পাত্তা না দেয় তাহলে কি আর করা—আঙুরফল টক বলে তাকে অন্যত্র সন্ধান চালাতে হবে। অবশ্য, শেষোক্ত ক্ষেত্রে তার বন্ধুরাও ভাগ্যপরীক্ষার একটা সুযোগ পেত। বলাই বাহুল্য যে মেয়েটির সম্মতি যে পেত সেই বর্তে যেত।

আসলে, এই চিন্তাটা তার মাথায় আগেই আসা উচিত ছিল। কিন্তু সুবুদ্ধি সবসময়েই জাগ্রত হয় দেরি করে। তার উচিত ছিল মেয়েটির সম্বন্ধে ভাল করে খোঁজখবর নেওয়া। একবিংশ শতকের আধুনিকারা বিবাহের চিহ্ন হিসেবে না পরে সিঁদুর, না বাঁধে মঙ্গলসূত্র। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে ঐ সবের মত স্বামীদেরও তারা খরচের খাতায় তুলে দিয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা একাধিকবার বিবাহ করে। সুপ্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে এখনও তারা 'স্বামী' নামধারী উপজাতিটিকে উধাও করে দেয়নি।

যাই হোক, ভালবাসা হল অন্ধ। শুধু তাই নয়, প্রেমে যে পরে সেও অন্ধ হয়ে যায়। আমাদের সেই যুবকটিরও একই দশা হয়েছিল। সে মেয়েটিকে দেখেছিল কিন্তু তার স্বামীকে দেখেনি। সেক্ষেত্রে এত সহজে সে মেয়েটির কাছে হৃদয়সমর্পণ করে বসত না। কিন্তু যখন সে সত্যিই মেয়েটিকে তার স্বামীর সঙ্গে দেখল তখন তার দশা যা দাঁড়াল সে একেবারে অবাহতব্য। কোনো স্বাভাবিক লোকে যখন প্রেমে হাবুডুবু খাওয়ার পরে আবিষ্কার করে যে তার স্বপ্নের নায়িকা হল অন্য কারো স্ত্রী তখন তার কি হাল হয়? আমাদের যুবকটিরও একই অবস্থা হয়েছিল।

হৃদয়ভঙ্গের বেদনা কাটিয়ে উঠতে তার বেশ কিছু সময় লেগেছিল। হৃদয়ের ক্ষতগুলি সারতে বিস্তর সময় লাগলেও চেষ্টা করলে সেগুলোকে ঢাকাচাপা দিয়ে রাখা যায়। সে গোটা ব্যাপারটাই লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল। তার তৎকালীন মেয়ে বন্ধুটিও ব্যাপারটি বুঝতে পারেনি কারণ যুবকটি ছিল একজন কমপিউটার বিশেষজ্ঞ এবং যখনই সে কমপিউটারের সফট্ওয়্যারঘটিত কোনো সমস্যায় মগ্ন হয়ে যেত তখনই তাকে বেশ বিবাগীর মত দেখাত। তার ক্ষেত্রে এরকম প্রায়ই ঘটত। অনেকসময় আমরা সুবিধাজনকভাবে অনেক কিছু ধরে নিই। যেমন তার বন্ধুরা ধরে নিয়েছিল যে সে তার নিজস্ব পেশাজনিত সমস্যাতেই নিমগ্ন হয়ে রয়েছে। তার এই খাপছাড়া ভাবটি তার মেয়ে বন্ধুটির ভাল লাগছিল না। কিন্তু ব্যাপারটিকে সে বিশেষ আমল দেয়নি কারণ তার মন জুড়েছিল সদ্য হৃদয়ভঙ্গের ঘটনাটি।

আগেই বলা হয়েছে যে যুবকটি ছিল জনৈক কমপিউটার বিশেষজ্ঞ। এর ফলে কয়েকটি ব্যাপার সম্বন্ধে খোঁজখবর সংগ্রহ করা তার পক্ষে বেশ সহজই ছিল। কমপিউটার ব্যবহার করে মেয়েটির সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার লোভটি সে বেশ কিছুদিন সংবরণ করতে পেরেছিল। কিন্তু একদিন সে দেখতে পেল যে মেয়েটি তার বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত। ব্যাস্, আবার সে মেয়েটির প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করল। মেয়েটি পরেছিল সাদা শর্টস্ ও টকটকে লাল সার্ট। ঐ সার্টের আবার

সামনের বোতামটি ছিল খোলা। চিবুকে একটু মাটি লেগে। বোধহয় মাটিমাখা হাতে মুখের ওপরে এসে পড়া চুল সরাতে যেয়ে কাণ্ডটি ঘটে থাকবে। সুঠাম উরুর সঙ্গে মানানসই সাদা শর্টস—বলা কঠিন যে তার ত্বক ও শর্টসে-র সাদার মধ্যে কোনটি বেশি ফরসা। বেড়ার ওপার থেকে অপলক দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখছিল। এমন সময় মেয়েটির স্বামী মেয়েটির দিকে একটি প্লাস্টিকের প্যাকেট এগিয়ে দিল। এবং বেড়ার ওপার থেকে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে আমাদের যুবকটিও স্বপ্নজগৎ থেকে ধরাধামে নেমে এল। এই ধরাধামে নামিয়ে আনার মত ঘটনা যুবকটিকে একাদিক্রমে আরও কয়েকটি দেখতে হল। এইবার সে ঠিক করল যে মেয়েটির বিষয়ে জানার জন্য সে কমপিউটারের সহায়তা নেবে। আবাসন বিভাগের কমপিউটারের সঙ্গে সে যোগাযোগ করল। তার বাড়ীর বাগানের বেড়ার ওপরেই মেয়েটি থাকত। তাই সে মেয়েটির নাম, বাড়ীর নম্বর ও এই জাতীয় কিছু কিছু ব্যক্তিগত তথ্য জানত। ঠিকানা জানা থাকায় সহজেই সে জেনে ফেলল যে মেয়েটি কোথায় কাজ করে।

কিন্তু মোদ্দা ব্যাপারটি হল তার এই প্রচেষ্টা খুব একটা সফল হয়নি। তথ্যানুসন্ধানের প্রথম দফায় এরকম হতেই পারে—এই অজুহাত দেখিয়ে তার বিফল প্রচেষ্টাকে ধামাচাপা দিয়ে লাভ নেই।

অপ্রত্যাশিত ব্যাপারটি ঘটল সেই দিনই, বিকেলবেলায়। ওদিকে যুবকটিতো কিভাবে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করার জন্য ঘটনা একটি ঘটাবে তা মানসচক্ষে কল্পনা করে রেখেছিল। কিন্তু কমপিউটার বিশেষজ্ঞ বলে সে তার কল্পনার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধেও অবহিত ছিল। বিক্ষুব্ধ, ঝোড়ো আবহাওয়ায় বা বৃষ্টির মধ্যে একটি বিমান কি করে উড়বে তার আগাম ধারণা করা যায়। জাহাজে আগুন লাগলে কিভাবে তার মোকাবিলা করতে হবে এবং বিপদ এড়াতে হবে সে সম্বন্ধেও চিন্তাভাবনা করা খুবই সম্ভব। সুদূরের কয়েকটি গ্রহকে কিভাবে মনুষ্য বসবাসের যোগ্য করে তোলা যায় সে বিষয়েও কমপিউটার হদিশ দিতে পারে। সত্যি বলতে নিজের কমপিউটারের সাহায্যে কয়েকটি গ্রহতে সে সফলভাবে রকেট অবতরণ করাতে সফলও হয়েছিল। কিন্তু তার যেটা জানা ছিল না সেটা হল ভাইপো-র সঙ্গে বল ছোঁড়ার খেলা করতে করতে বলটি যদি 'হাত ফসকে' পড়শির বাগানে গিয়ে পড়ে তাহলে কি হবে। বলটি ফিরিয়ে দেবার সময় মেয়েটি কি মিষ্টি হেসে আলাপ করবে না মুখ ব্যাজার করবে। দুরকমই ঘটতে পারে। মানুষ কি করবে না করবে সে সম্বন্ধে কমপিউটারের জ্ঞান বড়ই কম।

এইসব ভাবনা মাথায় নিয়ে, কাজ সেরে বিকেলবেলায় বাড়ি ফেরার সময় সে

দেখে যে মেয়েটি একগাল মিষ্টি হাসি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে। শুধু তাই নয়, হাসতে হাসতে মেয়েটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে বেড়ার কাছে চলে এল। এদিকে তো যুবকটির বাড়ির স্বয়ংক্রিয় গেটটি খুলে গেল এবং তার গাড়িটা বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকল। ও নেমে গেল গাড়ি থেকে এবং তার রোবট গাড়িটা রাখতে গেল গ্যারেজে। হাবাগোবার মতই হাঁ করে সে মেয়েটিকে দেখছিল। মেয়েটি বেড়ার আরও কাছে এগিয়ে এল।

মেয়েটি বলল, 'আসুন না আজ আমাদের সঙ্গে চা খেতে!' যুবকটির মুখে তো কথা সরে না। সে কিন্তু মোটেও ওরকম মুখে কুলুপ আঁটা ধরণের ছিল না। বরং পরিহাসবোধ এবং ঝটপট জবাব দেওয়ার ক্ষমতার জন্য বন্ধুদের মধ্যে সে পরিচিত ছিল। কিন্তু সেদিন সামান্য এই চা খাওয়ার নেমন্তন্নের কথায় সে একেবারে বাক্যহারা হয়ে গিয়েছিল।

'চা যদি না খান তাহলে অন্য কিছু—কফি, সরবৎ বা যা কিছু আপনার পছন্দ। আসুন না লক্ষ্মীটি।'

কি করে যে সে মেয়েটির বাড়িতে ঢুকেছিল সে নিজেও জানে না। তার তখন এক সম্মোহিত অবস্থা। মেয়েটি তাকে আপ্যায়ন করে ভেতরে নিয়ে গেল। ঘরকন্নার কাজে মেয়েটিকে সাহায্য করার জন্য কোনো রোবট নেই দেখে তার বিস্ময়ই হল। এই বিস্ময়ের পেছনে ছিল দুটি কারণ। প্রথমটি হল আবাসন বিভাগের এইসব বাড়িতে যারা থাকে তারা সকলেই উচ্চ বেতনভোগী শ্রেণীতে পড়ে অতএব রোবটের খরচ যোগানোটা কোনো ব্যাপার নয়। দ্বিতীয়ত, মেয়েটি কাজ করে ভারতের অগ্রগণ্য রোবট নির্মাণকারী সংস্থা ভারত রোবট প্রোডকশনস্-এর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উচ্চ পদে। এইসব কারণেই মেয়েটিকে সব কাজ নিজের হাতে করতে দেখে যুবকটি অবাক হয়েছিল। অবশ্য এতে করে তার লাভই হয়েছিল। নিজের হাতে কাজ না করলে মেয়েটিকে বাগানে দেখতে পেতই বা কি করে?

রেকাবিতে দুই গেলাস সরবত নিয়ে এল মেয়েটি। তার স্বামী আসেনি। বোধহয় নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল। একটি গেলাস তুলে ছোট্ট একটা চুমুক দিল যুবকটি।

আচমকা মেয়েটি সরাসরি বলল, 'আমার সম্বন্ধে জানার ইচ্ছে থাকলে বললেই পারতেন। আমি নিজেই সব তথ্য আপনাকে না হয় দিতাম।' যুবকটির তো বিষম খাওয়ার অবস্থা।

কোনোমতে সে বিড়বিড় করল, 'কিন্তু আসলে...।' "কি 'কিন্তু আসলে'? আপনি তো নিজে একজন কমপিউটার বিশেষজ্ঞ। আপনার এটা জানা উচিত ছিল। আমি নিজে রোবট নির্মাণের সঙ্গে জড়িত। তাই কে বা কারা আমাদের সম্বন্ধে খোঁজখবর

নিচ্ছে তার ওপর আমরা কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করেছি। এই ব্যাপারে যে কমপিউটার কর্মসূচী সেটা আমার নিজের হাতে তৈরি। আপনি নিজেকে একজন কমপিউটার বিশারদ বলে জাহির করেন কিন্তু আপনার সম্বন্ধেও সব নাড়িনক্ষত্রের খবর যোগাড় করতে আমাদের খুব একটা অসুবিধা হয়নি। ভবিষ্যতে আপনি এ বিষয়ে আরও সতর্ক হলে ভাল করবেন কারণ আপনার কর্মকৃতির তালিকাটি সত্যিই, খুবই প্রশংসার দাবি রাখে," হাসিমুখে মেয়েটি যেন কথাগুলো ওকে ছুঁড়ে মারছিল।

কোনোমতে যুবকটি বলল, 'ধন্যবাদ।'

'সে কি, এখনও সরবত শেষ করেননি।'

বড় চুমুক দিয়ে একবারে সরবত শেষ করল সে। গেলাসটি রাখতে রাখতে বলল, 'যাই হোক, আপনাকে অন্তত এটুকু বলতে পারি যে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য আমার ছিল না। একেবারে পাশের বাড়ির পড়শি সম্বন্ধে কৌতূহল, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।'

'আপনার উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো সন্দেহই আমার ছিল না। প্রতিবেশী সম্বন্ধে জানার ইচ্ছা থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক। আসলে আমি নিজেই আপনার কাছে আসতাম কিন্তু যখন জানতে পারলাম যে আপনি আমার বিষয়ে কমপিউটারের স্মৃতি ভান্ডার থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন তখন ঠিক করলাম আর একটু অপেক্ষা করার। ভাল কথা, আমাদের কোম্পানি একেবারে আধুনিকতম মডেলের KRE-1000 কিনছে। আপনি এই কমপিউটারে কাজ করতে আগ্রহী?'

প্রস্তাবটি শুনে যুবকটির তো তাজ্জব অবস্থা। KRE-1000 হল অতীব ক্ষমতাসম্পন্ন এক কমপিউটার। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এ হল এক অসামান্য উন্নত উদাহরণ। যে কোনো কমপিউটার বিশারদই অনুরূপ কোনো কমপিউটারে কাজ করার স্বপ্ন দেখে থাকে। তার পক্ষেও প্রস্তাবটি ছিল একেবারে হাতে চাঁদ পাওয়ার মত। গোটা মহাবিশ্বে ওরকম ক্ষমতাসম্পন্ন কমপিউটারের সংখ্যা বড়জোর দশ পনেরটি হবে। পৃথিবীতে তার মধ্যে রয়েছে মাত্র তিনটি। তাই এত সহজে মেয়েটি প্রস্তাবটি দিয়েছে যে যুবকটির তো বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চায় না। হাঁ করে সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছিল।

'ওরকম করে কি দেখছেন আমার দিকে চেয়ে? প্রস্তাবটি মনে যদি না ধরে তো স্রেফ ভুলে যান। আপনি আমার সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছেন। আমিও ঠিক তাই করেছি। প্রসঙ্গত বলে রাখি যে আমার উদ্দেশ্যও কিন্তু অসৎ ছিল না,' মেয়েটি যেন বুঝিয়ে বলতে চাইছে।

ইত্যবসরে যুবকটি একটু ধাতস্থ হয়েছে। সে বলল, 'না, না, সে প্রশ্নই ওঠে না। আসলে KRE-1000 নিয়ে কাজ করার স্বপ্ন আমার বহুদিনের কিন্তু কখনোই ভাবিনি যে সেটা কোনোদিন সত্য হতে পারে। আমাদের মত লোকেদের অনেক সুন্দর স্বপ্নই তো থাকে কিন্তু তার মধ্যে কটা আর সত্য হয় বলুন।' ওর কথার মধ্যে মেয়েটির স্বামী তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কাচের আলমারি থেকে কি একটা বের করল। মেয়েটি আর তার স্বামী চোখে চোখে কি যেন পরস্পরকে জানাল। ওর স্বামী আবার কাজে ফিরে গেল।

পুনরায় কথায় ফিরে মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ, কি যেন বলছিলেন?'

'আমাদের স্বপ্ন খুব কমই সত্য হয়।'

'স্বপ্ন আবার সত্যও হয়, জানেন তো। সবকিছুই সম্ভব হয় যদি আপনি পর্যাপ্ত চেষ্টা করেন। ধাক্কা মারুন, তবেই তো দরজা খুলবে। কিন্তু আপনার দিকে তো দেখছি চেষ্টাটাই নেই। এই তো আপনাকে আমি প্রস্তাব দিলাম!'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে মেয়েটিকে দেখছিল। তাকে দেখে কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল যে কথাগুলোকে সে যথেষ্টই গুরুত্ব দিচ্ছে।

'ঠিক আছে, কার কাছে আমাকে দরখাস্ত করতে হবে? কমপিউটারের মাধ্যমেই আমি আমার পড়াশুনা সংক্রান্ত তথ্য ও প্রশংসাপত্রগুলি পাঠিয়ে দেব না হয়।'

'তাহলে আপনি আমাদের কোম্পানিতে যোগদান করছেন?'

'ঠিক তা নয়। আপনি যেমন বলেছেন তেমন দরখাস্ত আমি একটা পাঠিয়ে দেব। কিন্তু সেটা করলে আমি স্বাধীনতা হারাব। দয়া করে ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন।'

'ইচ্ছে করলে আপনি কিন্তু এখনই 'ভারত রোবট প্রোডাকশনস্-এ যোগ দিতে পারেন।'

'কথাটা ভেবে দেখার জন্যে সত্যিই আমার কিছু সময়ের দরকার।'

'কতটা সময়ের দরকার আপনার?'

'এক সপ্তাহ!'

'বেশ। ভেবেচিন্তে আপনার সিদ্ধান্ত জানাবেন।'

'সেই কথাই থাকল। এবারে আমি তাহলে উঠি?'

' সে আবার কি কথা! এই বিষয়টা তো নিছক কথাপ্রসঙ্গে উঠল। আসুন, আর একটু গল্প করা যাক। তবে জানবেন যে আমরা, মানে আমাদের কর্মীদের দলে আপনাকে পেলে খুব ভাল লাগবে।'

এরপর কতকিছু নিয়েই না তাদের কথাবার্তা হল—চলতি খোজখবর, ত্রিমাত্রিক

ছবির টেপ, বুধগ্রহে ছুটি কাটানোর ব্যবস্থা, যুবকটির পেশা, মেয়েটির কাজ, তার বাগানের শখ, নতুন রোবট তৈরির চেষ্টা। মেয়েটি বলল যে এইজন্যই সে বাড়িতে একটিমাত্র রোবট রেখেছে। এরপরে আবার দ্বিতীয় দফা সরবত খাওয়া হল এবং দুদিন পরে যুবকটিকে মেয়েটি নৈশভোজেও আমন্ত্রণ জানালো।

মেয়েটি যখন তাকে নৈশভোজের দিনটি পুনরায় মনে করিয়ে দিল তখন তার আনন্দে প্রায় আত্মহারা অবস্থা! কিন্তু শীঘ্রই চিন্তাশক্তি ফিরে পেয়ে সে ঠিক করল বিবাহিতা এই মেয়েটির সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখার সময় সে কিছুটা দূরত্ব রক্ষা করে চলবে। দুদিন কেটে গেল। নৈশভোজের দিনটি এসে গেল।

মেয়েটিকে দারুন দেখাচ্ছিল...তৎসহ উত্তেজক পানীয়ের ফলে বেশ আমেজেরও সৃষ্টি হয়েছিল। মেয়েটি বলল যে খাবার দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্নটা সে করেই বসল, 'আপনার স্বামী বাড়িতে নেই?' কিছুটা ঠাট্টার ঢঙেই হাসিমুখে মেয়েটি বলল, 'আমার স্বামী? ও হ্যাঁ। ও আজ রাতে কিছু খাবে না বলছিল। একটু বেরিয়েছে।'

যুবকটি বলল, 'তাই নাকি! আমি দুঃখিত।' মেয়েটি প্রশ্ন করল, 'এতে আবার আপনার দুঃখিত হওয়ার কি আছে?'

যুবকটি ভেবেছিল যে নৈশভোজটি মাঠে মারা গেল কিন্তু মেয়েটি তা হতে দিল না। গল্প করতে করতে সে মেয়েটিকে খুলেমেলে অনেক কথা বলল। ওকে দিয়ে যেন মেয়েটি কত কথাই বলিয়ে নিল। খাওয়াদাওয়া শেষ করার পরে তার মনে হল যে মেয়েটি আর সে যেন অনেকটা কাছাকাছি চলে এসেছে। অনেকক্ষণ ধরে তাদের মধ্যে প্রাণখুলে অনেক গল্প হল। যখন সে ফেরার জন্য উঠল তখন মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত। মেয়েটি জানতে চাইল, 'আমাদের প্রস্তাবটা নিয়ে কিছু ঠিক করলেন?' জবাবে সে বলল, 'আর কিছুটা সময় লাগবে ভাবতে।' 'আবার আসতে হবে কিন্তু।' মেয়েটির মুখে একগাল হাসি।

সেই রাতে যুবকটির ঘুম হল না। নতুন চাকরির প্রস্তাব নিয়ে সে কিন্তু ভাবছিল না। সে কেবল ভাবছিল মেয়েটির কথা। সমগ্র মানবজাতি ও সভ্যতার সে মুণ্ডপাত করছিল। এমনকি দুই শতাব্দী আগেও মানুষ যার সঙ্গে পছন্দ তার সঙ্গেই একটা সম্পর্ক তৈরি করতে পারত কিন্তু মারাত্মক এইডস মহামারী যে সব কিছুই নষ্ট করে দিয়েছে এবং আবার নতুন করে বিবাহপ্রথা ফিরে এসেছে। মেয়েটি তার স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করে তাকে বিবাহ করবে কি না সে সম্বন্ধে সে নিশ্চিত নয়। ওদিকে 'ভারত রোবট প্রোডাকশনস'-এ চাকরিটা নিলে সারাক্ষণ ঐ মেয়েটার সঙ্গে দেখা হবে। ঘুম একটু এল কিন্তু স্বপ্নের ঘোরে সে দেখল যে মেয়েটার ওপরে

ও সাঙ্ঘাতিক অত্যাচার করছে। চমকে গিয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল। বাকি রাতটা গেল ভাবতে ভাবতে। এক ফোঁটা ঘুমও এলনা।

পরের দিনটি ও বাড়িতেই কাটালো। রোবটকে নির্দেশ দিল যে সারা দিনে যত দেখাসাক্ষাৎ করার কথা আছে, সব বাতিল করে দিতে। বিকেল গড়িয়ে আসছে, হঠাৎ ভিসিফোনের যন্ত্রটি বেজে উঠল। মেয়েটি তার সঙ্গে কথা বলতে চায়। সে সম্মতি জানাল।

মেয়েটি বলল, 'আমি আপনার কাছে আসছি।' যন্ত্রটি সহসা থেমে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি এল।

'কি খবর মশাই! ভাবলাম আমার রন্ধনপটুত্বে আপনার আবার পেটের গণ্ডগোল হল নাকি?'

যুবকটি মাথা নেড়ে জানালো যে তা নয়। মেয়েটিকে বসতে অনুরোধ করল। বলল, 'আমি খুবই গুরুত্ব দিয়ে আপনার প্রস্তাবটি বিবেচনা করেছি। KRE-1000 নিয়ে কাজ করতে আমার অবশ্যই খুবই আনন্দ হত কিন্তু সেই কারণে নিজের স্বাধীনতার বিষয়ে আপোস করতে আমি প্রস্তুত নই। আর সত্যি বলতে চাকরি আমার ঠিক ধাতে সয়না। মানে, ঠিক একটা দলে মানিয়ে নিয়ে কাজ করতে আমি পারব না। ঠিক করেছি যে প্রস্তাবটি আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু ওখানে তো দল বলতে যা বোঝায় তা থাকছে না। শুধু আপনি আর আমি থাকব। আমরা একসঙ্গে পুরো কাজটা সাজিয়ে নেব। এমনকি আপনি যদি মনে করেন যে আমাকে দরকার নেই তাহলে কোম্পানি সেটাও মেনে নেবে। নিরাপত্তামূলক ছাড়পত্র জাতীয় কিছু ছোটখাটো ঝামেলা থাকবে কিন্তু সেগুলো ঠিক করে নিতে অসুবিধা হবে না।'

যুবকটি বলল, 'ঠিক এই কারণেই আমি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করছি।'

'কিন্তু আমি...আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি না। কেন?'

'এবার তাহলে সত্যি কথাটা বলেই ফেলি। দেখুন, আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার ব্যাপারে আমি নিজেকে ঠিক বিশ্বাস করি না। প্রস্তাবটিতে না করার পেছনে এটাও একটা কারণ।'

'কেন, আমি কি সত্যি এতই বাজে? না কি বুদ্ধির দিক দিয়ে আপনার চেয়ে আমি এতই নিকৃষ্ট?'

'না, না, দয়া করে আমাকে ভুল ভুঝবেন না। আপনি খুবই ভাল। আপনার বুদ্ধিবৃত্তি নিয়েও আমার তিলমাত্র সন্দেহও নেই। কিন্তু, আমার মনে হয় যে আরও কিছুদিন আগে আমাদের দেখা হলে সব দিক দিয়ে ভাল হত।'

'কেন? আপনি কি কারও কাছে বাগ্‌দান করেছেন?'

'আমার কথা নয়! আমি বলছিলাম আপনার কথা!'

'কি বলতে চাইছেন বলুন তো?'

'আপনি বিবাহিতা নন?'

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল। শেষে বলল, 'এসব কি বলছেন আপনি? বিয়েটিয়ের বন্ধন টন্ধন নিয়ে কে আর এখন মাথা ঘামায়? কিছুকাল আগে ঐসব বাতিল হয়ে যাওয়া সংস্কারগুলো আবার একটু মাথাচাড়া দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু মুক্ত জীবনের দিনগুলো আবার ফিরে এসেছে...।'

'এ ব্যাপারে আমাদের ভাবনাচিন্তায় অমিল রয়েছে বলে আমি দুঃখিত। আপনি আমাকে বলতে পারেন যে মান্ধাতার আমলের এসব ধারণা অসহ্য কিন্তু আমি এখনও বিবাহবন্ধনের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী।' যুবকের কণ্ঠস্বরে একটু বেদনার আভাস।

মেয়েটি বলল, 'দয়া করে অমন বিচলিত হবেন না। কে আপনাকে বলেছে যে আমার বিয়ে হয়ে গেছে?' 'তাহলে আপনারা, মানে যাকে বলে, সহবাস করছেন?'

'সহবাস! কার সঙ্গে?'

'আপনার বাড়িতে যে পুরুষটি রয়েছে তার সঙ্গে। আপনি, এমনকি তাঁর সঙ্গে আমাকে আলাপও করিয়ে দেননি।'

'ও, আপনি তার কথা বলছেন? কিন্তু কি করেই বা ওর কথা বলব আপনাকে?'

'বলতে আপনি আদপেও বাধ্য নন। ইচ্ছে না হলে বলবেন না।'

'শুনুন তাহলে। আপনার পাঁচ মিনিট সময় আমি নেব।'

যুবকটি চুপ করে থাকল।

মেয়েটি বলতে শুরু করে, 'দেখুন, আমাকে দেখতে ভাল। আমি একটা ভাল চাকরি করি। এইসব কারণে অনেক পুরুষই আমার ক্ষেত্রে অন্যায় সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছে। প্রথমদিকে আমার খোলামেলা ব্যবহারকে কাজে লাগাতেও তারা চেষ্টা করেছিল। এই কারণেই আমাদের কারখানা থেকে আমি একটি রোবট নিয়ে আসি বাড়িতে এবং লোকেও ভাবতে শুরু করে যে ও হল আমার স্বামী। এমনকি আমার নিজের কোম্পানিতেও সামান্য কয়েকজনই জানে যে ও হল নিছকই একটা রোবট। দেখলাম যে ওকে বাড়িতে নিয়ে আসার পর থেকে পুরুষদের ঝামেলা অনেকটাই কমে গেল। আমিও শান্তিপূর্ণ, সুখী জীবন কাটাতে লাগলাম। এর মধ্যেই কৃত্রিম বুদ্ধি বিষয়ক একটি আলোচনাসভায় আপনাকে আমি দেখেছিলাম। এর আগেও আপনার কথা আমি শুনেছিলাম কিন্তু সেই আলোচনাসভাতেই আপনাকে

আমি প্রথম চাক্ষুষ দেখি। আপনার গবেষণাপত্রটি সত্যিই আমার শ্রদ্ধা কেড়ে নিয়েছিল। দুপুরে, খাওয়া দাওয়ার সময় আমি আপনার আশেপাশেই ছিলাম কিন্তু নিজের প্রতিবেদন নিয়ে লোকের সঙ্গে আলোচনায় আপনি এতই মগ্ন ছিলেন যে আমাকে আপনার চোখেও পড়েনি। পরে আপনার ঠিকানা যোগাড় করে আপনার পাশের বাড়িতে আমি উঠে আসি। এমনকি এর পরেও কখনও মনে হয়নি যে আমি আপনার নজরে পড়েছি। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখলাম যে আপনি আমার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিচ্ছেন। তখন ভাবলাম যে আপনাকে যতটা রসকষহীন ভেবেছিলাম আপনি ততটা নন।

যুবকটি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি সত্যিই যারপরনাই দুঃখিত।'

এর পরে কি ঘটেছিল তা সহজেই অনুমেয়। একটা ছেলেমানুষী ভুল বোঝাবুঝির জন্য যে সময় নষ্ট হয়েছিল সেই সময়ের অভাব যে তারা কিভাবে মিটিয়েছিল সে বিষয়ে আপনাদের কিছু বলার দরকার বোধহয় নেই। যাইহোক কিছুক্ষণ পরে তারা সংবিৎ ফিরে পেয়েছিল এবং সেইদিন মেয়েটি আর তার নিজের বাড়িতে ফেরেনি।

এরপর, তারা বিয়ে করে। বিয়ে না হলেও সন্তানলাভ করা নিয়ে আজকাল কেউই বিশেষ মাথা ঘামায় না কিন্তু প্রথমে বিয়ের কাজটি সাঙ্গ করার জন্য যুবকটি পীড়াপীড়ি করেছিল। বিয়ের পরেই তারা মধুচন্দ্রিকা কাটাতে যায়। এবং বিয়ের আগে মেয়েটি তার রোবটটিকেও কোম্পানিতে ফেরত পাঠায়। কিছুদিনের মধ্যেই মেয়েটিকে প্রসূতি সদনে ভর্তি হতে হয়। যুবকটি তখন আমাদের কয়েকজনকে এই হাতে গোনা কয়েকটা 'স্বাধীন' দিন উপভোগ করার উপলক্ষে একদিন বাড়িতে নেমন্তন্ন করে। অন্যান্য অতিথিরা তখন সকলেই বিদায় নিয়েছে। আমি আর সে শুধু ছিলাম। তার পুরো গল্পটা আমি শুনলাম। এবং তাকে বললাম যে সত্যিই সে ভাগ্যবান বলে অমন চমৎকার একটি স্ত্রী পেয়েছে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হল যে কি একটা সন্দেহ যেন তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি এত ভাবছিস তুই?'

'বন্ধু, কি করে তোকে বলব ভেবে পাচ্ছি না। কেবল একজন ব্যক্তিই আমার সন্দেহের অবসান ঘটাতে পারে। সে আমার স্ত্রী কিন্তু এই সন্দেহের কথা তাকে আমি বলতে পারব না। রোবটটিকে আমিই ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তার কাছ থেকেই উত্তরটি আমি পেতে পারতাম। আমি নিশ্চিত যে সে আমাকে সঠিক

উত্তরই দিত কিন্তু সেটা গ্রহণ করার ক্ষমতা আমার ছিল কিনা জানি না। ভেবে দেখলাম যে গোটা ব্যাপারটাই ভুলে যাওয়াই সবচেয়ে ভাল। তোকে কি করে যে বোঝাব—এই সন্দেহটা আমাকে একেবারে তিলে তিলে দগ্ধ করছে!' কথা সে শেষ করল। চোখে কেমন ফাঁকা ফাঁকা ভাব।

আমি বললাম, 'তুই যা বললি তার বিন্দুবিসর্গও আমার মাথায় ঢুকলনা। আর একটু স্পষ্ট করে বল্ না?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, 'কি করে বোঝাব তোকে জানিনা।'

'তোকে একটা কথা বলব, শুনবি? তোর মত অমন একটা সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও ধনী স্ত্রী থাকলে আমি রূপকথার মতই সুখে বেঁচে থাকতাম। লোকে ভাবত এর জীবনে নতুন একটা গতি এসেছে...'

'বুঝলাম! কিন্তু ঐ রোবটের সঙ্গে তোর স্ত্রী-র কোনোরকম একটা সম্পর্ক নিয়ে তোর মধ্যে যদি সন্দেহটা আঁকড়ে থাকত তাহলে তুই মুখ থুবড়ে পড়তিস!'

'দূর বুদ্ধু! সেরকম কিছু যদি থেকেও থাকে তাহলেও তোর কি এসে যায়? রোবটটা তো বিদায় নিয়েছে। ধর, ও যদি সত্যি একটা লোক হত? যাইহোক, তোর এই সন্দেহ একেবারেই ভিত্তিহীন। আমার কথা শোন—এই মার্কামারা পুরুষালী ঈর্ষা কাটিয়ে ওঠ। তারপর সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে দুজনে একসঙ্গে থাক। একটা কথা মনে রাখিস। সন্দেহ এমন একটা বস্তু যার সবচেয়ে যা ভাল তাকেও ধ্বংস করার ক্ষমতা রয়েছে। সন্দেহকে মনে বাসা বাঁধতে দিস না।' বেশ জোরের সঙ্গেই কথাটা বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম। মনে হয়েছিল যে এরকম একটা সন্দেহ মনের মনে পুষে খুবই বোকামি সে করছে। এই ঘটনার পরে অনেকগুলি বছর কেটে গেছে।

তাদের বিবাহিত জীবন বড়ই চমৎকার কাটছে। তাকে দেখলে মনে হয় সত্যিই এক সুখী মানুষ। তাদের সন্তানরাও অনেক বড় হয়েছে। আজ বোধহয় সাহস করে এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব যে তার সন্দেহর কথা তার স্ত্রীর কাছে কখনও সে প্রকাশ করেনি।

রুবী

অরুণ মাণ্ডে

রোগীটি চলে যাওয়ার পর তার বিষয়ে যা যা আমার চোখে পড়েছে সেগুলো লিখে রাখছিলাম। এমন সময় শুনলাম ঘরের দরজা খোলার শব্দ। ভাবলাম যে রুবী এবার পরবর্তী রোগীর নাম বলবে। ওর দিকে না তাকিয়েই বললাম, 'ঠিক আছে রুবী! পরের রোগীকে পাঠিয়ে দাও।'

তারপর আবার নিজের লেখায় মন চলে গিয়েছিল। কিন্তু রুবীর দরজা খোলার প্রত্যাশিত শব্দটি না শোনায় মুখ তুলে দেখলাম যে রুবী যায়নি, তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার রুবী, রোগী পাঠাবে না?' রুবী বলল, 'ডাক্তারবাবু, বাইরে আর কোনো রোগী নেই। আপনার আজকের মত রোগী দেখা শেষ।'

হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। প্রায় রাত দশটা। ডায়রি বন্ধ করে বললাম, 'ঠিক আছে রুবী। এবার তাহলে তুমি সবকিছু গুছিয়ে নাও। আমি বাড়ি যাব।' অবাক হয়ে দেখলাম যে রুবী যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল। মনে হল কিছু একটা নির্ঘাত ঘটে থাকবে।

'কি ব্যাপার, তুমি কি আমাকে কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু।'

'তাহলে এসে বসো। ধীরে সুস্থে বসো। তোমার কাজ শেষ। আরাম করে বসে বলো কি ব্যাপার..'

রুবী খুব ধীরে আমার মুখোমুখি চেয়ারে বসল। তারপর চোখ নামিয়ে বলল, 'ডাক্তারবাবু, আপনাকে আমি যা বলব তা একান্তই ব্যক্তিগত এবং অবশ্যই এটা আপনাকে গোপন রাখতে হবে।'

আমি হেসে বললাম, 'রুবী, এখানে যে রোগীরা আসে তুমি ঠিক তাদের মত কথা বলছ। কিন্তু তুমি তো রোগী নও। তুমি হলে আমার সেক্রেটারি এবং তুমি ভালভাবেই জানো যে এই ঘরের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তা সবসময়েই গোপন

থাকে। তাছাড়া চিকিৎসকদের নৈতিক বাধ্যবাধকতাও তোমার জানা আছে কাজেই তোমার আমার মধ্যে যে কথা হবে তা সে অবশ্যই গোপন থাকবে সে বিষয়ে আমার তোমাকে আশ্বস্ত করার কিছু নেই। এবারে বলে ফেলো দেখি কি ব্যাপার।'

শান্ত কণ্ঠে রুবী বলল, 'ডাক্তারবাবু, আমি আপনাকে ভালবাসি।'

পেশাগত কারণে রোগীদের কাছ থেকে জগতের বহু সাঙ্ঘাতিক গোপন তথ্য ঠাণ্ডা মাথায় শুনে আমি অভ্যস্ত। কিন্তু এরকমভাবে কোনো কথাই আমাকে হতবাক করে দেয়নি।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কি বলছ তুমি নিজে জানো?'

রুবী বলল, 'আমি বুঝেই বলেছি, ডাক্তারবাবু।'

'তুমি হলে একটা রোবট। সেটা জাননা তুমি?'

'জানি, অবশ্যই জানি।'

রুবী জানে যে সে রোবট। অথচ তারপরেও সে আমাকে ভালবাসে!

'রুবী, শোনো। আমার একজন বন্ধু আছে, সে হল রোবট মনোবিদ। তার সঙ্গে কালকে আমরা দেখা করব। সকালে সেটাই হবে আমাদের প্রথম কাজ। হয়তো এখনও সে তার চিকিৎসা কেন্দ্রে রয়েছে। ওর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে কথা বলে নিই, 'বলে হাত বাড়িয়ে ভিসিফোনের রিসিভার ওঠাতে গেলাম।

রুবী তাড়াতাড়ি উঠে টেবিলের ওপর ঝুঁকে আমার হাতটা চেপে ধরল। আমি জানতাম যে রোবটের দেহের তাপমাত্রা মানুষের স্বাভাবিক তাপমাত্রাতেই বাঁধা থাকে। রুবীর হাত কিন্তু মনে হল খুব উষ্ণ। রোবট স্পর্শ করলে কেমন লাগে সে বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। ব্যাপারটা নিয়ে কখনও আমি ভাবিইনি। বা হয়তো আমার ধারণা ছিল যে রোবটের স্পর্শ হবে শুষ্ক, যান্ত্রিক, অমানুষিক ও অনান্তরিক। রুবীর ছোঁয়া কিন্তু নরম, মানুষেরই মত। তার 'মনে' যে অনুভূতিগুলো ছিল তাই যেন তার স্পর্শের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। রুবী তৎক্ষণাৎ হাতটি সরিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি দুঃখিত! যা করেছি তা আমার কক্ষনো করা উচিত হয়নি কিন্তু দয়া করে আপনার বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন না।'

আমি জানতে চাইলাম, 'কিন্তু কেন?'

রুবী বলল, 'আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ভালবাসা কি কোনো মানসিক অসুখ?'

'অবশ্যই নয়। ভালবাসা খুব স্বাভাবিক এক অতুলনীয় অনুভূতি।'

রুবী প্রশ্ন করল, 'কাউকে ভালবেসে ফেলা কি অস্বাভাবিকতার লক্ষণ?'

জবাব দিলাম, 'মোটেই না।'

'তাই যদি হয় তাহলে আমাকে কেন রোবট মনোবিদের কাছে পাঠাতে চাইছেন?'

ঝটিতি উত্তর দিলাম, 'তার কারণ তুমি রোবট

রুবী প্রশ্ন করল, 'রোবটের কি ভালবাসার অধিকার নেই?'

'কিন্তু রুবী, আসলে ব্যাপারটা অধিকারসংক্রান্ত নয়। প্রশ্নটা হল কর্তব্যর সঙ্গে জড়িত।'

'কি ভাবে?'

'দেখো, রোবট কোম্পানির মাধ্যমে আমার সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করার জন্য আমি তোমাকে ভাড়া করেছি যার জন্যে আমাকে প্রভূত অর্থ ভাড়া হিসেবে গুনতে হয়। পরিবর্তে আমি আশা করব যে আমার সব কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করবে। কারো সঙ্গে প্রেম করার জন্য তোমাকে আমি এখানে আনিনি।' আমার কণ্ঠস্বরে কিছু উষ্মার আভাস ছিল।

'ডাক্তারবাবু, আমার জায়গায় যদি একটা মেয়ে থাকত আর সে যদি কাউকে ভালবাসত তাহলে কি হত?'

'সে যদি কাউকে ভালবাসত তাহলে সেটা হত তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি যদি দেখতাম যে আমার কাজের কোনোরকম ক্ষতি হচ্ছে তবেই আমি সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতাম। কোনো কারণেই কাজের ক্ষতি হতে দেওয়া চলতে পারে না।'

'ডাক্তারবাবু, গত একবছর ধরে আমি আপনাকে ভালবেসে এসেছি। তার জন্য এখানে আমার কাজের কি কোনো ক্ষতি হয়েছে? কখনও কি আমার সম্বন্ধে অভিযোগ করার কোনো কারণ ঘটেছে?'

'দেখ রুবী, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনা। আমার যা বলার আছে তুমি শুনে নাও...'

ঠিক এই সময়ে ভিসিফোনের ঘন্টি বেজে উঠল। বোতাম টিপতেই ছোট্ট পর্দায় ভেসে উঠল হেমার মুখ।

'কি খবর অনিল!'

'আরে হেমা। কবে ফিরলে শিকাগো থেকে?' উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলল, 'এইমাত্র! বিমানবন্দর থেকেই তোমাকে বলছি। এখানে নেমে প্রথমেই তোমার কথা মনে হল। এত রাতে তোমাকে ওখানে পাব আশা করিনি...এই! আমার জন্যে তোমার মন কেমন করেছিল?'

'করেনি আবার! এবার বলো দেখি, কতদিন এবার তুমি ভারতে থাকছ?'

'আমি তো বরাবরের জন্যেই চলে এসেছি। ঠিক করেছি পাকাপাকিভাবে দেশেই থাকব।'

'তবে তো কথাই নেই। শুনে সত্যিই এত আনন্দ হচ্ছে। যাইহোক, আমাদের

দেখা হচ্ছে কখন?'

'হেমা হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি চাইলে আমি এক্ষুনি চলে আসতে পারি।'

'জানো এখন কত রাত? এখন সাড়ে দশটা বাজে।'

'আমার কোনো অসুবিধাই নেই। সারাটা রাত বেশ একসঙ্গে কাটানো যেত!'

'থাক, ঢের ইয়ার্কি হয়েছে। শনিবার সন্ধেবেলায় আমি খালি আছি। রাতে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করা যেতে পারে।'

'কোথায়?'

'আমরা যেখানে যাই, ঐ রোস্তোরাঁতেই।'

'তাহলে ঠিক আছে। ঐ কথাই থাকল। আচ্ছা অনিল, তোমার সঙ্গে বসে আছে ঐ সুন্দরী মহিলা কে?'

'ও হল আমার রোবট—রুবী।'

'তাই! ঠিক আছে অনিল। দেখা হচ্ছে তাহলে।' হেমার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পর্দা থেকে তার মুখটা মুছে গেল।

রুবী জানতে চাইল, 'হেমা কে?'

'আমরা সহপাঠী ছিলাম। ডাক্তারি পাশ করে বৃদ্ধাবস্থার চিকিৎসা সম্বন্ধে এম.ডি. করার জন্য হেমা শিকাগোতে যায়।'

রুবী প্রশ্ন করল, 'আপনি কি হেমাকে ভালবাসেন, ডাক্তারবাবু?'

'রুবী, এবারে এসব কথা ছাড়ো তো। মনে হয় আজকাল তুমি দেদারে হিন্দি ফিল্মগুলো দেখছ। প্রেমভালবাসা বাদে দুনিয়াতে কি আর কিছু নেই? হেমা আমার এক নিকট বন্ধু। ওকে আমার খুবই ভাল লাগে, কিন্তু ঐ ভালবাসা...সে আমি ঠিক জানি না।'

'দেখে কিন্তু মনে হয় হেমা আপনাকে ভালবাসে।'

আমি হেসে ফেলে বললাম, 'তোমার দেখার চোখটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। চারদিকে তুমি স্রেফ প্রেম আর ভালবাসাই দেখছ। এটা তোমার পক্ষে কিন্তু ভাল নয়।'

'কেন ডাক্তারবাবু? এই না আপনি বললেন যে প্রেম হচ্ছে একটা অতুলনীয় অনুভূতি।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই! তবে সেটা আমাদের জন্যে। তোমার জন্যে নয়। তোমার ভোলা উচিত নয় যে তুমি রোবট।'

'রোবটের কি কোনো অনুভূতি থাকে না?'

'না থাকে না এবং আমার মতে থাকাও উচিত নয়।'

'রোবট হলে আপনিও জানতে পারতেন যে আমাদেরও আবেগ অনুভূতি রয়েছে।'

'এক একসময় আমার মনে হয় যে মনোবিদ হওয়াটা আমার উচিত হয়নি।'

রুবী প্রশ্ন করল, 'একথা কেন বলছেন ডাক্তারবাবু?'

'রুবী, গত দুশো বছরে মানুষ বিশাল অগ্রগতি অর্জন করেছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অসামান্য একের পর এক আবিষ্কার হয়েছে। নতুন নতুন বিষয় নিয়ে চলছে গবেষণা। আমাদের এই চিকিৎসা ক্ষেত্রেও কি দারুন অগ্রগতি ঘটেছে। জিন ইঞ্জিনিয়ারিং -এর সহায়তায় বংশগত ব্যাধিগুলির চিকিৎসাই শুধু সম্ভব হয়নি, ক্যানসার বা এইডস-এর মত মারাত্মক অসুখও সারানো আজ সম্ভবপর। মানুষের গড় আয়ুষ্কাল বেড়ে প্রায় আশি বছরে দাঁড়িয়েছে। আমার বন্ধু, ঐ হেমা—এমন একটা ব্যাপারে কাজ করছে যার সাহায্যে বার্ধক্যের প্রক্রিয়াটিকে থামানো সম্ভব হতে পারে। তোমাদের ঐ রোবটবিজ্ঞানের কথাই ধরোনা—দুশো বছরের আগের রোবট আর আজকের রোবটের মধ্যে কি আশমান-জমিন ফারাক নেই? তুমি মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সবই পেয়েছ। কিন্তু রুবী, তুমি কখনোই পুরোদস্তুর মানুষ হতে পারবে না।'

রুবীর প্রশ্ন, 'কিন্তু কেন?'

আমি বললাম, 'তার কারণ হল তোমার মানুষের মত একটা মন নেই। এবং নেই যে সেটা তোমার পক্ষে ভাল।'

'মন কিরকম হয়?'

'এখন অবধি কেউ সেটা ব্যাখ্যা করে বলতে পারেনি। ব্যাপারটা অসম্ভব কঠিন। খুবই জটিল একটা কাণ্ড। তোমার মাথায় যে কৃত্রিম ইতিবাচক মস্তিষ্কটি বসানো রয়েছে তার থেকেও অনেক বেশি জটিল হল মানুষের মস্তিষ্ক। একটা কথা তোমাকে বলি রুবী—বৈষয়িক ক্ষেত্রে মানুষ অনেক উন্নতি করলেও তার মন এখনও প্রাক-ইতিহাসের মানুষ বা জন্তুর স্তরেই রয়ে গেছে। জানবে যে প্রেমই কিন্তু মানুষের মনের একমাত্র ভাবানুভূতি নয়। মনের মধ্যে প্রেমের মতই অন্য সব ভাবানুভূতি যেমন মমতা, দয়া, শান্তি, ক্রোধ, হিংসা, ঈর্ষা ও অনিশ্চয়তাও বাস করে। এক একসময় মানুষের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সমস্ত মেকি ভড়ং খসে পড়ে। তখন সেই প্রাক-ইতিহাসের বন্য, হিংস্র, আসল চেহারাটা নগ্ন হয়ে বেরিয়ে আসে। তখন মনে হয় যে মানুষের আদপে কোনো পরিবর্তনই হয়নি। এবং এরকম ঘটনা যখন ঘটে তখন ভাবতে মন চায় যে এর চেয়ে বরং রোবট হওয়াই বোধহয় ভাল।'

'আচ্ছা মনের মধ্যে কেবল শুভ ভাবানুভূতিগুলিই কি বিরাজ করতে পারে না?'

'ব্যাপারটা যদি অতই সহজ হত তাহলে চারদিকে ব্যাঙের ছাতার মত মনোরোগ

চিকিৎসার যে কেন্দ্রগুলি গজিয়ে উঠেছে তার দরকারই পড়ত না। সারা দুনিয়ার সাধুসন্তরা যে কথাগুলো বলে এসেছেন একবার মনে করো—তাঁরা বলেছেন 'সদা সত্য বলিবে। অপরের দ্রব্য চুরি করিবে না। হত্যা করিবে না। সর্বদা অপরকে সাহায্য করিবে।' এই কথাগুলিই তাঁরা শিখিয়ে এসেছেন। মানুষকে তাঁদের এগুলো শেখাতে হয়েছিল কারণ নিজের থেকে কেউই এগুলো মেনে চলত না। এমন কি আজকেও যদি কোনো মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন তাহলে তাঁকেও লোককে ঐ কথাগুলোই শেখাতে হবে কারণ মানুষ পাল্টায়নি। আরো হাজার বছরেও মানুষ পাল্টাবেনা?'

রুবী কাতরকণ্ঠে বলল, 'কিন্তু আমি পাল্টাতে চাই, আমি মানুষ হতে চাই।'

'থাক রুবী, যথেষ্ট বোকামি হয়েছে। কালকে সকালেই তোমাকে একবার পরীক্ষা করার জন্য আমি রোবট কোম্পানিতে পাঠাব।'

'কিন্তু, ডাক্তারবাবু...'

'কোনো কিন্তু-টিন্তু নয়। এ হল আমার আদেশ। রোবটকে মানুষের কথা শুনতে হবে—এটা হল আসিমভের প্রথম সূত্র—ভুলে গেছ নাকি?' কথাগুলো বেশ কড়াভাবেই আমি বললাম।

ধীরে ধীরে রুবী উঠে দাঁড়ালো। তারপর মেঝের দিকে দৃষ্টি রেখে বলল, 'ঠিক আছে, ডাক্তারবাবু।' আমার দিকে একবারও না তাকিয়ে সে পেছন ফিরে ঘর থেকে হন হন করে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন কোম্পানি রুবীর জায়গায় অন্য একটি রোবটকে পাঠাল। তার কাজে সেই মেয়ে রোবটটি যথেষ্ট দক্ষ হলেও সেক্রেটারি হিসেবে সে রুবীর ধারে কাছেও আসেনা। তার কাজের ধরনটা বড়ই যান্ত্রিক ও যতটুকু করা দরকার তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রুবীর বন্ধুর মত উষ্ণ ব্যবহারের জন্য আমার রোগীদের ও তাদের জন্য পাশের ঘরে যারা অপেক্ষা করে সেই আত্মীস্বজনদের কাছে সে একান্ত আপনজন হয়ে উঠেছিল। রুবীর অনুপস্থিতিই ব্যাপারটা আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। আমার প্রত্যেক নিয়মিত রোগীই তার খোঁজখবর নিচ্ছিল। রুবীর না থাকার ফলে আমার কাজের গতিও খুবই ঢিলে হয়ে গেল। সঠিক সময়ে রোগীর রক্তচাপ পরীক্ষা করা, ই.ই.জি. সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া, রোগীদের ইঞ্জেকশন দেওয়া, যন্ত্রের মাধ্যমে সঠিক নক্সার ছবি ফেলা—এইসব ও আরও বহু কাজ রুবী নিজেই সেরে নিত। নিজের কাজে সে ছিল নিখুঁত। আর এই নতুন রোবটকে প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি ব্যাপার আমাকে বুঝিয়ে বলে দিতে হচ্ছিল। রোগীদের ব্যাপারে পর্যাপ্ত মনোনিবেশ আমি করতে পারছিলাম না। কোনোমতে তো সকালের রোগী দেখা শেষ করলাম। এরমধ্যে অবশ্য কয়েকজনকে আমি দিন তিনচার পরে আসতে

বলে দিয়েছিলাম।

সকালের কর্মভার ঘাড় থেকে নামিয়ে আমার প্রথম কাজই ছিল রোবট কোম্পানির সঙ্গে কথা বলা। সেখানকার ম্যানেজার রাঘব ছিল, আমার বিশেষ বন্ধু। ভিসিফোনের পর্দায় তার মুখ ফুটে উঠতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বলোতো ভায়া রুবীর কি হয়েছে?'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রাঘব বলল, 'রুবী! রুবী আবার কে?'

'ওহো...রুবী মানে হচ্ছে রোবট-16। ওকে আমি রুবী নামেই ডাকি।'

রাঘব বলল, 'ওর বিষয়ে প্রতিবেদনটিই এখন পড়ছিলাম।'

'ওর কি গণ্ডগোল হয়েছে বলো তো?'

'একটা দুটো ব্যাপার বাদ দিলে মেয়ে রোবটটির তো কোনো সমস্যাই নেই। ওর কৃত্রিম ইতিবাচক মস্তিষ্কটিও চমৎকার কাজ করছে।'

'ঐ একটা দুটো ব্যাপারগুলো কি?'

'কয়েকটা ব্যাপার সত্যিই এমনই চিত্তাকর্ষক। আচ্ছা অনিল, তুমি কি জানো যে রোবট কি ভাবে তৈরি হয়?' রাঘব প্রশ্ন করল।

'আমি তো আর তোমার মত রোবট-বিশারদ নই। কি করে জানবো? তুমিই বলতে পার। ব্যাপারটা একটু খোলসা করে আমাকে বুঝিয়ে দেবে?'

'রোবটের দেহযন্ত্রের দুটি মূল অংশ—প্রথমটি হল তার দেহ এবং দ্বিতীয়টি হল তার মস্তিষ্ক। সত্যি বলতে আমরা পুরুষ ও মহিলা রোবটের মধ্যে আজকাল পার্থক্য করি। একশো বছর আগেও এই বিভাজনের কোনো দরকার ছিল না কারণ একমাত্র মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রেই রোবট ব্যবহৃত হত। এরপর চিকিৎসা ক্ষেত্রে নার্স ও খনির শ্রমিক হিসেবে রোবটের ব্যবহার চালু হয়। তখনকার রোবট কিন্তু এত স্বাভাবিক ধরণের ছিল না। মোটের ওপর এই সময় থেকেই পুরুষ ও মহিলা রোবটের মধ্যে পার্থক্য করাটা শুরু হয়। আজকাল তো আমরা ওদের রোবটই বলি না। আমরা ওদের বলি অ্যান্ড্রোয়েড অর্থাৎ নরসদৃশ। আর রোবট প্রসাধনবিজ্ঞান এসে যাওয়ার ফলে তো আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন কোনো রোবট দুর্ঘটনায় আহত হলে তার রক্তও ঝরে। মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্যের ব্যাপারটি এতটাই এগিয়েছে। আজকাল তো যেসব মেয়ে রোবট রিসেপসনিষ্ট বা সেক্রেটারির কাজ করে তারা তো বিউটি পার্লারেও যায়।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'রুবীর মধ্যে কি কোনো গণ্ডগোল ঘটেছে?' রোবটের ইতিহাস অতীব আকর্ষণীয় বটে কিন্তু তখন আমার শোনার মত মনের অবস্থা ছিল না। হেমা-র সঙ্গে দেখা করার জন্যে তখন আমি ছটফট করছিলাম।

রাঘব বলল, 'রুবী তো পুরোপরি ঠিকই রয়েছে।' আমি ফের বললাম, ' ওর মস্তিষ্কে কি কোনো কিছু গড়বড় হয়েছে?'

'রোবটের মস্তিষ্ক! রোবট-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এ হল এক দিক্‌চিহ্ন। বুঝতেই পারলাম যে রাঘব এখন কথা বলার মেজাজে রয়েছে এবং ধৈর্য ধরে তার কথা শোনা ছাড়া আমারও উপায় ছিল না।

'পজিট্রনিক্‌সের নীতি অনুযায়ী রোবটের মস্তিষ্ক কাজ করে। এর মস্তিষ্কে রয়েছে সংখ্যাতীত বর্তনী যা একমাত্র আমাদের মস্তিষ্কের সঙ্গেই তুলনীয়। জীবনের যে ক্ষেত্রে তাকে দিয়ে কাজ করানো হবে সে বিষয়ে সর্ববিধ প্রয়োজনীয় তথ্য রোবটের মস্তিষ্কে সন্নিবেশিত থাকে। সামাজিক ব্যবহার বিধি সম্বন্ধে একটি অভিমুখিনতাও ঐ মস্তিষ্কের মধ্যে জারিত করে দেওয়া হয়। চলাফেরা, অভিব্যক্তি ও জোরে ও আস্তে কথা বলার বিষয়েও প্রয়োজনীয় নির্দেশ রোবট মস্তিষ্ককে দিয়ে দেওয়া হয়। কমপিউটারের মতই তাদের সমাধানে পৌঁছনো, সিদ্ধান্ত নেওয়া ও নতুন কায়দায় রপ্ত হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে।'

'তাই যদি হয় তাহলে মানুষের মস্তিষ্ক ও রোবটের মস্তিষ্কের মধ্যে আর তফাৎ কি থাকল?'

'ভাল প্রশ্নটি করেছ তো!' রাঘবের কণ্ঠে প্রবল উৎসাহের সুর দেখে আমার বদ্ধমূল সন্দেহ হল যে নির্ঘাৎ সে আন্তঃগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে কোনো সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং তারই পরীক্ষায় আমাকে ব্যবহার করছে। রোবটের মস্তিষ্ক ও আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে অনেক প্রভেদ রয়েছে। ওদের কৃত্রিম ইতিবাচক মস্তিষ্ক কেবল পূর্ব পরিকল্পিত নির্দেশনামার ভিত্তিতে কাজ করতে পারে। আসিমভের তিনটি সূত্র লঙ্ঘন করার ক্ষমতা রোবট মস্তিষ্কের নেই। আমাদের মস্তিষ্কের প্রধান গুণ বা দোষ যাই বলো হল অনিশ্চয়তা, সে কি করবে তা আগাম নির্ধারণ করা যায় না। প্রদত্ত পরিস্থিতিতে জনৈক মানুষ কিভাবে ব্যবহার করবে তা আগে থেকে কেউ জানতে পারে না। একই ঘটনায় বিভিন্ন মানুষের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ধরণের হয়। কখনও আবার দেখা যায় যে কোনো মানুষ যদি দ্বিতীয়বার একই সমস্যার সম্মুখীন হয় তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে সে তার মোকাবিলা করার চেষ্টা করে। এর প্রধান কারণ হল আমাদের মস্তিষ্কের বর্তনীগুলি অনেক বেশি নমনীয়, কৃত্রিম মস্তিষ্কের বর্তনীর সীমাবদ্ধতা এখানে নেই। আমাদের মস্তিষ্কের বর্তনীগুলি খোলা, স্বাধীন এবং সেই কারণেই আমাদের জানার ও সৃজনশীলতার ক্ষমতা অপরিসীম।'

রাঘবকে আমার রাস্তায় নিয়ে আসার জন্যে বললাম আবার, 'রুবীর সমস্যা নিয়ে কিছু বলো দেখি এবার।'

রাঘব বলল, 'হ্যাঁ, রুবীর ব্যাপারটা একটু ঝামেলারই বটে। আমি ওর প্রত্যেকটা বর্তনী কমপিউটার দিয়ে পরীক্ষা করেছি। মোটের ওপর গণ্ডগোল কিছু নেই। তবে বিস্ময়কর একটা পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করেছি..'

'কি ধরণের পরিবর্তন?'

'রুবীর মস্তিষ্কে কয়েকটি নতুন বর্তনী তৈরি হয়েছে। ওর মস্তিষ্কের মূল পরিকল্পনার সঙ্গে দশবার আমি মিলিয়ে দেখেছি। মূল পরিকল্পনাতে ঐ বর্তনীগুলো ছিল না। সেটা আমি হলফ করে বলতে পারি। এবং সবচেয়ে যেটা বিস্ময়কর সেটা হল এই বর্তনীগুলো খোলা।'

আমার সবকিছু কেমন গুলিয়ে যায়, 'এর অর্থ কি?'

'এর অর্থ হল রুবীর ব্যবহার আংশিকভাবে অভাবনীয় ধরনের হতে পারে।'

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ও কি আমাকে আক্রমণও করতে পারে নাকি?'

'অনিল, তুমি একজন অসামান্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বটে কিন্তু এখনও তোমার মনের কোনো গহন কোণের মধ্যে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের ভয়টা সুপ্ত হয়ে রয়েছে। রোবটটিকে নিয়ে ওরকম ভয়ের কোনো কারণই নেই। আসিমভের তিনটি সূত্র মেনে রোবটের মস্তিষ্ক কাজ করে। তার মধ্যে দ্বিতীয় সূত্রটি হল রোবট কখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষকে আঘাত হানতে পারবে না। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। রুবী তোমাকে আক্রমণ করতে পারে না। এমনকি এরকম কোনো সম্ভাবনার কথাও সে ভাবতে পারে না। সত্যি বলতে ওর ব্যাপারে তুমি যে লক্ষণগুলোর কথা বলেছ সেইগুলি ইতিবাচক পরিবর্তনেরই পরিচায়ক। এর পরেও অনিল তোমার যদি অসুবিধা থাকে তাহলে আমরা তোমাকে রুবীর বদলে অন্য কোনো রোবট দিতে পারি।'

'রুবীর বদলে বিকল্প হিসেবে তোমরা যে এস.এল.ওয়াই-1-কে পাঠিয়েছিলে তাকে আমার পছন্দ হয়নি। সবচেয়ে ভাল হয় তোমরা যদি রুবীর মধ্যে একটু রদবদল ঘটিয়ে ওকে আবার পাঠিয়ে দাও।'

রাঘব বলল, 'আমার মনে হয় অনিল সেটা সম্ভব নয়। কারণ রুবীর মস্তিষ্কে যে নতুন বর্তনীগুলির সৃষ্টি হয়েছে সেগুলিকে আমরা পর্যবেক্ষণ করতে চাই। কোনো কারণেই ওর মস্তিষ্কের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাটা যুক্তিযুক্ত হবে না।'

'এর অর্থ কি এই যে রুবী আর কখনও আমার কাছে ফিরে আসবে না?'

'না, ঠিক তা নয়! তবে তুমি যদি আমার কথা শোনো তাহলে আমি এই পরামর্শই দেব যে রুবীকে তুমি নিজের কাছেই রাখো। এতে আমাদের উভয়েরই স্বার্থসিদ্ধি হবে।'

প্রশ্ন করলাম, 'কিভাবে?'

'যদিও আমরা রুবীর বর্তনীগুলো দেখতে পারব কিন্তু প্রদত্ত কোনো পরিস্থিতিতে সে কিভাবে ব্যবহার করবে যেটা বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। সৌভাগ্যবশত তুমি নিজে একজন মনোবিদ। তুমি ওর ব্যবহারের ধাঁচটি লক্ষ্য করে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য লিখে রাখতে পারো।'

বললাম, 'কিন্তু আমি তো রোবট মনোবিদ নই।' রাঘবের গলায় রোবট মনোবিদদের প্রতি বিদ্রূপ ঝরে পড়ল, 'রোবট-মনোবিদ! কৃত্রিম ইতিবাচক বৈদ্যুতিক মস্তিষ্কের আচরণ ধারার নির্মাণ ও মেরামতি অবধি ওদের দৌড়। তার বাইরে তারা নেহাৎই শিশু এবং রুবীর ব্যাপারটি আমার মতে তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তুমি যদি বিশদভাবে রুবীকে নিরীক্ষণ করে চিত্তাকর্ষক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারো তাহলে হয়তো রোবট ও মানুষের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে যাবে। তুমি নিজেকে অমর করে তুলবে এবং এই ক্ষেত্রে একজন পথপ্রদর্শক বিজ্ঞানী বলে তোমার পরিচিতি হবে।'

প্রশ্ন করলাম, 'আমার সঠিকভাবে কি করা উচিত বলে তুমি মনে করো?'

রাঘব বলল, 'বিশেষ কিছুই না। স্রেফ ওকে পর্যবেক্ষণ করে যাও। ওকে জীবন্ত রূপ দেবার জন্য আমরা ওর চোখে কৃত্রিম অশ্রুমোচনকারী গ্রন্থি বসিয়ে দিয়েছিলাম যাতে ওর চোখদুটি সবসময় স্বাভাবিকভাবে অল্প ভিজে থাকে। আজকে পরীক্ষা করার সময় কি দেখলাম ভাবতে পারো? রুবীর কৃত্রিম অশ্রুমোচনকারী গ্রন্থিগুলো একেবারেই শুকনো।'

'তার অর্থ কি দাঁড়ায়?'

'এর থেকে বোঝা যায় যে রুবী হয়তো কেঁদেছে। এই কারণেই আমি বলেছিলাম যে ওকে লক্ষ্য করে যাও। হয়তো ছোটখাট কিছু পরিবর্তন তোমার নজর এড়াবেনা। আর যদি কোনো গুরুতর সমস্যা দেখা দেয় তখন আমাকে ফোন করলেই হবে। সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।'

আমি কিছু বলার আগেই পর্দা থেকে রাঘবের মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সহকারীকে ডাকার ঘণ্টার বোতামটা টিপলাম। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রুবী। আনন্দিত হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আরে রুবী! তুমি কখন এলে?'

রুবী বলল, 'আপনি যখন মি: রাঘবের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন। উনি কি বললেন আমার সম্বন্ধে?'

'উনি বললেন যে তোমার কোনো সমস্যাই নেই।' রুবী বলল, 'আমি কি আপনাকে বলিনি যে আমার কিছু হয়নি। এখান থেকে গিয়ে আমার খুব কষ্ট

হয়েছিল।'

নরম গলায় বললাম, 'তাই বুঝি কান্নাকাটি করেছিলে?'

রুবী জিজ্ঞেস করল, 'কে বলল এ কথা?' তার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত।

'কথাটা কি সত্য নয়?'

'হ্যাঁ', মাথা নিচু করল রুবী। 'আমি ভেবেছিলাম যে আর কখনও আপনার সঙ্গে দেখা হবে না।'

'এই তো দেখছ আমাকে। তাই না? আচ্ছা, এবার আমাকে বেরোতে হবে। ততক্ষণ তুমি বরং...'

'আপনি কি হেমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

রুবী প্রশ্ন করল, 'কিন্তু, এইভাবে?'

'কিভাবে?'

'এই পোশাকে আপনি হেমার সঙ্গে দেখা করবেন?'

'কেন, এ পোশাকে যেতে অসুবিধা কোথায়?'

'ডাক্তারবাবু, কখনও আপনি প্রেম করেছেন?'

'না, কিন্তু রুবী...'

রুবী মাথা নাড়িয়ে বলল, 'যে ঠিক আছে। এখন আমার সঙ্গে দয়া করে চলুন তো।'

'কোথায়?'

রুবী বলল, 'কথা না বলে উঠে পড়ুন তো!'

আমি বললাম, 'কিন্তু হেমা যে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।'

রুবী বলল, 'তার দেরি আছে। কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না। এক্ষুনি আপনি সেখানে পৌঁছে যাবেন।' রুবী চলতে শুরু করল। আমিও মনে কৌতূহল নিয়ে তার পিছু নিলাম। আমরা এলিভেটরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ করেই রুবী ট্যাক্সিকপ্টারের নম্বর ডায়াল করল। আমরা যখন ওপর তলায় গিয়ে পৌঁছলাম তখন ছাদে আমাদের জন্যে ট্যাক্সিকপ্টার অপেক্ষামান। আমরা তাতে উঠলাম। বৈমানিককে রুবী নির্দেশ দিল, 'আকবর আলীর দোকানে চলো।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের ট্যাক্সিকপ্টার আকবর আলীর দোকানের ছাদে অবতরণ করল। ক্রেডিট কার্ড-টা বের করব বলে পকেটে হাত দিয়েছি, রুবী আমাকে থামিয়ে দিল। নিজের ক্রেডিট কার্ড বের করে সে বৈমানিককে দেখাল। সে প্রয়োজনীয় সংখ্যাটি লিখে নিল। আমরাও ট্যাক্সিকপ্টার থেকে নেমে পড়লাম।

চলন্ত সিঁড়িতে করে আমরা নেমে এলাম। রুবী আমাকে নিয়ে গেল পুরুষদের বিভাগে। আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে দুজন রোবট এগিয়ে এল। তাদের মধ্যে একজন নম্রভাবে রুবীকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'মহাশয়া, আপনার জন্যে কি করতে পারি?'

রুবী আমাকে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, 'এঁর জন্য একটি তৈরি বিশুদ্ধ রেশমী কাপড়ের স্যুট চাই।'

দুজন রোবট চটপট এগিয়ে এসে আমার মাপজোপ নিতে লাগল। তৃতীয় একটি রোবট বলল, 'স্যুটটা কি রঙের হবে, মহাশয়া?'

'হালকা ঘিয়ে রঙের। নেক-টাই হবে আকাশী নীল, তাতে সাদা সুতোর কাজ থাকবে। ওটাও রেশমী কাপড়েরই হবে! আরও লাগবে প্লাটিনামের টাই-পিন এবং কালো জুতো।'

'আর কি লাগবে, মহাশয়া?'

'এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা। আসল ফুল যেন হয়। কৃত্রিম, গন্ধ মাখানো নয়।'

রোবট বলল, 'ঠিক আছে মহাশয়া।'

'আচ্ছা ডাক্তারবাবু, হেমা কি সুগন্ধী পছন্দ করে?'

'হেমা পছন্দ করে 'পয়জন', কিন্তু রুবী...'

'পয়জন,' রুবী রোবটকে নির্দেশ দিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক রোবট আমার স্যুট ও জুতো নিয়ে হাজির হল। দ্বিতীয় জন নিয়ে এল রজনীগন্ধার গুচ্ছ ও অন্যান্য জিনিস। আয়নায় যখন আমি নিজেকে দেখলাম তখন চিনতেই পারিনা। জামাকাপড় ও সাজগোজের ব্যাপারে আমি বেশ বেপরোয়া (এবং আমার বিশ্বাস যে আমার মত অন্য মনোরোগবিদেরাও একই রকম)। নতুন পোশাক পরে মনটা বেশ প্রফুল্ল লাগছিল।

রুবী আর নিজেকে সামলাতে না পেরে বলল, 'ডাক্তারবাবু, আপনাকে কিন্তু দারুণ দেখাচ্ছে!'

'ধন্যবাদ।'

আমার পোশাকে ঐ সুগন্ধি ভালভাবে লাগাতে লাগাতে রুবী বলল, 'আমি সবসময়েই আপনাকে এইরকম দেখতে চাই।' একহাতে সে আমার রজনীগন্ধার গুচ্ছ ও অন্যহাতে ছোট একটি মোড়ক ধরিয়ে দিল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা আবার কি?'

'এটা একটা শাড়ী, হেমার জন্যে।'

'কিন্তু কেন?'

'শাড়ী আর ফুল হচ্ছে হেমার জন্য। এবার দয়া করে তাড়াতাড়ি রওনা দিন।'

'দাঁড়াও! আগে তো এসবের দাম দিতে হবে।'

রুবী বলল, 'সে দায়িত্ব আমার। আমার ক্রেডিট কার্ড আছে।'

'তোমরা কি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে পার?'

'না, পারি না। আমারটা একটা বিশেষ ব্যবস্থা। এই সুবিধার জন্য আমি মি: রাঘবের কাছে ঋণী।'

'কিন্তু রুবী, তুমি এত কিছু করছ কেন?'

'আমি চাই যে হেমা আপনাকে ভালবাসুক।'

'কিন্তু রুবী, তুমি তো আমাকে ভালবাস, বাস না?'

'ভালবাসি তো।'

'এখন হেমা যদি সত্যিই আমাকে ভালবেসে ফেলে তাহলে কি হবে?'

'সেক্ষেত্রে আপনি তো সুখী হবেন। হবেন না?'

'হ্যাঁ!'

'তাহলে আমারও খুব আনন্দ হবে। আপনার সুখেই আমার সুখ।'

'কিন্তু রুবী, আমার মনে হয় যে আমি হেমাকে ভালবাসি।'

'ভালবাসুন। ডাক্তারবাবু, দয়া করে ভালবাসুন। ভালবাসা হল এই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ভাবানুভূতি। রোবট হোক বা মানুষ হোক, সকলেরই এর অভিজ্ঞতা হওয়াটা দরকার। এখন তাড়াতাড়ি যান দেখি। হেমা নিশ্চিত আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। ভাল হবে, আপনাদের ভাল হবে।'

নিউ ক্র্যাব হোটেলের বিশাল ছাদে যখন আমি নামলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। একশো তলা উঁচু বাড়িটার ছাদ থেকে গোটা বোম্বাই শহরটা দেখা যাচ্ছিল। নানা রঙের আলোর রোশনাইতে সাজানো মহানগরী। হালকা তরঙ্গমালায় আন্দোলিত সমুদ্র দেখে মনে হচ্ছিল যেন দুই নীহারিকার মধ্যে নিশীথ, অনন্ত মহাকাশ। সমুদ্রের থেকে আসা ঠাণ্ডা নোনা হাওয়ায় প্রাণমন ভরে উঠছিল।

গোটা ছাদটায় টেবিল ও চেয়ার ছড়ানো। তার মধ্যে সন্ধানী আলোর মত আমার চোখ হেমাকে খুঁজছিল। একটা কোণ থেকে হেমা আমাকে ডাকল, 'অনিল! এই যে আমি এখানে!' আমি তাকে দেখতে পেলাম। হাত নেড়ে আমাকে ডাকছে। রোবট পরিচারক ও পরিচারিকাদের পেরিয়ে আমি হেমার টেবিলের কাছে গেলাম।

ওর হাতে ফুলের গুচ্ছটি দিয়ে বললাম, 'হেমা, তোমারই জন্যে!'

হেমা ফুলগুলিতে চুমু খেল, বুক ভরে ফুলের সুগন্ধ নিল। তারপর আমাকে ভালভাবে দেখে নিয়ে বলল, 'অনিল, তুমি কত পাল্টে গেছ!'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'পাল্টানোটা কি ভাল না খারাপের দিকে?'

'অবশ্যই ভালর দিকে! সেই কলেজে কি অগোছালো পোশাকই না তুমি পরতে। তোমায় এখন এত ভাল দেখাচ্ছে। কি ব্যাপার কি? কারো সঙ্গে প্রেম করছ না অন্য কিছু?' হেমার চোখে উজ্জ্বলতা, কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন ঠাট্টার ভাব।

হেমার চোখের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে আমি বললাম, 'ঠিক তা নয়! তবে, তোমার মত কাউকে পেলে নিঃসন্দেহে খুবই আনন্দের সঙ্গে...'

হেমা মাথা নেড়ে তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের দুজনের আলাপ করাতে ভুলে গেছি। এ হল দিপ্ত। আমরা একসঙ্গে শিকাগোতে ছিলাম। আগামী মাসে আমরা বিয়ে করছি।'

আমি দিপ্তর দিকে তাকালাম। করমর্দন করার জন্য সে হাত বাড়িয়ে দিল। হেমাকে দেখতে পেয়ে আমার মন উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তখন তা অসাড় ও ভাষাহীন।

টেলেক্স বার্তাটি পড়ে আমি বললাম, 'রুবী, আগামী সপ্তাহে আমার যত রোগী দেখা আছে সব বাতিল করে দাও।'

রুবী জানতে চাইল, 'কেন, কি হয়েছে?'

'আমার বোন মীরার শরীর ভাল নয়। হয়তো আমাকে এক্ষুনি রওনা দিতে হবে।'

'কি হয়েছে মীরার?'

'ঠিক জানি না। ওর প্রথম বাচ্চা হবে। প্রায় দশ মাস হয়ে এসেছে। মীরা আছে এখন আমার মার কাছে। ওখানেই প্রসব করানো হবে।'

'আপনার মা কোথায় থাকেন?'

'মা থাকেন রত্নগিরির কাছে, দাপোলিতে।'

'ওখানে আর কে আছে?'

'আর কেউ নেই। মা একাই থাকেন। বাবার মৃত্যুর পরে বুঝিয়ে শুঝিয়ে মাকে আমার কাছে, বোম্বাইতে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কোনো অজানা কারণে মা কোনকাল দেশ ছেড়ে নড়বে না। মার বোম্বাই পছন্দ নয়। তুমি আমার জন্যে দয়া করে রত্নগিরি যাওয়ার সন্ধ্যেবেলার বিমানে একটা আসনের ব্যবস্থা করবে?' রুবীকে অনুরোধ করলাম।

'আমি কি আপনার সঙ্গে আসতে পারি? গত কয়েকবছর সেই বোম্বাইতেই আটকে পড়ে আছি। কোথাও যাইনি। আপনার মা ও বোনকে দেখলে খুব আনন্দ হবে।'

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে, আসতে পারো। কিন্তু একটা ব্যাপার মনে রেখ। কক্ষনো ওদের জানতে দিও না যে তুমি রোবট।'

'কেন?'

'পুরনো দিনের লোকেদের রোবট নিয়ে অনেক সন্দেহবাতিক আছে এবং আমি জানি যে হাজার বোঝালেও ওদের মন থেকে পুরনো সব বিশ্বাস মুছে ফেলা যাবে না।'

'ঠিক আছে। সে ক্ষেত্রে আমি তাদের জানতে দেব না।'

'আর একটা ব্যাপার। আমার মা হলেন সংরক্ষণশীল। তোমার ঐ হাল ফ্যাশনের পোশাক আশাক তাঁর মনে ধরবে না। ওখানে তুমি শাড়ী পরলেই ভাল হয়।'

রুবী বলল, 'কিন্তু আমার তো একটাও শাড়ী নেই। তাহলে কিনতে হবে।'

আমি দেরাজ টেনে একটা মোড়ক বের করে রুবীকে দিলাম। 'কেনাকাটা করার সময় আমাদের হাতে নেই। এখন তুমি এই শাড়ীটাই পরো। ওখানে গিয়ে দেখা যাবে কেনা যায় কিনা।'

মোড়কটা সে নিল। হেমাকে দেওয়ার জন্য কেনা শাড়ীটা সহজেই চিনেছিল রুবী।

'ডাক্তারবাবু...'

'এখন কথা বলার সময় নেই। তুমি বরং যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নাও।'

কায়দা করে আমি বিষয়টা এড়িয়ে গেলাম।

বিমানে আমি রুবীর সঙ্গে বেশি কথা বলিনি। বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম যে মা আমার জন্যে অধীর প্রতীক্ষায় ছিলেন। নিচু হয়ে মাকে প্রণাম করলাম। মা রুবীকে দেখে বললেন, 'মেয়েটি কে?'

'ওর নাম রুবী। ও আমার সেক্রেটারি। এছাড়া ও একজন পেশাদারী নার্স।'

'তাই নাকি? তাহলে তো ওকে এনে খুব ভাল করেছিস। মীরার প্রসব নিয়ে আর আমার দুশ্চিন্তার কারণ নেই। এসো মা, এসো।'

মাকে অনুসরণ করে আমরা বাড়িতে ঢুকলাম। মীরা একটা দোলন-চেয়ারে তার বেঢপ শরীরটা নিয়ে বসেছিল। তার শরীরের ওপরে যে ধকল চলেছে সেটা তার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। আমি তার কপালে আদর করে হাত বুলিয়ে দিয়ে ডাকলাম, 'মীরা!'

মীরা চোখ খুলে হাসবার চেষ্টা করল। বলল, 'দাদা! তুমি কখন এলে?'

'এক্ষুনি এলাম। তোর কেমন লাগছে এখন?'

'আমি ভাল আছি। ড: পেন্‌ড্‌সে আমাকে দেখছেন। তাঁর মতে কোনো গণ্ডগোল নেই। কিন্তু প্রথম বাচ্চা হওয়ার সময় একটু ঝামেলা তো হয়ই, তাই না? কিন্তু তুমি এলে কি করে?'

বললাম, 'মা টেলেক্স পাঠিয়ে আমাকে আসতে বলেছিল।'

'মা বড় ভয়কাতুরে। এইভাবে তোমাকে ডাকিয়ে আনার কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু এত ভাল লাগছে যে তুমি এসেছ...'

'তোকে অনেকদিন দেখিনি। টেলেক্সটা পেয়ে একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। তাই তড়িঘড়ি চলে এলাম।' আমার পেছন দিকে তাকিয়ে মীরা বলল, 'ও কে?'

'ও হল রুবী, আমার সেক্রেটারি ও নার্স।'

মীরা বলল, 'দেখতে তো ভারি সুন্দর। ও মা! কেমন লজ্জা পাচ্ছে দেখ!' আমি ঘুরে রুবীর দিকে তাকালাম। বেরিয়াম-নিকেলে তৈরি রুবীর মুখ সত্যিই লজ্জারাঙা হয়ে উঠেছে। এই প্রথম আমি রুবীকে ঐভাবে লজ্জা পেতে দেখলাম।

মা বললেন, 'তোরা এবার হাতমুখ ধুয়ে নে। ভাল লাগবে। আমি তোদের জন্যে একটু চা করি। তারপর দেখা যাবে রাতে কি খাওয়া যায়।'

রুবী বলল যে সে সকলের জন্যে চা করবে। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি চা করতে পার?'

'চা করতে পারি কিন্তু রাঁধতে পারি না। রান্নায় আমি একেবারে আনাড়ি।'

মা বললেন, 'কেন তা হবে? বয়স্থা মেয়েদের কিছুটা রান্না জানাই উচিত।'

'আমার মনে হয় আপনার কাছ থেকে এক দুদিনে শিখে নিতে পারব।'

'একি এক দু দিনের ব্যাপার!' মা ঠাট্টা করে বললেন, 'বিয়ে হলে তোমার বরকে খাওয়াবে কি?' মীরা বলে উঠল, 'কিন্তু মা, আমার যখন বিয়ে হয়েছিল তখন কিই বা রান্না আমি জানতাম?' মা জবাব দিলেন, 'তুই ছিলিস মহা ফাঁকিবাজ। কক্ষনো আমার কাছে কিছু শিখিসনি।'

মীরা বলল, 'তবু তো পরে শিখে নিয়ে চালিয়ে দিয়েছি।'

রুবী জানতে চাইল, 'আপনি কি রান্নার বই থেকে শিখেছিলেন?'

মীরা বলল, 'ঠিক ধরেছে। বইটা তোমায় পড়তে দেব?'

'ঠিক আছে। পড়ে দেখবখন। মনে হয় কাল দুপুরের কিছুটা রান্না আমি করতে পারব।'

'চা-টা করলেই এখন যথেষ্ট হবে...পরে, না হয় হাতে সময় নিয়ে কোরো।'

রুবী মা-র সঙ্গে রান্নাঘরে গেল। সত্যিই চা-টা রুবী চমৎকার বানিয়েছিল। মা-ও প্রশংসা করলেন। রুবীকে বললেন, 'তুমি নিজেও একটু চা নাও না।'

রুবী আমার দিকে হতভম্ব মুখে তাকাল। রোবটদের খাদ্য বা পানীয় সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। আসলে এসব নিয়ে ভাবারই কখনও কোনো দরকার হয়নি।

আমি তাড়াতাড়ি রুবীকে বাঁচাবার জন্যে বলে উঠলাম, 'রুবীর চা খাওয়ার অভ্যাস নেই।' নিজের খালি কাপটা রেখে রুবীকে বললাম যে ওকে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাব।

আমাদের বাড়িটা পুরনো আমলের ছড়ানো ধরনের। ভেতরে অবশ্য ত্রিমাত্রিক টেলিভিশন বা হলোভিশন-এর মত সবরকম আধুনিক ব্যবস্থাই রয়েছে। বাড়ির পেছনদিকে নিয়ে গিয়ে রুবীকে নারকেল বাগান দেখালাম। দেখালাম কিভাবে বাতাসচালিত কলের সাহায্যে জল তোলা হয়। এই সবকিছুই করার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল রুবীর সঙ্গে একান্তে কথা বলা।

জিজ্ঞেস করলাম, 'রুবী, তোমাদের কি আমাদের মত খেতে হয়?'

'না! আমাদের খাওয়ার দরকার হয় না।'

'তাহলে তোমরা শক্তি কোথা থেকে পাও?'

'আমাদের দেহে পারমাণবিক শক্তিকোষ রয়েছে। এই কোষ থেকেই আমাদের চলাফেরা ও মস্তিষ্কচালনার শক্তি আমরা পাই।'

'এর ফলে একটা ঝামেলা হতে পারে। মা যদি তোমাকে খেতে বলে?'

'দুশ্চিন্তা করবেন না, আমি সামলে দিতে পারব। আমাদের পেটে একটা বাড়তি থলি রয়েছে যা সহজেই পরে খালি করে ফেলা যায়। রেস্তোঁরায় বা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যদি খেতে হয় সেইজন্যে এই ব্যবস্থা।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তাই বুঝি? আগে যে কেন এটা জানা হয়ে ওঠেনি?'

রুবীর কণ্ঠে তিরস্কারের সুর, 'আমাকে কখনও জিজ্ঞেস করেননি বলে।'

এর উত্তরে আমার কিছুই বলার ছিল না।

রাতের খাওয়াদাওয়ার পর আমি উঠে বারান্দায় গেলাম। সেখানে মনে হল চেয়ারে কেউ বসে আছে। তাড়াতাড়ি আলো জ্বাললাম। দেখলাম রুবী বসে আছে। হাতে বই খোলা।

জিজ্ঞেস করলাম, 'রুবী, তুমি ঘুমোবে না?'

'আপনাদের মত আমাদের ঘুমের দরকার হয় না।'

'এই অন্ধকারে বসে কি করছিলে?'

'রান্নার বই-টা পড়ছিলাম।'

'এই অন্ধকারে পড়ছিলে?'

রুবী জবাব দিল, 'আমরা অন্ধকারেও দেখতে পাই। আমাদের চোখের ভেতরে অবলোহিত ক্যামেরা লাগানো রয়েছে।' বলে সে বইটার পাতা উল্টোতে লাগল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু তুমি তো একের পর এক পাতা উল্টে যাচ্ছ। এতে করে কি হবে?'

'আপনাদের মত একটা একটা শব্দ ধরে আমাদের পড়তে হয় না। প্রতিটি পাতার লেখাই আমাদের স্মৃতি ভাণ্ডারে জেরক্স কপির মত থেকে যায়। তার থেকে প্রয়োজনমত যে কোন তথ্য আমরা বাছাই করে নিতে পারি।'

আমি বললাম, 'বইটা কিছুক্ষণ সরিয়ে রাখ। কিছুক্ষণ বরং বারান্দায় একসঙ্গে বসা যাক।'

বারান্দার কাঠের রেলিং-এ ভর দিয়ে আমি আর রুবী পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম। 'রাতরাণী' ফুলের মনমাতানো সুবাস ঠাণ্ডা বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল। সমুদ্রের ঢেউ-এর সঙ্গীত আর বাতাসে আন্দোলিত নারকেল ও পাম গাছের পাতার শব্দের মধ্যে আমরা কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ফিসফিস করে রুবী বলল, 'ডাক্তারবাবু, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

আমি জানতাম যে কি ও জানতে চাইবে। বললাম, 'হেমার কথা জানতে চাইছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'ও ব্যাপারটা চুকে গেছে।'

'তাই।'

'আমার বাড়ি তোমার কেমন লাগল রুবী?'

'খুব ভাল লেগেছে! আপনার আত্মীয় স্বজনদেরও খুব ভাল লেগেছে! আপনারা, মানুষরা কি সুখী, কি সৌভাগ্যবান!'

'কেন রুবী?'

'আপনাদের মা আছে, বাবা আছে, ভাইবোন আছে। আর আমরা একেবারে একা। আমাদের কেউ নেই। কারখানায় আমারা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জন্মাই, তারপর মরবার জন্য আবার সেখানে ফিরে যাই।' রুবী কিছুক্ষণ চুপ করে যাবার পর জিজ্ঞেস করল, 'আমরা এখানে কতদিন থাকব, ডাক্তারবাবু?'

'বড়জোর একসপ্তাহ বা কাছাকাছি। এক দুদিনের মধ্যেই সম্ভবত মীরার বাচ্চা হবে। তারপরেই আমরা যেতে পারব। তোমার কি এখানে একঘেয়ে লাগছে না অন্য কোনো সমস্যা আছে?'

'না, না, একেবারেই তেমন কিছু নয়। সত্যি বলতে আমি চিরদিনই এখানে থেকে যেতে চাই। এখানেই যদি আমি মরতে পারতাম?'

আমি তার হাত ধরে বললাম, 'দোহাই তোমার, ওরকম কথা বোলো না।' আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল। কিছুক্ষণ পরে রুবী বলল, 'ডাক্তারবাবু, আমি কি সন্তানজন্ম দেখতে পারি? এর কথা আমি শুনেছি কিন্তু কখনও দেখিনি। এখানে কি সেটা দেখার সুযোগ আমার হবে? মীরার সঙ্গে আমি কি প্রসূতিসদনে যেতে পারব?'

'অবশ্যই পারবে। আর তুমি থাকলে অনেক সাহায্যও করতে পারবে। রুবী, এমনকি এখানে এসেও তোমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আশা করি কিছু মনে করছ না।'

'একেবারেই না। আসলে আমার খুব ভালই লাগছে।'

আমি অস্ফুটে বললাম, 'রুবী, প্রিয়তমা, তোমার ভাল লাগাতেই আমার আনন্দ।' বলে তাকে কাছে টেনে নিলাম।

অবাক হয়ে রুবী বলল, 'এ আপনি কি করছেন, ডাক্তারবাবু?' 'তুমি যে বলো আমাকে তুমি ভালবাস। জাননা কি আমি চাই?'

রুবী বলল, 'কি চান আপনি?'

'আমি তোমাকে চাই।'

'তার মানে কি, ডাক্তারবাবু?'

ঠিক তখনই কারো বারান্দায় আসার শব্দ পেলাম। রুবীর কাছ থেকে সরে

এলাম। মা বারান্দায় এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'অনিল, এত রাতে তোরা এখানে! কি ব্যাপার?'

'ও কিছু না মা। ঘুম আসছিল না। তাই বসে গল্প করছিলাম।'

'সে ভাল। কিন্তু এখন একটু ঘুমিয়ে নে তোরা। কাল অনেক ধকল থাকবে।'

পরদিন সকালে দেখলাম রুবী রান্নাঘরে ব্যস্ত। প্রাতরাশের সময়েই আমাদের একটি দেশীয় সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করে রুবী আমাদের অবাক করে দিল। আরও বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল দুপুরে খাওয়ার সময়। আমাদের এক প্রাচীন ঐতিহ্যগত এক অতীব জটিল পদ খাওয়ালো রুবী। মা তো বিশ্বাসই করতে চাননি যে গতকাল অবধি রুবী রান্নায় একেবারেই আনাড়ি ছিল।

মীরা থাকার ফলে বাড়িতে কাজের চাপ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। বাড়তি একজন হাত লাগানোর ফলে মা-র খুব সাহায্যই হল। তৃতীয় দিন, ভোর থেকে শুরু হল মীরার গর্ভবেদনা।

মীরাকে প্রসূতি সদনে নিয়ে যাওয়া হল। রুবী ও আমি, দুজনেই প্রসব করানোর ঘরে ছিলাম। রুবীর পক্ষে সন্তানজন্মের ঐ দৃশ্য দেখা এক কঠিন পরীক্ষাই দাঁড়িয়েছিল। থেকে থেকে শক্ত করে আমার হাত ধরলেও মোটের ওপর রুবী বেশ সাহসেরই পরিচয় দিয়েছিল।

কিছুক্ষণ পরে ড: পেন্‌ড্‌সে এগিয়ে এসে বললেন যে মীরার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে এবং মামা হওয়ার সুবাদে আমাকে অভিনন্দন জানালেন। নবোজাত শিশুটি ডাক্তারের কোলেই ছিল। গোলাপী ফুটফুটে বাচ্চা।

রুবী বেশ কিছুক্ষণ ধরে শিশুটিকে দেখল। পরে সে ভয়ে ভয়ে ড: পেন্‌ড্‌সেকে জিজ্ঞেস করল যে শিশুটির গায়ে সে হাত দিতে পারে কি না। ড: পেন্‌ড্‌সে হেসে রুবীকে সম্মতি দিলেন।

রুবীকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে সে স্নায়বিক উত্তেজনায় ভুগছে। এগিয়ে গিয়ে সে আলতোভাবে শিশুটাকে স্পর্শ করল, শিশুটির রেশমী নরম চুলে আঙুল বুলিয়ে দিল, তারপর যেন কিছুটা ভয় পেয়েই সরে এল। সে দেখল যে মীরা বিছানায় শুয়ে আছে। মীরার মুখটা ফ্যাকাসে, ঘর্মাক্ত কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে নবলব্ধ মাতৃত্বের আনন্দ ফুটে উঠছিল। সে ক্লান্ত চোখে রুবীর দিকে তাকালো।

রুবী জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাথাটা কি খুব বেশি হয়েছিল?'

মীরা নরম হেসে বলল, 'এই ব্যথাটা বড় মিষ্টি একটা ব্যথা। ভেবনা, একদিন তুমি নিজেও এটা অনুভব করবে।'

রুবী অন্যদিকে তাকাল।

সুখবরটি মাকে দেবার জন্য আমরা বেরিয়ে এলাম। রুবী অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তারবাবু, আমি কি মীরার মত সন্তানধারণ করতে পারব?'

'আমার মনে হয় সেটা সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যবশত তুমি হলে একটা রোবট...এবং রোবটরা মানুষের মত সন্তানের জন্ম দিতে পারে না।'

রুবী কেঁদে ফেলল, 'কিন্তু আমি একটি নারী হতে, মা হতে চাই। কাল ডাক্তারবাবু আপনি আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন আর সেই থেকে আমার অনুভূতিগুলো অন্যরকম হয়ে গেছে। আপনার ছোঁয়াই এই পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আমার স্মৃতিভাণ্ডারের ওরকম কোনো অভিজ্ঞতা নেই। সেই সুন্দর মুহূর্তগুলোর পরে আমার মনে হয় আমি আর রোবট নেই। আমি অনুভব করছি যে আমি প্রকৃত, পূর্ণ নারী হয়ে উঠেছি।'

আমি রুবীর হাত ধরেছিলাম। রুবী বলে চলে, 'ডাক্তারবাবু, আমি যখন সদ্যোজাত শিশুটিকে স্পর্শ করলাম তখনও অনুভূতিটা একেবারে নতুন ধরনের হল। আমার সারা দেহে কি আশ্চর্য এক পুলক। তখনই আমি উপলব্ধি করলাম যে আমার হাত কি যান্ত্রিক ও শীতল। গোটা দেহটাকে আমার একটা বোঝা বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে বেরিয়াম-নিকেলে তৈরি এই দেহ আমি ত্যাগ করি, এই আবদ্ধ খাঁচার থেকে বেরিয়ে আসি। বলুন না, ডাক্তারবাবু, কেন এরকম আমার মনে হচ্ছে? এর অর্থ কি?'

আমি বললাম, 'মানুষ প্রায় 50,000 বছর আগে যে উপলব্ধি করেছিল সেটাই তুমি উপলব্ধি করেছ। সে যখন হাতে একটা পাথর তুলে নিয়েছিল আর নিজের পায়ের ওপরে দাঁড়িয়েছিল তখন সে বুঝতে পেরেছিল যে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে সে আলাদা। শিশুটির স্পর্শ তোমার মধ্যে একই ধরনের উপলব্ধি জাগিয়ে তুলেছে। তখন তুমি অন্য রোবটদের থেকে তোমার পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছ। মানবজাতির ক্ষেত্রে ঐ উপলব্ধির সময়টা ছিল গুরুত্বপূর্ণ এক মুহূর্ত, এক ক্রান্তিক্ষণ।

একইভাবে আমি বিশ্বাস করি যে একটা নতুন সভ্যতার, সংস্কৃতির সূত্রপাত ঘটবে। কয়েক হাজার বছর পরে হয়তো রোবটেরা মানুষ হয়ে উঠবে। এবং এই নতুন রোবট সভ্যতায় মানুষের অবস্থান যে কি দাঁড়াবে তা আমি জানি না। হয়তো

সে অতিমানবে পরিণত হবে বা তোমরা মানুষের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করবে। যেভাবে আমরা আসিমভের তিনটি সূত্র ব্যবহার করে তোমাদের নিয়ন্ত্রণ করি সেভাবেই হয়তো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা একদিন তোমাদের হাতে চলে যাবে এবং মানব নিয়ন্ত্রণের তিন সূত্র নতুন এক যুগের সূচনা ঘটাবে। অথবা, হয়তো মানুষ পৃথিবী ত্যাগ করে অন্য কোনো গ্রহে গিয়ে বাস করতে শুরু করবে। ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে? কিন্তু রুবী, কোনো সন্দেহ নেই যে তোমার ও আমাদের, উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উপলব্ধির এই মুহূর্তটি অতীব গুরুত্বমণ্ডিত।'

'কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমার কি হবে? আমি কি এরকমই থেকে যাব? সারা জীবন...একটা রোবট হয়ে।'

'এক্ষেত্রে কিছুই করার নেই রুবী। তোমার মনটা ইতিমধ্যেই মানুষের মত কাজ করতে শুরু করেছে কিন্তু তোমার দেহটি রোবটেরই রয়ে গেছে। তোমার পক্ষে এই অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। রুবী, আমরা বোম্বাইতে ফিরে যাওয়ার পরে তোমাকে রাঘবের কাছে ফিরে যেতে হবে। চিরতরে। আমি জানি না আর আমাদের কখনও দেখা হবে কি না।'

'না ডাক্তারবাবু, দয়া করে অমন কিছু করবেন না। আমি আপনার সঙ্গে থাকতে চাই। আমি আপনাকে ভালবাসি ডাক্তারবাবু।'

তার হাতটা ধরে আমি বললাম, 'সেটা আমি জানি। আর সত্যি বলতে আমিও তোমাকে ভালবাসি রুবী।'

'সত্যি ভালবাসেন? তাহলে আমাকে কেন আপনি রোবট কোম্পানিতে ফিরিয়ে দিচ্ছেন?' রুবী কাতর প্রশ্ন করে।

'রাঘব তোমার মস্তিষ্কটি পর্যবেক্ষণ করবে। বিশ্বাস করো, তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার তোমার মতই কষ্ট হবে। কিন্তু এই বিচ্ছেদ আমাদের পারস্পরিক মঙ্গলের জন্যই দরকার। হয়তো ভবিষ্যতে কোনোদিন আমাদের মধ্যে কোনো মানুষ তোমাদের কাউকে জীবনসঙ্গী করে তুলতে পারবে। ততদিন আমাদের এই সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েই কাটাতে হবে।'

'কিন্তু ডাক্তারবাবু...'

'আর কোনো পথ নেই রুবী। তুমি কি আসিমভের সূত্র ভুলে গেছ। তোমাকে ঐ সূত্র অনুসরণ করতে হবে এবং আমি যা বলব তা মেনে চলতে হবে।'

এরপর আমরা আর কথা বলিনি। সারাক্ষণ আমি রুবীর হাত ধরেছিলাম।

মীরার ছেলে হওয়ার সংবাদ পেয়ে মার দুই চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরে উঠল।

মা বললেন, 'ঈশ্বর কি করুণাময়। এবার তোমাদের বিয়ে করে আমাকে আর একটি নাতি উপহার দিতে হবে। জীবনে আর কিছুই আমার চাওয়ার নেই।'

আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম, 'এটা কি হচ্ছে, মা।' মা বললেন, 'থাক্, আর ন্যাকা সাজতে হবে না।' তারপর হাসতে হাসতে রুবীর পিঠে হাত রেখে বললেন, 'আমার রুবীকে খুব পছন্দ হয়েছে। চমৎকার বউ হবে ও। কি রুবী, তুমি আমার শেষ ইচ্ছেটা পূরণ করবে না?'

রুবী কোনোমতে বলল, 'কিন্তু, আমি...'

'আমি কোনো কথা শুনব না। আমি ধরেই নিয়েছি যে কথা পাকা। বলতে পারো এটা আমার আদেশই।'

রুবী কোনোমতে সেখান থেকে পাশের ঘরে চলে গেল।

'দ্যাখ্না কেমন লজ্জা পাচ্ছে! যা, তোরা দুজনে মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের নামে মিষ্টি দিয়ে আয়। আর শোন্, ফিরতে দেরি করিস না।'

মা কি বলছিলেন আমি আর শুনিনি। আমি তাড়াতাড়ি রুবীর কাছে গেলাম।

হেলান দেওয়া চেয়ারে রুবী বসেছিল। চোখদুটো বন্ধ, মাথাটা পেছনে এলিয়ে পড়েছে। আমি কাছে গিয়ে ফিসফিস করে ডাকলাম, 'রুবী।'

কোনো সাড়া নেই।

রুবীর হাত ধরলাম। ধাতব ঠাণ্ডা সেই হাত। 'রুবী!' বলে তাকে ডাকলাম, কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলাম। কিন্তু আমার ডাক তার কৃত্রিম মস্তিষ্কে পৌঁছল না। দৌড়ে গেলাম রাঘবকে ফোন করতে।

রুবীকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে রাঘব উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমি দুঃখিত অনিল। কিন্তু কিছুই আর করার নেই।'

চরম পরিণতির আশংকায় আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম, 'কি বলতে চাও তুমি?'

'আসিমভের সূত্রই রুবীকে গ্রাস করেছে। তুমি ওকে বলেছিলে আমার কাছে ফিরে যেতে আর তোমার মা ওর কাছে একটি নাতি চেয়েছিলেন যা এক অসম্ভব প্রস্তাব। তখন রুবী একটা দোটানার মধ্যে পড়ে যায়। এবং আসিমভের তৃতীয় সূত্রটি বোধহয় তোমার জানা আছে অনিল...'

'হ্যাঁ, পূর্বতন দুটি সূত্র যদি লঙ্ঘিত না হয় তাহলে রোবট তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে', আমি বললাম।

'রুবী ঐ দুটি আদেশ মানতেও পারছিল না, আবার অমান্য করতেও পারছিল না। সবচেয়ে কঠিন হয়ে উঠেছিল তার অস্তিত্ব বজায় রাখার সমস্যা। এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তার মস্তিষ্কের ছিল না। দ্বিধাগ্রস্ত ঐ অবস্থাই তাকে ধ্বংস করে। তার মস্তিষ্কের বর্তনীগুলো কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুড়ে যায়। অন্যভাবে বললে, 'রুবী মারা গেছে!'

রুবীর বরফশীতল হাত ধরে রাখি। 'রুবী...রুবী!'

কান্নায় আমার চোখ ভেসে যায়।

জন্মগত অধিকার

শুভদা গোগাটে

আশাবরী ও শেখর যখন 'ভ্রূণ বিকাশ কেন্দ্রে' পৌঁছল তখন প্রায় দুপুর তিনটে। উজ্জ্বল দিবালোকে বিশাল বাড়িটি দেখে বেশ সমীহই হচ্ছিল। একতলার মাপের বড় বড় অক্ষরে লেখা নামটা দেখে কেমন যেন ভয় ভয়ই করে। আর কাচের দরজাগুলো এতই বড় যে, যে ঢুকবে তারও বুক টিপটিপ করবে।

কিছুটা ইতস্তত করেই তারা বাড়িটাতে ঢুকেছিল এবং ঢুকে যা দেখল তাতে তো তাজ্জব বনে যাওয়ার যোগাড়। প্রধান প্রবেশপথটি দিয়ে ঢুকতেই একটি উপবৃত্তাকার অভ্যর্থনা কক্ষ। তার ডানদিকের কোণে দামী কাঠের টেবিলের পেছনে বসে দুটি বেশ সুশ্রী প্রাণোচ্ছল যুবক দুটি মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে। বাকি জায়গাটায় অনেক সোফাসেট নানা নক্সায় সাজানো। অথচ জায়গাটিতে কোনোমতেই ফাঁকা জায়গার অভাব আছে বলে বলা যাবে না। অভ্যন্তরে সাজাবার চমৎকার সব গাছ খুব পরিকল্পনামাফিক রাখা রয়েছে। টেবিলে টেবিলে রঙীন সব চমকদার পত্রিকা রাখা। আলতো প্যাস্টেল রঙের দেওয়াল ঢাকার কাগজ দিয়ে ঘরের দেওয়ালটা মোড়া। দেওয়ালের ধারের দিকে সারি দিয়ে সবুজ গাছের সারি। অভ্যর্থনা কক্ষের বাঁদিকে রয়েছে বিশাল একটি পোষ্টার। তাতে দেখা যায় যে ছোট্ট একটা ফুটফুটে গোলগাল মেয়ে একটা সুন্দর তুলতুলে কুকুরছানা কোলে নিয়ে হাসছে। মেয়েটার নরম সুন্দর চুল, আদুরে কুকুরছানা আর মেয়েটির অপূর্ব নিষ্পাপ হাসি থেকে চোখ সরতে চায়না।

অভ্যর্থনা কক্ষে ঢুকে শেখর ও আশাবরী অনেকক্ষণ ধরে পোস্টারটির দিকে তাকিয়েছিল। তারপর আশাবরীকে একটি চেয়ারে বসিয়ে শেখর অভ্যর্থনা দপ্তরে খোঁজখবর নিতে গেল।

বিশাল সেই অভ্যর্থনা কক্ষটিতে তাদের মত অনেক মানুষই ভিড় করেছিল। অথচ এমনই দক্ষতার সঙ্গে আসন ব্যবস্থাটি এক এক ভাগে বিন্যস্ত করা যে কখনোই মনে হয় না যে ঘরে ভিড় জমেছে। যে কোনাটিতে আশাবরী বসেছিল সেটি বেশ চুপচাপ।

শেখর এসে আশাবরীর পাশে বসল। দুজনেই ডাক্তারের কাছ থেকে ডাক আসার জন্য অপেক্ষা করছিল। ঘরটির স্নিগ্ধ পরিবেশ এবং অনেক লোক থাকলেও এক ধরনের নিজস্ব একাকিত্বের আবহাওয়ায় তারা বেশ গা এলিয়ে দিয়েছিল আর নিজেদের মধ্যে গল্প করছিল।

কিছুক্ষণ পরেই একটি নার্স এসে তাদের ড: মানের ঘরে নিয়ে গেল।

ড: মানের ঘরটিও কিছু কম সুন্দর করে সাজানো নয়। ড: মানে দাঁড়িয়ে উঠে সহাস্যে তাদের স্বাগত জানালেন। শেখরের সঙ্গে করমর্দন করে তিনি তাদের বসতে বললেন।

আশাবরী ড: মানের হাতে ড: নলিনী যোশীর রিপোর্টটি দিল। সকালেই সে ড: যোশীর কাছে গিয়েছিল। ড: নলিনী যোশী একজন তরুণী স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ যিনি কমবয়সী গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়, বিশেষ করে আশাবরীর বয়সী মায়েদের কাছে।

বিংশ শতাব্দীর মত এখন আর স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষেত্রকে স্ত্রীরোগচিকিৎসাশাস্ত্র বা শিশুরোগবিদ্যার মত সাধারণ ব্যাপক ভাগে বিভক্ত করা হয় না। স্বাস্থ্য সমস্যার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করে নতুন ও অতিরিক্ত বিভাগ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলিকে দুটি ব্যাপক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। কয়েকজন চিকিৎসক সাধারণ দৈহিক দক্ষতা, দুর্বলতা, বিপাক ক্রিয়ার মাত্রা ও শারীরিক বিকাশের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেন। অন্যরা কোনো নির্দিষ্ট ব্যাধির চিকিৎসার বিষয়টি দেখেন। নাগরিকরা এখন মনে করতে শিখে গেছে যে নিজেকে স্বাস্থ্যবান ও আনন্দিত রাখাটা তাদের সামাজিক দায়িত্ব এবং সেইজন্য নিয়মিত সময়মাফিক পরীক্ষা করানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শের সব খরচাই সরকারের তাই জনগণও নিজেদের দেখভাল ভালভাবেই করতে পারে।

সন্তান জন্মদানের উপযুক্ত বয়সী সব তরুণীর জন্য মাসিক স্ত্রীরোগবিষয়ক পরীক্ষার একটি আইন রয়েছে। সেই কারণেই আশাবরী ড: যোশীর কাছে গিয়েছিল। যথারীতি ড: যোশী আশাবরীকে সূক্ষ্ম সব আধুনিক যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে জানালেন যে সে গর্ভবতী হয়েছে। বড়জোর এক সপ্তাহ আগে তার মাসিক রক্তঃস্রাব প্রথম হয়নি। আশাবরীর সন্দেহ যে ঠিক সে বিষয়ে মতপ্রদান করে ড: যোশী জানালেন যে ঠিক তেইশ দিন আগে গর্ভসঞ্চারের ঘটনাটি ঘটেছে।

আশাবরী জানত যে পরবর্তী পর্যায়ে তাকে 'ভ্রূণ বিকাশ কেন্দ্রে' যেতে হবে। কিন্তু এটা তার জানা ছিল না তৎক্ষণাৎই তাকে যেতে হবে। ড: যোশী তাঁর রিপোর্টটি প্রস্তুত করে আশাবরীকে দিয়ে বললেন, 'আজ দুপুরেই তোমাকে 'ভ্রূণ

বিকাশ কেন্দ্রে' যেতে হবে। সেখানে বিশেষজ্ঞরা তোমাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী দিয়ে দেবে।'

আশাবরী জিজ্ঞেস করেছিল, 'ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি কাল বা পরশু যাই তাহলে হবে না?' এর কারণ হল কেন্দ্রটি তার বাড়ির থেকে অনেক দূরে এবং এলাকাটিও তার ভাল চেনা ছিল না। আর তাছাড়া ওখানে ও যেতে চেয়েছিল শেখরের সঙ্গে। কিন্তু শেখর তো রোজকার মত সকালে অফিস চলে গেছে।

আশাবরীর অসুবিধার কথা শুনে ড: যোশী বললেন, 'এটা এমন কোনো সমস্যা নয়। শেখরকে আমরা একটা দিন ছুটি নিতে বলতে পারি।'

আশাবরী বলল, 'কিন্তু ও তো অফিসে চলে গেছে।'

ড: যোশী মিষ্টি হেসে বললেন, 'আমি শেখরকে কারখানায় ফোন করছি যাতে সে একদিনের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। এটা কিন্তু ওর ছুটির থেকে কাটা যাবে না। বরং বিশেষ ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।'

আশাবরী যে অবাক হয়েছে সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। তখন ড: যোশী তাকে বললেন, 'দেখো আশাবরী, তুমি মা হতে চলেছ। জাতির কাছে তোমার ও তোমার শিশু সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ দেশের ভবিষ্যতকে তুমি গর্ভে ধারণ করেছ। তোমার শিশু যাতে স্বাস্থ্যবান, সুগঠিত ও সুসমঞ্জসভাবে বেড়ে ওঠে সেটা খুবই দরকারী। সেই লক্ষ্যে আমাদের সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা করছে। একেবারে প্রথম দিন থেকেই তোমার শিশুর ও তোমার দায়িত্ব সরকারের। এবং সরকার তার কর্তব্য সুচারুভাবেই পালন করে থাকে।'

ড: যোশীর কাছ থেকে এত জ্ঞানগর্ভ বাণী আশাবরী ঠিক আশা করেনি। সে চুপচাপ বসে থাকল।

শেখরের অফিসের টেলিফোন নম্বর নিয়ে ড: যোশী তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে কথা বললেন। শেখরের দপ্তরের বড়বাবুর সঙ্গেও কথা বললেন তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে হেসে বললেন, 'তোমার স্বামী এক্ষুনি বাড়িতে পৌঁছে যাবে। আজ দুপুরেই তোমরা দুজনে 'ভ্রূণ বিকাশ কেন্দ্রে' যেতে পারবে। সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এমনকি একটি দিনও অপচয় করা ঠিক হবে না। একজন ভাল নাগরিক তৈরি করার জন্য প্রতিটি মুহূর্তই অমূল্য।'

ড: মানের মুখোমুখি বসে এই কথাগুলো আশাবরী স্মরণ করেছিল।

ড: মানে রিপোর্টটি ভাল করে পড়ে নিয়ে সানন্দিত মুখে বললেন, 'অভিনন্দন, শ্রীমতী দেব। আপনি মা হতে চলেছেন। শ্রী দেবকেও আমি অভিনন্দন না জানিয়ে পারি না।'

প্রায় সমস্বরেই আশাবরী ও শেখর 'ধন্যবাদ' বলে উঠেছিল।

ড: মানে বললেন, 'শিশুর জন্ম অবশ্যই একটি আনন্দের ব্যাপার কিন্তু তা দায়িত্ব বর্জিত নয়। আমাদের সকলকেই এখন থেকে তার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। তার জন্য আশা করি যে আপনারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। করবেন না?'

আশাবরী ও শেখর মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। ড: মানে বলে চললেন, 'দৈহিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গর্ভবতী মা এবং তাঁর অনাগত সন্তানের দায়িত্ব আমাদের এই কেন্দ্রের। প্রত্যেক দিন দুঘণ্টার জন্যে আপনাকে এখানে আসতে হবে। নিজের সুবিধামত এই সময় আপনি বেছে নেবেন। কিন্তু আমরা চাই যে খাওয়ার ঘণ্টা দুয়েক আগে আপনি এখানে আসবেন যাতে করে দুপুর বা রাতের কোনো একটি খাবার আপনি আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে গ্রহণ করবেন। এছাড়া থাকবে কিছু ব্যায়াম, খেলা, আপনার মতই গর্ভবতী মেয়েদের সঙ্গে চিন্তার আদানপ্রদান এবং কিছু জ্ঞানবুদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ। আপনার ও আপনার সন্তানের পক্ষে এগুলি একেবারেই অপরিহার্য। আপনার প্রয়োজনীয় ওষুধ ও টনিক আপনি এখান থেকেই পাবেন। প্রতি সপ্তাহের ওষুধের মাত্রা ও আনুষঙ্গিক স্থির করার জন্য বিশদভাবে আপনাকে পরীক্ষা করা হবে। পরে আপনার সুবিধানুযায়ী আমাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো হাসপাতালে আপনার নাম নথিভুক্ত করে দেওয়া হবে। এবার এটা আপনি লিখে ফেলুন।' ড: মানে চারপৃষ্ঠার একটি ফর্ম আশাবরীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এখন শুধু নিজের নাম, ঠিকানা, বয়স লিখে স্বাক্ষর করে দিন। কাল বিশদ পরীক্ষার পরে বাকিটা আমরাই ভর্তি করে দেব। আর, আপনার কৌতূহল হচ্ছে না জানতে যে আপনার ছেলে হবে না মেয়ে হবে?'

আশাবরী হেসে মাথা হেলিয়ে সায় দিল।

'আপনি ডানদিকে পাশের ঘরটাতে যেতে পারেন। সেখানে যে মহিলা ডাক্তার আছেন উনি বলে দেবেন।'

আশাবরী উঠে সেখানে গেল। শেখর প্রশ্ন করল, 'শিশুটির লিঙ্গ কি এত আগে নির্ধারণ করা যায়?'

'দেখুন, গর্ভসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই সেটা আমরা বলে দিতে পারি। ভুলে যাবেন না যে বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গেছে। একবিংশ শতাব্দীর অর্ধেকটা আমরা পেরিয়ে এসেছি। গত শতাব্দীর মত আমাদের সন্তানের লিঙ্গ জানার জন্য গর্ভাবস্থার পাঁচ মাস অবধি অপেক্ষা করতে হয় না।'

ড: মানের কথা বলার মধ্যেই আশাবরী ফিরে এল। তার হাত থেকে কার্ডটা নেবার সময় শেখরকে তাকে একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্তই দেখাল। এর কারণ কি হতে পারে

তাই নিয়ে শেখর সাতপাঁচ ভাবছে—এরই মধ্যে কার্ডটিতে এক লহমা চোখ বুলিয়ে ড: মানে বললেন, 'অতি উত্তম, আপনাদের প্রথম সন্তান ছেলে! সত্যিই আপনারা ভাগ্যবান।'

শুনে শেখরের তো আনন্দ উপচে পড়তে লাগল। আসলে যদিও ছেলে বা মেয়ে যাই হোক কিছু যায় আসে না তবুও ছেলে সম্বন্ধে শেখরের একটু দুর্বলতা ছিল। তাই ছেলে হবে শুনে তার এত আনন্দ হয়েছিল।

আনন্দিত মনেই তারা ড: মানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দোতলায় গেল। সেখানে প্রধান নার্সের সঙ্গে আলোচনা করে তারা ঠিক করল রোজ বেলা 11টা থেকে বেলা 1টা অবধি আশাবরী ঐ কেন্দ্রে আসবে। এরপর তারা দুজনেই বাড়ি ফিরে গেল।

পরদিন থেকে আশাবরী নিয়মিত 'ভ্রূণ বিকাশ কেন্দ্রে' যাতায়াত শুরু করল। চার পাঁচদিনের মধ্যেই এই যাওয়াটা তার কাছে প্রাত্যহিক রুটিনে পরিণত হল। রোজ সে পৌনে এগারটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাস স্টপে গিয়ে দাঁড়াত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কেন্দ্রের গাড়ি এসে তাকে তুলে নিয়ে যেত। বাসে দশ থেকে বারো জন সন্তানসম্ভবা মা থাকত। সবথেকে শেষে উঠত আশাবরী এবং তাকে তুলে নেবার পর বাসটি সোজা কেন্দ্রে চলে যেত। এইভাবে এগারটা নাগাদ ওরা তের জন কেন্দ্রে পৌঁছে যেত। একই সময়ে শহরের অন্যান্য অংশ থেকে বেশ কিছু মেয়েও কেন্দ্রে আসত। কেন্দ্রে তাদের বিভিন্ন দলে ভাগ করা হত। আশাবরীকে নিয়ে তার দলে ছিল দশজন মেয়ে এবং তাদের পরিচালনা করার জন্য একজন দলনেত্রী ছিল। এর মধ্যে মঞ্জিরী প্যাটেল নামে একটা মেয়ের সঙ্গে আশাবরীর খুব ভাব হয়েছিল। হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল এই মেয়েটি ছিল আশাবরীর দলে। একই বাসে সে আসত।

আশাবরী ও মঞ্জিরীর দলটির জায়গা হয়েছিল দোতলায়। সেখানে প্রথমে আধঘণ্টা তাদের নিয়মিত ব্যায়াম করতে হত। বলা হয়েছিল সন্তানজন্মের সময় এর ফলে সুবিধা হবে। এরপর পনের মিনিটের ছুটি। এই সময়টা বরাদ্দ ছিল বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করার জন্য। দলনেত্রী এইসময় নানারকম প্রশ্নও করত।

এরপরে তাদের ঢিলেঢালা পোষাক পরতে হত। এরপর দ্বিপ্রহরকালীন ভোজনের জন্য আধঘণ্টার বিরতি। প্রত্যহ ঐ নির্দিষ্ট সময়ে তারা পেত উষ্ণ, উপাদেয় খাবার। সেইসঙ্গে নিজস্ব মাত্রায় ওষুধ ও বলবর্ধক টনিক।

এরপরে হত পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে দেহ শিথিল করে বিশ্রাম ও মানসিক উন্নয়নের অধিবেশন। সাধারণত যা ভাবা হয় সেভাবে মানসিক উন্নয়নের জন্য

কিন্তু দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়া হত না। ক্লান্তিকর ভাষণ সম্বন্ধে আশাবরীর দুশ্চিন্তা অচিরেই দূরীভূত হল। প্রথম দিনেই দলের মেয়েদের জোড়ায় জোড়ায় বিভক্ত করা হল। আশাবরীর জুড়ি হল মীনাক্ষী। মীনাক্ষী আশাবরীর একদিন আগে 'ভ্রূণ বিকাশ কেন্দ্রে' যোগ দিয়েছিল। তার বয়স ছিল আশাবরীর চেয়ে সামান্য বেশি ও প্রত্যেকটা জিনিসই সে খুব গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করত। এক একসময় তার প্রতিক্রিয়া হত খুবই তীব্র ও তিক্ত। প্রথমদিনেই আশাবরী সেটা টের পেয়েছিল।

দুপুরের খাওয়ার পর তাদের নিয়ে যাওয়া হল ছোট্ট একটি ঘরে। সেখানে মধ্য বয়সী, চশমাআঁটা এক ভদ্রলোক তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দেখলে মনে হয় যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আশাবরী ও মীনাক্ষী ঘরে ঢুকতে তিনি তাদের বসতে বললেন। তারপর বললেন, 'পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্য আমিই হলাম আপনাদের শিক্ষক। এই সময়টা 'মানসিক উন্নয়ন' নিয়ে আমরা কাজ করব। সত্যি বলতে 'মানসিক উন্নয়ন' কথাটা সঠিক বলা চলে না। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য হল একইসঙ্গে বিশ্রাম ও আপনাদের সন্তানের শিক্ষার জন্য ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করা। আপনারা হয়তো জানেন যে ভ্রূণ কিছু শব্দ শুনতে পারে...অথবা বলা চলে বার বার একই শব্দ শুনলে ভ্রূণ সেই শব্দ সম্বন্ধে সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। এই ব্যাপারটা বিজ্ঞানীরা কয়েক বছর আগে আবিষ্কার করেছিলেন। আরও নির্দিষ্টভাবে বললে বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে বিশদ গবেষণার থেকে এই ইঙ্গিতই পাওয়া যায় যে ভ্রূণাবস্থাতেও শিশু কিছু কিছু চিন্তাভাবনা গ্রহণ করতে পারে।

'এই আবিষ্কার মানবজাতির পক্ষে এক বিশাল পদক্ষেপের সামিল। শিশুকে যদি যথাযথ মানসিক অভ্যাসে প্রশিক্ষিত করা যায় এবং চিন্তার জন্য নিরন্তর গঠনমূলক খাদ্য সরবরাহ করা যায় তাহলে আশা করা যায় যে তাকে বিদ্রোহ, গুণ্ডাগিরি ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক ঝোঁক থেকে বাঁচানো সম্ভব, যে ঝোঁকগুলি যৌবনকালে মাথা চাড়া দিতে পারে। এর ফলে দেখা যাবে যে ধর্মঘট, মারদাঙ্গা, বিক্ষোভ মিছিল ও অপরাধের মাত্রাও হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা সহজ হবে এবং জীবন হয়ে উঠবে সুন্দরতর ও নিরাপদ। এই লক্ষ্য মাথায় রেখেই প্রধানমন্ত্রী হবু তরুণী মায়েদের জন্য এই কর্মসূচী চালু করেছেন। সরকার আপনাদের এবং আপনাদের শিশুর পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এর জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ, সময় ও শক্তি ব্যয় করতে হচ্ছে কিন্তু আদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের এক উন্নততর প্রজন্মের প্রশ্নে সরকার কোনোরকম সমঝোতা বা নতিস্বীকারে রাজী হতে পারে না...'

'আপনার এত ধানাই পানাই-এর দরকার যে কি সেটা বুঝতে পারছি না। মোদ্দা

কথাটা সাফ সাফ বলুন না?' মীনাক্ষীর গলায় তীব্র শ্লেষ। আশাবরী তো হতবাক। কয়েক মুহূর্ত ঐ ভদ্রলোকও বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। তারপর জোর করে দেঁতো হাসি মুখে এনে তিনি বললেন, 'আমি দুঃখিত। হয়তো আপনার কাছে ব্যাপারটা খুব ক্লান্তিকর ঠেকছে। কিন্তু দেখুন, আমি আমাদের চিকিৎসার নীতির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় ঘটাতে চাই, তাই আমাকে এত কথা বলতে হল।

আর হ্যাঁ, খুবই ভাল হয় আপনারা যদি আমাকে 'ভাই' বলে ডাকেন কারণ ঐ নামেই এখানে সকলে আমাকে ডেকে থাকে।'

মীনাক্ষী ক্রুদ্ধস্বরে জবাব দিল, 'সেটা করে আমি নিজের ভাইকে ছোট করতে পারব না।'

আশাবরী ভেবেছিল যে ভাই কড়া জবাব দেবে কিন্তু সেরকম কিছুই হল না। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ভাই বললেন, 'শ্রীমতী মীনাক্ষীর আজ মনমেজাজ ভাল নেই বলে মনে হচ্ছে। আমার মনে হয় উনি যেমন বলেছেন তেমন কাজ শুরু করে দেওয়াই ভাল হবে।'

ওদের দুজনকে তিনি পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরটি বেশ বড়। ঘরের দুধারেই মস্ত সোফাসেট, তার কাছেই কয়েকটি চেয়ার ও টেবিল। সেখানে জনৈক পরিচারক মীনাক্ষীকে একদিকে নিয়ে গেল। আশাবরীকে ভাই নিয়ে গেলেন অন্যদিকে। আশাবরীকে একটি চেয়ারে বসতে বলা হল। টেবিলের ওপরে একটি টেপরেকর্ডার এবং কিছু কাগজ ছিল। মুখোমুখি চেয়ারে বসে ভাই বললেন, 'আপনার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আপনার শিশুর পরিচয় করাবার জন্য এবার আমাদের কি করতে হবে সেটা এবার আপনাকে বলব। এবার আপনার কণ্ঠস্বর আমরা টেপ-এ তুলে নেব। পরে যখন আপনি বিশ্রাম করবেন তখন সেটা আমরা শিশুকে বাজিয়ে শোনাবো।'

'কিন্তু ডাক্তারবাবু মানে ভাই, অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে বাচ্চা হয়তো কণ্ঠস্বরটা চিনবে কিন্তু কি করে আপনি ভাবছেন যে সে ভাষা বুঝতে পারবে? যে শব্দগুলো তার কানে যাবে তার মানে সে বুঝবে কেমন করে?'

ভাই একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'শ্রীমতী আশাবরী, আমি খুবই আনন্দিত যে এই প্রশ্নটা করেছেন। আগে খুব সামান্য কয়েকজনই এটা জানতে চেয়েছে। ব্যাপারটা আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি। এটা আপনি ঠিকই বলেছেন যে বাচ্চা এখন এই শব্দের অর্থ বুঝতে পারবে না কিন্তু কয়েকটা শব্দ যদি বার বার বাজানো হয় তাহলে সেগুলো বাচ্চার স্মৃতিতে গেঁথে যাবে। সেগুলো হয়ে উঠবে তার নিজেরই চিন্তা যদিও স্মৃতিতে সেগুলো অপ্রকাশিত শব্দ হিসেবে থেকে যাবে। সে

হয়তো এর সম্বন্ধে সচেতনও থাকবে না। কিন্তু জন্মগ্রহণের পরে যখন তার বোধশক্তি জাগ্রত হবে তখন যখনই সে ঐ শব্দগুলো শুনবে সেগুলো পূর্বপরিচয়ের কারণে তার চেনা বলে মনে হবে এবং সেগুলো সে নিজের বলে গ্রহণ করবে। উদাহরণস্বরূপ, জন্মগ্রহণের আগে তাকে যদি বার বার বলা হয় যে চুরি করা অন্যায় তাহলে সে যখন বড় হয়ে ঐ কথা শুনবে তখন তার আবেদনটি তার মাথায় তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যাবে। সে আর কখনও চুরি করবে না।'

ভাই-এর কথা আশাবরীকে ভাবিয়ে তুলল। ভাই বলে চলে, 'গত কয়েক বছরে আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে অপরাধের হার হ্রাস পেয়েছে। এই সাফল্যের কৃতিত্ব আমাদের কর্মসূচীর। নতুন প্রজন্ম গুণ্ডাবাজি করার কথা অনুভবই করে না।'

অপরাধের হার হ্রাস পাওয়ার কথাটা আশাবরী শুনেছিল কিন্তু যে কর্মসূচী এর জন্য দায়ী তার সম্বন্ধে সে অবহিত ছিল না।

'আসুন, আমরা শুরু করি। প্রথমে এই কাগজের লেখাটা আপনি পড়ে নিন। পরে আপনি জোরে জোরে এটা পড়বেন আর আমি রেকর্ড করে নেব। একটা ব্যাপার, খুব সহজ, স্বাভাবিকভাবে পড়বেন। ঠিক আছে তো?'

ভাই-এর হাত থেকে কাগজ নেওয়ার সময় আশাবরী মীনাক্ষীর দিকে দেখল। মীনাক্ষীও কিছু পড়ে যাচ্ছে এবং একজন নার্স সেটা রেকর্ড করছে।

পরের সপ্তাহটাও এইভাবে কাটল। প্রথম দুদিন প্রাথমিক কিছু ব্যাপার যার মধ্যে ছিল ছেলেভুলোনো গান, কিছু সঙ্গীত, মায়ের দুধের উপকারিতা সম্বন্ধে বাণী, বন্ধুদের সঙ্গে মজা, 'ঝগড়া করা ভাল নয়, পরে তোমার কষ্ট হয়', ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর শুরু হল শিক্ষাদায়ক কিছু বাক্য যেমন 'সদাই পিতামাতাকে মান্য করিবে', 'গুরুজনদের শ্রদ্ধা করিবে কারণ তোমার জন্য কষ্টসাধন করিয়াছেন', 'প্রত্যেকে আমরা অপরের ওপরে নির্ভরশীল এবং এই হইল আমাদের সমাজ', 'সর্বদা ব্যক্তিস্বার্থের উপরে সমাজকল্যাণকে স্থান দিতে হইবে' এবং এইজাতীয় আরও যত হতে পারে।

দিন চারেক পরে জোর দেওয়া শুরু হল দেশপ্রেমের ওপর। জাতীয় স্বার্থে যাঁরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাঁদের প্রশংসা। এই আলোচনার মর্মার্থ হল প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে প্রত্যেক নাগরিককেই দেশের জন্য কিছু ত্যাগস্বীকার করতে হবে।

পরের দিনের বক্তব্যের বিষয় হল দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রশংসা যাকে বলা হল বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এইসঙ্গে চলল কর্মদক্ষ সরকার এবং জনকল্যাণে তার অঙ্গীকারের জয়গান। প্রত্যেক নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হল যে সরকারী সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নে সশ্রদ্ধভাবে তাদের অংশ নিতে

হবে। রাষ্ট্রদ্রোহকে সম্ভাব্য সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ হিসেবে বর্ণনা করে বলা হল যে নাগরিকদের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে হবে এবং দেশদ্রোহীদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। সরকারী আদেশের কোনোরকম বিরোধিতা বরদাস্ত করা হবে না এবং প্রতিটি নাগরিকের প্রথম ও সর্বোচ্চ কর্তব্য হল দেশের প্রতি আনুগত্য। বক্তব্যের এইছিল মোটের ওপর মূল সুর।

নিজের বাচ্চার জন্য তোতাপাখির মত যে বুলি তাকে টেপরেকর্ড করতে হয়েছে তার কথা ভাবতে ভাবতে আশাবরী সেদিন বাড়ি ফিরল। নিজের মনে মনে আশাবরী ভাবল, 'আমাকে কি আমার শিশুর জন্মের আগেই তাকে সরকারের প্রতি অনুগত হতে শেখাতে হবে, বলতে হবে যে সরকারের কোনো কর্মসূচীর প্রতি প্রতিরোধ বা বিদ্রোহ তার করা উচিত নয়? সর্বকালে, সব রাষ্ট্রেই নাগরিককে সরকারের অনুগত হতে হয় কিন্তু তার অর্থ কি মূকভাবে সবকিছু মেনে নিয়ে দাসের মত থাকা? এখন আমার শিশুর মাথায় এগুলো কি আমার না ঢোকালেই নয়?'

বাকি দিনটা আশাবরীর অস্বস্তির মধ্যে কাটল। শেষে সে ঠিক করল যে পরের দিন মঞ্জিরীর সঙ্গে সে বিষয়টা আলোচনা করবে। এটা ঠিক করে তার একটু ভাল লাগল।

কিন্তু পরের দিন মঞ্জিরী এল না।

ওদিকে দলের আর কারো সঙ্গে আশাবরী বন্ধুত্ব করেনি যে এইসব সমস্যা আলোচনা করবে। তার জুড়ি ছিল মীনাক্ষী কিন্তু তার গুরুগম্ভীর মনোভাব এবং তিক্ত মন্তব্যের ফলে আশাবরীর সঙ্গে তার কিছুটা দূরত্ব হয়ে গিয়েছিল। বেশ অস্থির মন নিয়েই আশাবরী সেদিন মানসিক শিক্ষা কক্ষে প্রবেশ করেছিল।

রোজ যেখানে বসে সেই চেয়ারে বসল। কিছুক্ষণ পরে ভাই বলে যিনি নিজের পরিচয় দেন সেই ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন এবং একগুচ্ছ কাগজ আশাবরীকে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজই আপনার রেকর্ডিং-এর শেষ দিন। আজই যা বাকি আছে আমাদের শেষ করতে হবে। তাই সরাসরি রেকর্ড করা শুরু করা যাক। রেকর্ডিং-এর আগে আপনার আর পড়ে নেওয়ার দরকার নেই। ব্যাপারটা তো আপনি ভালভাবেই জেনে গেছেন।'

অস্ফুটে 'ঠিক আছে' বলে আশাবরী পড়তে শুরু করল। মনে হয় আগের দিন সে যা পড়েছে তারই যেন জের টেনে আজকের বক্তব্য। সরকার এবং জনস্বার্থে

সরকারের দায়বদ্ধ প্রচেষ্টার স্তুতি। এরপর প্রধানমন্ত্রীর নানা গুণের এক প্রশংসা কীর্তন। সামান্য এক ঠেলাওয়ালার পরিবারে তিনি নাকি জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের চরম দারিদ্র্যের জন্য তাঁকে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল কিন্তু নিছক বুদ্ধি আর মনের জোরে তিনি ওপরে উঠতে সক্ষম হন। তারপর পরের কয়েক পৃষ্ঠা ধরে চলল তাঁর সাফল্যের এক ফিরিস্তি। এটা পড়ার সময় আশাবরীর মধ্যে একটা ঘৃণা যেন উথলে উঠল। তার বাচ্চাকে এই প্রচারমূলক বক্তব্য শোনানো হবে এটা তার বরদাস্ত হচ্ছিল না। অবাক হয়ে সে ভাবছিল এ সবকিছুর পেছনে আসল ধান্দাটা কি?

প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী কীর্তির বর্ণনা শেষ হওয়ার পরই শুরু হল তাঁর ব্যক্তিত্বের বিবরণ বুদ্ধিমান, সুপুরুষ, সুগঠিত স্বাস্থ্য, দেখলে দুচোখ জড়িয়ে যায়, রাজনীতির ওপরে জব্বর দখল আর সেইসঙ্গে তীক্ষ্ণ নজর, জনগণের একনিষ্ঠ সেবক...আশাবরী আর এগোতে না পেরে মাঝপথে পড়া বন্ধ করে দিল। ভেতরে ভেতরে তার গা গুলিয়ে উঠছিল। সে বলল, 'ভাই, এসব হচ্ছে কি বলুন তো...'

'একি শ্রীমতী আশাবরী, আপনি মাঝপথে থেমে গেলেন কেন? দয়া করে তাড়াতাড়ি এটা পড়ে শেষ করুন। এভাবে আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়।'

বাধ্য হয়ে আশাবরী আবার পড়তে শুরু করল। কাগজে লেখা ছিল, 'এমন অসাধারণ একজন ব্যক্তিকে আমাদের নেতা হিসেবে দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে নেতার একমাত্র চিন্তার বিষয় হল তাঁর জনগণের সুখসাচ্ছন্দ্য। মা তাঁর সন্তানদের যেমন ভালবাসেন তিনি তাঁর জনগণকে তার চেয়েও বেশি ভালবাসেন। ঘড়ি ধরে সর্বক্ষণ তিনি তাদের জন্য কর্মে ব্রতী। তাই আমাদের তরফে, আমাদের প্রত্যেককে তার প্রতিটি আদেশ মান্য করে চলতে হবে এবং শুধু তাই নয়, জীবনদানের জন্যও আমাদের শপথবদ্ধ হতে হবে...আমাদের প্রত্যেককে।'

আশাবরী দৃঢ়তার সঙ্গে স্থির করল যে সে আর পড়বে না। ভাই তার দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, 'দয়া করে ঐভাবে থেমে যাবেন না। পড়ুন, পড়ে যান!'

'আমি পারব না! আগে আপনাকে বলতে হবে এসব কি ব্যাপার!'

'বাঃ সে তো কাগজের ওপরে জলজ্যান্ত লেখাই রয়েছে। এর থেকে কি আর বেশি বলতে পারি আমি?'

'লেখার অর্থটা আমিও বুঝতে পারছি কিন্তু এর সঙ্গে আমার বাচ্চার কি সম্পর্ক?'

'আমি তো এর মধ্যে ভুল কিছু দেখছিনা। আমাদের দেশের মহান ব্যক্তিদের

সঙ্গে আপনার শিশুর পরিচয় করিয়ে দেওয়া কি অন্যায়?'

'কিন্তু আমি এখন যেটা পড়ছি সেটা তো নিছক পরিচিতি নয়। এ হল মহিমাকীর্তন। আমরা প্রধানমন্ত্রীর স্তুতিগান গাইছি।'

'আপনি কি বলতে চান যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী একজন মহান ব্যক্তি নন?'

'তা নয়। আমি শুধু চাই না যে আমার শিশু পৃথিবীতে পা দেওয়ার আগেই তাকে এইসব বিশ্বাস করানো হোক। সুন্দর বিষয় বা গঠনমূলক চিন্তা শোনানো এক কথা, আর তাকে ব্যক্তিপূজা শেখানোটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার!'

ভাই-এর গলায় মার্জনাভিক্ষার সুর, 'সত্যি বলব আপনাকে? এ সবই লিখিতভাবে ওপরতলার থেকে পাওয়া। ওপরওয়ালারা যে নির্দেশ দেন আমরা কেবল তা পালন করি।'

'কিন্তু আমি যদি তা মানতে রাজী না হই?'

'তাতে কোনো লাভ হবে না আশাবরী, 'মীনাক্ষীর কণ্ঠস্বর শুনে আশাবরী তার দিকে তাকাল। সে দেখল একই ধরনের একগুচ্ছ কাগজ হাতে নিয়ে মীনাক্ষী তার দিকে আসছে।

জনৈকা নার্স মীনাক্ষীকে থামাতে চেষ্টা করে, 'শ্রীমতী মীনাক্ষী, দয়া করে আপনার জায়গায় ফিরে যান।'

নার্সকে কোনো পাত্তা না দিয়ে মীনাক্ষী সোজা আশাবরীর টেবিলের কাছে এসে আশাবরীর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আশাবরী, তোমার নিজের স্বার্থেই তোমার ওদের কথা শোনা উচিত।'

'কিন্তু, আমি কিছুতেই...'

'কিন্তু তুমি তো বাচ্চাটা চাও, চাও না?'

আশাবরী ভয় পেয়ে গেল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই চাই। তুমি কি বোঝাতে চাইছ?'

মীনাক্ষীর নার্স দৌড়ে তাদের কাছে এল। ভাই ঝটপট উঠে দাঁড়ালেন। আশাবরীর কাঁধ থেকে মীনাক্ষীর হাতটা সরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'শ্রীমতী মীনাক্ষী, দয়া করে আপনি আপনার জায়গায় ফিরে যান। তা না হলে আমি...। আমাকে তাহলে ব্যাপারটা ওপর মহলে জানাতে হবে।'

মীনাক্ষী মুখ দিয়ে ঘৃণাব্যঞ্জক একটা শব্দ করে নিজের আসনে ফিরে গেল। ভাই রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল।

আশাবরী ভাইকে লক্ষ্য করছিল। মীনাক্ষীর মন্তব্য শুনেই সে ঘর্মাক্তকলেবর হয়ে পড়েছে। এমনকি নার্সটিকে দেখেও যথেষ্ট বিচলিত বলে মনে হয়েছে। আশাবরী ঠিক করল যে মীনাক্ষীর কাছ থেকে সবটা তাকে জানতে হবে।

কিছুক্ষণের অস্বস্তিকর নীরবতা। তারপর ভাই বললেন, 'শ্রীমতী আশাবরী, দয়া করে এই টেপরেকর্ড করার কাজটা আসুন আমরা সেরে ফেলি! মাত্র দু-তিন পাতা বাকি। বেশির ভাগটাই তো আপনার রেকর্ড করা হয়ে গেছে।'

আশাবরী পৃষ্ঠাগুলো দেখল। ভাই ঠিকই বলেছে। আর মাত্র কয়েক মিনিটের মামলা। তিন পাতা মাত্র বাকি। এটা পড়ে ফেলাটা কোনো বড় ব্যাপার নয়। আর তা ছাড়া মীনাক্ষীর ঐ কথাগুলো, 'কিন্তু তুমি তো বাচ্চাটা চাও, চাও না?', তার কানে বাজছিল। অনিচ্ছা সত্বেও আশাবরী কাগজগুলো তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল।

রেকর্ডিং শেষ হওয়ার পরে আশাবরীকে ভাই তাঁর ঘরে দেখা করতে বললেন। সেখানে গিয়ে আশাবরী ভাই-এর মুখোমুখি বসল। ভাই কিছুক্ষণ চুপ করে কাগজ চাপা দেওয়ার ওজন নিয়ে খেলা করলেন। যেন চিন্তাগুলোকে কথায় সাজাচ্ছেন। চশমা খুললেন, মুছলেন আর নিচু গলায় বলতে শুরু করলেন, 'কি করে ব্যাপারটা আপনাকে আমি বোঝাবো বুঝতে পারছি না। কিন্তু মনে হয় যে বলতে আমাকে হবেই। শ্রীমতী মীনাক্ষী যা বলেছেন সেগুলো আপনি দয়া করে ভুলে যান। উনি হলেন...কিছুটা বিচলিত। আসলে ওঁর...'

'আপনি কি বলতে চান যে মীনাক্ষীর মানসিক কোনো গণ্ডগোল হয়েছে?'

'মানে...তা ঠিক নয়। আবার সেরকমই ভাবতে পারেন। আসলে তাঁর দুবার গর্ভপাত হয়েছে।'

'গর্ভপাত?'

'হ্যাঁ! দুবারই তিনি চিকিৎসার জন্য এই কেন্দ্রে যেহেতু এসেছিলেন তাই তাঁর কোনোভাবে এরকম একটা ধারণা হয়ে গেছে যে তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য এই কেন্দ্রই দায়ী। শেষবার যখন হয় তখন আমরা ব্যাপারটা জানতে পারি। কিন্তু কিই বা আমাদের করার ছিল? এমনকি তাঁর বর্তমান অবস্থাতেও খুব একটা কিছু করা সম্ভব নয়। বরং তাঁর এই বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। একবার স্বাভাবিকভাবে সন্তানের জন্ম দিতে পারলেই তাঁর সব সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। যতদিন না এটা হচ্ছে ততদিন তাঁর ঐ অস্বাভাবিক ব্যবহার আমরা ধর্তব্যের মধ্যে নেব না, তিনি যা কিছু বলবেন সবই অবজ্ঞা করব। আমি কি ব্যাপারটা আপনাকে স্পষ্টভাবে বোঝাতে পেরেছি?'

আশাবরী এর জবাবে কি বলবে ভেবে পায়নি। মাথা নেড়ে সে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

দ্বিতীয় দিনেও মঞ্জিরী এল না। সেদিন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যায়ামের পর আশাবরী হালকাভাবেই বলেছিল 'মঞ্জিরী আজকে কেন এল না কে জানে?'

মীনাক্ষী তার স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষভাবে জবাব দিয়েছিল, 'এখানে আর আসার মঞ্জিরীর কোনো কারণই নেই।'

'কি বলতে চাও বলো তো?'

'মঞ্জিরীর গর্ভপাত হয়েছে।'

'গর্ভপাত?' আশাবরী বিস্মিত হয়ে মীনাক্ষীর দিকে তাকিয়ে কি করে এটা সম্ভব ভাবছিল। কিন্তু মীনাক্ষীই বা এটা জানল কি করে?

আশাবরী প্রশ্ন করল, 'কে বলে যে এরকম হয়েছে? আর তুমিই বা জানলে কি করে?'

'এতে আবার জানার কি আছে? কারো কাছ থেকে আমার জানার দরকার নেই। ওর মেয়ে হওয়ার কথা ছিল না?'

'হ্যাঁ।' আশাবরীও জানতো যে মঞ্জিরীর মেয়ে হবে।

'তার মানেই সবটা জলের মত পরিস্কার।'

'মীনাক্ষী, নির্ঘাত তোমার মাথা কাজ করছে না! মেয়ে হওয়ার ছিল তো তাতে কি?'

'বন্ধুদের মধ্যে কি নিয়ে কথা হচ্ছে শুনি?' হঠাৎ চমকে তারা দলনেত্রীর গলার আওয়াজ পেল এবং দেখল যে কখন যেন সে তাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

এই দলনেত্রীর বয়স প্রায় মীনাক্ষীর সমান। বেশ উজ্জ্বল, সদাহাস্যময় ও কথা বলিয়ে মেয়ে এই দলনেত্রী। নাম তার স্মিতা কিন্তু তাকে 'নেতা' বলেই ডাকা হত। 'মানসিক উন্নয়নের' অধিবেশনের জন্য যাওয়া অবধি নেতা তাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকত। ওদের সঙ্গে আড্ডা মারত, তাদের ওষুধ দিত, এমনকি একসঙ্গে খেতও।

এত সঙ্গোপনে পা টিপে টিপে 'নেতা'-কে পেছনে এসে আড়ি পাততে দেখে আশাবরী কিছুটা বিস্মিতই হয়েছিল। যাই হোক, সে বলল, 'আমরা মঞ্জিরীর কি হয়েছে ভাবছিলাম...'

'নেতা' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'বেচারা মঞ্জিরী! ওর...ওর গর্ভপাত হয়েছে।'

আশাবরীর আর্তস্বর, 'হায় ভগবান! কিভাবে?'

'সেটা আমরা ঠিক ঠিক এখনও জানিনা কিভাবে...'

'এত যত্নআত্তির পরেও...'

'নেতা' জবাব দিল, 'পৃথিবীতে সম্ভাব্য সব যত্ন কেউ নিতে পারে কিন্তু শেষ হিসেবে এটা একজনের শরীর, ভাগ্য ও নিয়তির ব্যাপার! যাকগে, যা হবার হয়ে

গেছে। তোমরা দুপুরের খাওয়া সেরে নাও। তা না হলে দেরি হয়ে যাবে।' এই বলে 'নেতা' খাওয়ার ঘরের দিকে রওনা দিল।

তাকে অনুসরণ করতে করতে মীনাক্ষী আশাবরীকে কানে কানে ফিসফিস করে বলল, 'ঐ লম্বা চুলওয়ালা মেয়েটিকে দেখে রাখো। ওরও মেয়ে হওয়ার কথা। ওরও যে কোনো দিন গর্ভপাত হতে পারে। অপেক্ষা করেই দেখো কি হয়!'

আশাবরী একবার থেমে মেয়েটাকে দেখল। সে সুখীমনে গুনগুন করে কোনো একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে খাওয়ার ঘরে চলেছে।

সেইদিন থেকেই বাচ্চাকে রেকর্ড করা বক্তব্য শোনানো শুরু হল। ঘরে ছিল নরম গদি ও চাদর। মীনাক্ষীর সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করতে নার্স পর্দা টেনে ঘর অন্ধকার করে আলোর সুইচ টিপে দিল। নরম নীলাভ আলোয় ঘরটা ভরে গেল।

ভাই যেভাবে বলেছেন সেভাবে আশাবরী সোফার ওপরে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। মাথার তলায় বালিশ। পাশের টেবিলের ওপরে রাখা ছিল দুটি অর্ধবৃত্ত জোড়া দেওয়া একটি ধাতব কাঠামো। ভাই সেটি তুলে নিয়ে বললেন, 'এই বার্তা প্রেরক যন্ত্রটি আমি আপনার পেটের ওপরে রাখছি। এই যন্ত্র শিশুর কানে আপনার বার্তা প্রেরণ করবে। আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হল গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমের চেষ্টা...বাড়িতে যখন থাকেন তখন আপনারা খাবার এবং নিয়মিত বিশ্রাম নেওয়ার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকেন না, অথচ একজন গর্ভবতী নারীর পক্ষে ঐ দুটিই প্রয়োজনীয়। তাই, প্রত্যহ, আমরা কিছুক্ষণ অন্তত আপনাদের জন্য ঘুমের ব্যবস্থা করেছি।' যন্ত্রটি আশাবরীর পেটের ওপরে রেখে ভাই বললেন, 'আমি এবার বেরিয়ে যাচ্ছি। চোখ বন্ধ করে আপনি এবার ঘুমিয়ে পড়ুন। কোনো সমস্যা বোধ করলে এই বোতামটা টিপবেন, আমি চলে আসব।' সোফার পায়ের দিকে বোতামটা ভাই দেখিয়ে দিলেন, তারপর আশাবরীর ওপরে একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

মীনাক্ষীর সঙ্গে যে নার্স ছিল সেও চলে গেল। ওরা চলে গেছে দেখে আশাবরী মীনাক্ষীকে ডাকল, 'শুনছো...'

মীনাক্ষী তার দিকে তাকিয়ে থাকলেও কোনো কথা বলল না।

তখনই দরজা খুলে ভাই ঘরে ঢুকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কি কিছু চাই?'

আশাবরী মাথা নেড়ে না বলল।

ভাই বললেন, 'তাহলে দয়া করে দেহ শিথিল করে শুয়ে থাকুন। কোনো কথা নয়।'

আশাবরী স্পষ্ট বুঝতে পারল যে বাইরে থেকে ঘরের সবরকম শব্দ শোনার ব্যবস্থা রয়েছে। মনমরা হয়ে আশাবরী চোখ বন্ধ করল।

যন্ত্রটির থেকে অস্ফুট একটি কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। আশাবরী কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করল। বুঝতে পারল যে খুব আস্তে তার কণ্ঠস্বরটি বাজছে যদিও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

দৈহিক ব্যায়ামের পরে পেট ভরে ভালমন্দ খাওয়া হয়েছে। নরম, উষ্ণ সোফার স্পর্শ, ঘরের ঢিমে আলো এবং যন্ত্রের অস্ফুট স্বর—সব মিলিয়ে আশাবরীর ঘুম পাচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন তার ঘুম ভাঙল আশাবরী দেখল যে তার পেটের ওপর থেকে বার্তা প্রেরক যন্ত্রটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। নার্স পর্দাগুলো খুলে দিচ্ছে এবং ভাই সোফার কাছে এক কাপ চা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ তুলে তাঁর দিকে দেখতেই তিনি বললেন, 'কি, ভাল ঘুম হয়েছে? নিন, এক কাপ চা খান।'

চা খাওয়ার পরে তারা নিজেদের বরাদ্দ ঘরে পোষাক বদলাতে গেল। আশাবরী ঠিক করেছিল যে সেখানে সে মীনাক্ষীকে মঞ্জিরীর বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে কিন্তু সেখানে 'নেতা' সহ অনেকজন থাকায় সে স্থির করল যে আপাতত সে মীনাক্ষীর সঙ্গে কথা বলবে না।

পরবর্তী দুদিনে আশাবরী আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল—যাওয়ার জন্য বাসে ওঠার থেকে শুরু করে ফিরে এসে বাস থেকে নামা অবধি কেন্দ্রের কেউ না কেউ সবসময় নজরদারি করে। বাসে একজন পরিচারক থাকে। নেমে প্রবেশপথ থেকে সঙ্গে থাকে 'নেতা' যে দুপুরের খাওয়া অবধি আঠার মত লেগে থাকে। আর 'মানসিক উন্নয়নের' অধিবেশন কক্ষে সেই নার্স তো অবধারিতভাবে উপস্থিত থাকবেই। দলে যখন সবাই মিলেমিশে থাকে তখন তারা মন খুলে গল্প করতে পারে কিন্তু কোনো দুজন মেয়ে বেশিক্ষণ ধরে কথা বলতে পারে না। 'নেতা' যদি দেখে তারা নিভৃত সংলাপে ব্যস্ত তাহলে সে নাক গলায় এবং আলোচনাটা অন্য কোনোদিকে চালিত করে দেয়।

আশাবরী ভেবে পায় না যে অন্যদের চোখেও কি ব্যাপারগুলো ধরা পড়েছে! রেকর্ড করা ঐ বক্তব্য তার কাছে যতটা অসহ্য অন্য কেউ কি সেরকম মনোভাব পোষণ করে? নাকি সে নিজে নিজেই আজগুবি দুশ্চিন্তা করছে? আশাবরী কারো সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। অন্যরা ব্যাপারটা নিয়ে কি ভাবছে সেটা সে জানতে চেয়েছিল। কিন্তু কি করে সেটা সম্ভব হবে? কখন সে সুযোগ পাবে? কিভাবে?

এক সপ্তাহের একটু বেশিই কেটে গেল অনিশ্চয়তায়। বাসে, মঞ্জিরীর জায়গায় নতুন একটা মেয়ে আসতে শুরু করেছে। এর মধ্যে আশাবরী তার বাসের সঙ্গীদের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব করে ফেলেছে। তার মধ্যে দুজনের মেয়ে হবার কথা। যখনই আশাবরীর চোখ তাদের দিকে পড়ে তখনই মীনাক্ষীর কথাগুলো অস্বস্তিকরভাবে মনে পড়ে যায়।

একদিন লম্বা চুলওয়ালা মেয়েটা আর বাসে এল না। যখন সে পরের দিনও এল না তখন 'নেতা'-কে জিজ্ঞেস করল, 'ও কেন আসছে না?'

'নেতা' অন্যদিকে তাকিয়ে জবাব দিল, 'আমি জানি না। হয়ত শরীর খারাপ হয়েছে।'

সেই সময়েই একটি মেয়ে বলল, 'তোমরা জান না বুঝি? ওর হঠাৎ গর্ভস্রাব হয়ে গেছে!'

অন্য কেউ বলে উঠল, 'হায় ঈশ্বর! কি করে হল?'

'হঠাৎ ওর পেটে ব্যথা ওঠে। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই গর্ভপাত হয়ে যায়। বাড়ি থেকে ফোন এসেছিল। এমনকি ড: মানে—ওর বাড়িতে গিয়েছিলেন। জানো না তোমরা!'

'নেতা' মিনমিন করে বলল, 'শুনিনি তো,' তারপরেই ওদের তাড়া লাগালো, 'এখন এসব কথা বন্ধ করো তো তোমরা। চলো। আমরা খেতে যাই।'

আশাবরী খুবই অস্থির হয়ে পড়েছিল। এসব কি হচ্ছে? এবং কেন?

কিছুক্ষণ পরে যখন তারা পোশাক বদল করতে গেছে তখন সে এই সুযোগে ব্যাপারটা মীনাক্ষীর নজরে আনল।

'মীনাক্ষী, আমার তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

জবাব দেওয়ার আগে আশেপাশে কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে মীনাক্ষী বলল, 'জানি কিন্তু এখানে নয়।'

'কেন নয়? শুনুকগে ওরা। আমি তোয়াক্কা করি না!'

'না! এখানে নয়। তুমি কোথায় থাক? ঠিকানাটা দাও।'

আশাবরী তাকে ঠিকানাটা দিল এবং মীনাক্ষী যেমন আন্দাজ করেছিল, 'নেতা' সেখানে এসে উপস্থিত হল। একটাও কথা না বলে তারা সেখান থেকে সরে গেল।

আশাবরী আশা করেছিল যে মীনাক্ষী যে কোনোদিন আসতে পারে কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলাই যে মীনাক্ষী আসবে এটা সে ভাবেনি।

মীনাক্ষী যখন এল তখন আশাবরী শেখরের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করছিল। শেখর কয়েক সপ্তাহ ধরেই লক্ষ্য করে আসছিল যে কেন্দ্রের ব্যাপারে

আশাবরী খুশী নয়। সে যা শুনেছিল তাতে করে নিজেরও মোটেই ব্যাপারটা সুবিধার ঠেকেনি।

আশাবরী শেখরকে মীনাক্ষীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। মীনাক্ষী বলল, 'আজকে সত্যি আমার হাতে বেশি সময় নেই। আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু যেহেতু আমি জানি যে আশাবরীর মনে কিছু প্রশ্ন রয়েছে এবং আমি যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছি ওরও তাই চলছে সেই কারণে ওকে আমি সাবধান করার জন্য এতটা পথ এলাম। কেন্দ্রের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এবার নিয়ে তিনবার হল।'

এই বলে মীনাক্ষী কেন্দ্র সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানাল যা শুনলে চমকে ওঠারই কথা!

বছর দুয়েক আগে, 'ভ্রূণ বিকাশ কেন্দ্রে' নাম নথিভুক্ত করার আগে মীনাক্ষী ছিল এক সুখী নারী। বিয়ের চার বছর পরে যখন সে প্রথম গর্ভবতী হয় তখন তার মন খুবই রোমাঞ্চিত হয়েছিল। কেন্দ্রে পরীক্ষা করে জানা গিয়েছিল যে তার মেয়ে হবে। কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞদের হাতে নিজের ভার সমর্পন করে সে বেশ আশ্বস্ত ও আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রে যোগ দেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই তার গর্ভস্রাব হয়ে যায়। এত সহসা ঘটনাটি ঘটে যে এর ধাক্কা সামলাতে মীনাক্ষীর বেশ সময় লেগেছিল। এই সময় তার মানসিক যন্ত্রণার অংশীদার হওয়ার জন্য তাদের বাড়িতে মীনাক্ষীর শাশুড়ী ও দেবরকেও আসতে হয়েছিল।

কয়েকদিন পরে মীনাক্ষীর দেবর ঐ কেন্দ্র সম্বন্ধে সাঙঘাতিক কিছু তথ্য সংগ্রহ করে। ঐ কেন্দ্রে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত তার এক বন্ধুর মারফতে সে জানতে পারে যে সরকার ঐ কেন্দ্রের মাধ্যমে যে শিশুরা জন্মাবে তার মধ্যে ছেলে ও মেয়ের এক অনুপাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এবং এই নির্দিষ্ট অনুপাত রক্ষা করার জন্য কেন্দ্র যথেচ্ছ গর্ভপাত ঘটাতে পারে। এবং এটা করা হয় কেন্দ্রে নথিভুক্ত মেয়েদের যে ওষুধ দেওয়া হয় তার মাধ্যমে।

মীনাক্ষীর দেবরের সেই বন্ধু বলেছিল, 'তুমি যদি আমাকে আগে জানাতে যে তোমার বৌদি কেন্দ্রে নাম লেখাচ্ছে তাহলে আমি একটা জাল রিপোর্টের ব্যবস্থা করতাম যাতে লেখা থাকত যে ওঁর ছেলে হবে।'

এর কয়েক মাস পরে মীনাক্ষী পুনরায় গর্ভবতী হয় এবং সেটা তৎক্ষণাৎ তার দেবর 'ভ্রূণ বিকাশ কেন্দ্রের' সেই বিশেষজ্ঞ বন্ধুকে জানিয়ে দেয়। এক সপ্তাহ পরে মীনাক্ষী কেন্দ্রে যোগ দেয়। এবার তাকে যে রিপোর্ট দেওয়া হয় তাতে বলা ছিল যে তার ছেলে হবে। আসলে কি হবে সেটা মীনাক্ষীর জানা ছিল না।

চার মাস অবধি কেন্দ্রে মীনাক্ষীর সবকিছু ঠিকঠাক চলেছিল। পঞ্চম মাস থেকে শুরু হল 'মানসিক উন্নয়নের' অধিবেশন। তখন এই ব্যাপারটা চার মাস পর থেকে শুরু হত। প্রথম দিন থেকে ঐ অধিবেশন হালেই শুরু হয়েছে।

প্রথম যখন মীনাক্ষীকে দিয়ে রেকর্ড করানো শুরু হয় তখন ঐ জাতীয় ব্যবস্থার যথাযথতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়। তখন ওখানে তার জুড়ি ছিল সঙ্গীতা দাভে নামে মীনাক্ষীর এক বন্ধু। সঙ্গীতাও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয় এবং বলে যে রেকর্ড করতে সে রাজী নয়। খবরটা গোটা কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ে। একদিন মীনাক্ষীর দেবরের বন্ধু মীনাক্ষীকে সাবধান করার জন্যে বাড়িতে আসেন যে এইভাবে অসহযোগিতা করলে তার নিজেরই ক্ষতি হবে। তিনি বলেছিলেন, 'ওদের কথা শুনে চলাই আপনার পক্ষে ভাল। তা যদি আপনি না করেন তাহলে এর ফলাফল মারাত্মক হতে পারে।'

অসহায় হয়ে মীনাক্ষী আবার কেন্দ্রের নির্দেশ মেনে চলতে শুরু করে কিন্তু রেকর্ড করা ঐসব বক্তব্য যখন তার শিশুকে শোনানো হত তখন তার প্রচণ্ড মানসিক প্রতিক্রিয়া হত। এত বিচলিত সে হয়ে পড়ত যে ঘুম আসতে চাইত না।

সপ্তাহ তিনেক কেটে যাওয়ার পরে সে সহসা একদিন লক্ষ্য করল যে বার্তা প্রেরক যন্ত্র থেকে যে কণ্ঠস্বরটি আসছে সেটি তার নয়—সেটা কোনো পুরুষ কণ্ঠ!

মীনাক্ষী তখন মন দিয়ে কণ্ঠস্বরটি শুনেছিল। গলাটা যদিও চেনা তবুও সেটি যে কার তা সে সনাক্ত করতে পারেনি। কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হচ্ছিল, 'আমাদের গণতন্ত্র হল বিশ্বের সেরা গণতন্ত্র। আমাদের সমগ্র সরকারী ব্যবস্থাটি সামাজিক কল্যাণসাধনের কাজে নিয়োজিত। আমাদের রাষ্ট্র হল জনকল্যাণ মূলক রাষ্ট্র এবং আমাদের নেতা হলেন শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয় যিনি...' মীনাক্ষী রেগে তার পেটের ওপরে রাখা প্রেরক যন্ত্রটি সরিয়ে দিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ নার্স ও ভাই ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢোকে এবং ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে কিন্তু তাতে মীনাক্ষীর বিশ্বাস হয়নি। পথে নিয়ে আসার জন্য তাদের সব প্রচেষ্টা প্রতিহত করে মীনাক্ষী পোষাক পাল্টে বাড়ি ফিরে এসেছিল।

এরপর প্রত্যেকদিন দুপুরের খাওয়ার পরে মীনাক্ষী টেপ বাজানোর অধিবেশনে যোগ না দিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে আসত। তখন এমনকি কেন্দ্রের হর্তাকর্তারাও তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে পথে আনতে চেষ্টা করে কিন্তু মীনাক্ষী তাদের কথা শোনেনি এবং জানিয়ে দিয়েছিল যে সে 'মানসিক উন্নয়নের' ব্যাপারে কোনোভাবেই অংশগ্রহণ করবে না।

যে স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞের কাছে মীনাক্ষী যেত তার কাছে সাপ্তাহিক পরীক্ষার জন্য একবার যেতে তিনি মীনাক্ষীর ব্যাপারে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলেন। কারণ জিজ্ঞেস করাতে তাকে বলা হল, 'শ্রীমতী মীনাক্ষী, আপনি কিন্তু ভাল নেই! সত্যিই আপনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন।'

'মোটেই নয়। আমার নিজেকে একটুও দুর্বল বলে মনে হয় না। আমি ক্লান্তও বোধ করি না, আমার ওজনও কমেনি।'

'হয়তো এখন আপনি সেটা বোধ করছেন না কিন্তু এটা যে সত্যি সেটা আমি তো জানি। একটা কাজ করা যাক। সব গণ্ডগোল মিটে যাবে যদি আপনি একটা ইঞ্জেকশন নিয়ে নেন।'

কিছু ভাল করে বোঝার আগেই মীনাক্ষীর হাতে ইঞ্জেকশন করে দেওয়া হয়। ব্যাপারটা তার যদিও ভাল লাগেনি তবুও সে চুপ করেই ছিল।

এরপর বাড়িতে ফেরবার এক ঘণ্টার মধ্যেই মীনাক্ষীর গর্ভপাত হয়!

নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে মীনাক্ষী বলল, 'প্রত্যেকদিন ওখানে যাওয়া নিয়ে তোমার মধ্যে আশাবরী যে অসন্তোষ রয়েছে সেটা কয়েকদিন ধরেই আমি লক্ষ্য করছি। তাই ঠিক করলাম যে নিজে এসে তোমাকে সাবধান করে দেব। তোমার বাচ্চা বাঁচবে কিনা সেটা ওদের ওপরেই নির্ভর করছে। এটা ভুলে যেওনা। বরং যতক্ষণ না প্রসব হচ্ছে ততক্ষণ নিজের ক্ষোভ তুমি চেপে রাখতে পারলেই ভাল।'

আশাবরী বলল, 'এটা তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। বাবা-মাকে না জানিয়ে, তাদের মত না নিয়ে, যে ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন ভ্রূণহত্যার কোনো অধিকার ওদের নেই!'

শেখর বলে উঠল, 'এরকম করার কোনো অধিকার তাদের নেই এবং ব্যাপারটা তারাও ভালভাবেই জানে। এই কারণেই ওরা কাউকে না জানিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে এটা করে।'

'কিন্তু কেন? এতে ওদের লাভ কি?'

শেখর বলল, 'এটা ঠিক যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে অনুপাত অসম হয়ে পড়লে নানারকম জটিল সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। কিন্তু একবার এ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিলে সেই নীতি এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে কেউ যদি সন্তান চায়ও তবুও সেই ভ্রূণকে হত্যা করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করা হয়। বাবা-মারা, বিশেষত মায়েরা এ ধরণের হত্যায় সম্মতি দিতে পারে না তাই ঐ কেন্দ্র তাদের অজান্তেই গর্ভপাতের ব্যবস্থা করে!'

'তাই যদি হয় তাহলে মীনাক্ষীর দ্বিতীয় সন্তানকে ওরা নষ্ট করল কেন? সে শুধু তর্ক করেছিল বলে? এত সামান্য একটা কারণে...'

'শুধু আমি তর্ক করেছিলাম বলে নয়, 'মীনাক্ষী ব্যাপারটা খুলে বলতে চেষ্টা করে।' শুধু আমি নয়, অন্য মেয়েরাও তর্ক করেছিল এবং তাদের আপত্তির কথা জানিয়েছিল। সঙ্গীতাও আমার মতই সমানভাবে প্রতিরোধ করেছিল। এই অসন্তোষ আমি যাতে আর না ছড়াতে পারি তাই আর বরদাস্ত না করে ওরা ঠিক করে যে মূল কারণটিই ধ্বংস করে ছাড়বে।'

আশাবরী জানতে চাইল, 'তাহলে মীনাক্ষী এত কিছুর পরেও তুমি ঐ কেন্দ্রে ফিরে এলে কেন?'

এক মুহূর্ত নিরুত্তর থেকে মীনাক্ষী বলল, 'আর কোথায়ই বা আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব ছিল?'

'কোনো বেসরকারী নার্সিং হোম-এ সরাসরি যেয়ে নাম লেখালে না কেন?'

চিন্তামগ্ন বিষণ্ণ মুখে মীনাক্ষী জবাব দিল, 'সে চেষ্টাও আমি করেছিলাম। কিন্তু এই শহরের প্রত্যেকটা হাসপাতাল ও প্রত্যেক ডাক্তারই ঐ কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রসবের জন্য প্রত্যেককেই ঐ কেন্দ্রের মাধ্যমে আসতে হয়। আমার শাশুড়ী আর আমি বহু হাসপাতালে ঘুরেছি। দু সপ্তাহ ধরে আমরা নানা জায়গায় চেষ্টা করেছি কিন্তু সকলেই আমাদের ঐ কেন্দ্রে যেতে বলেছে। তাই ওখানে নাম লেখানো ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না।'

যেন ক্লান্ত হয়ে ওরা তিনজনই নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছিল। শেষে মীনাক্ষী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এবার আমাকে উঠতে হবে। তুমি কিন্তু আমার কথাটা শুনে চললে ভাল করবে আশাবরী। ওরা যেন তোমার অসন্তোষ টের না পায়। পেলে তোমার কোনো লাভই হবে না। বরং অসন্তোষ প্রকাশ করলে তোমার যে গর্ভস্থ শিশু তাকেই তুমি বিপদের মুখে ঠেলে দেবে।'

মীনাক্ষী চলে গেল। সমস্যাটা নিয়ে শেখরও আশাবরী অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করল। কেন্দ্রের ব্যাপারে ভবিষ্যতে যে কি করবে এ বিষয়ে আশাবরীর একটা পরিকল্পনার ছক করার দরকার ছিল। মীনাক্ষীর কথাগুলোই বা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য সেটাও তো বিচার করা দরকার। এমনও তো হতে পারে যে দুবারই অন্য কারণে তার গর্ভপাত হয়েছিল। কোনো কোনো মেয়ের গর্ভপাত হয়ে যাওয়ার দিকে একটা ঝোঁক থাকে। কেন এমন হয় তা স্ত্রীরোগ বিশারদরাও স্পষ্ট জানেন না। শেখর ও আশাবরী, দুজনেই এই ব্যাপারগুলো জানত।

পরবর্তী দিনদুয়েকের মধ্যেই মীনাক্ষী তাদের যা বলেছিল সে সম্বন্ধে তাদের সন্দেহ দূর হয়ে গেল। যে দুজন মায়ের মেয়ে হওয়ার কথা ছিল তারা বাসে আসা বন্ধ করল—দুজনেই নাকি 'গর্ভস্রাবের' শিকার হয়েছে!

আশাবরীর জানা ছিল না যে সে কি করবে। তাই সে কেন্দ্রে যেমন যাচ্ছিল তেমনই যেতে লাগল। ওরা যা করতে বলে তার কোনো বিরোধিতাও সে করত না। মীনাক্ষীর সঙ্গে কথা বলার পর থেকে তার আর কিছুতেই দুপুরবেলায় ঘুম আসত না। ঘুমের বদলে সে মন দিয়ে বার্তা প্রেরক যন্ত্রটিতে তার নিজের অস্ফুট কণ্ঠস্বর শুনত। অধিবেশনের প্রথম পর্যায়টি শেষ হল।

দ্বিতীয় পর্যায়টি শুরু হল। কয়েক দিন কাটল। একদিন আশাবরী হঠাৎ একটা পুরুষ কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। মীনাক্ষী যা যা বলেছিল হুবহু তাই ঘটছে। আশাবরী ও মীনাক্ষী একবার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ চাহনি বিনিময় করল। আশাবরী এটাও বুঝতে পারছিল যে মীনাক্ষীর পেটের ওপরে রাখা যন্ত্রটি থেকেও পুরুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

আশাবরী খুব মন দিয়ে সতর্ক হয়ে কণ্ঠটা শুনছিল। মীনাক্ষী যা যা বলেছিল সেই জিনিসগুলিই টেপে বার বার বাজানো হচ্ছে...কণ্ঠস্বরটিও যেন বেশ পরিচিতই...কোথায় যেন সে এই কণ্ঠস্বর শুনেছে? কারো সঙ্গে কথোপকথনের সময়? আশাবরী মনে করতে চেষ্টা করল...এবং সহসা তার মাথায় খেলে গেল যে এই কণ্ঠস্বর সে কারো কথাবর্তায় শোনেনি। এই কণ্ঠস্বর সে শুনেছে ভাষণে...কিন্তু কোথায়? হ্যাঁ! সেই ভাষণ...

সহসাই সবটা আশাবরীর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। কণ্ঠস্বরটি সে চিনেছে। আশাবরী ভাবতে চেষ্টা করে যে ব্যাপারটা কি ঘটছে!

সেইদিন শেখর কাজ সেরে ফেরার পর রাতের খাওয়াদাওয়া সারা অবধি আশাবরী নিজেকে সামলে রেখেছিল। শেখর যখন খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে তখন আশাবরী এসে তার পাশে বসল। তারপর ধীর গলায় বলল, 'আজকে আমিও বার্তা প্রেরক যন্ত্রে এক পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনেছি।'

খবরের কাগজটা ফেলে দিয়ে শেখর উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'কি?'

যা বলেছে আশাবরী আবার তার পুনরাবৃত্তি করল।

'...বাচ্চা, বেজন্মা...,' শেখর পর পর কয়েকটা গালিগালাজ করে বসল। 'যথেষ্ট হয়েছে আশাবরী! আমাদের ছেলেকে অদ্ভুত একটা কণ্ঠস্বর শোনানোর, তার কানের মধ্যে সেটা ঢুকিয়ে দেবার কোনো অধিকার ওদের থাকতে পারে না। ওদের আমি এর জন্য ছাড়ব না। কালই আমি তোমার সঙ্গে ঐ কেন্দ্রে যাব। গিয়ে ঐ ড: মানের কলারটা চেপে ধরব। দেখি, কে আমাকে ঠেকায়!'

আশাবরী ফিসফিস করে বলল, 'শেখর আমি কণ্ঠস্বরটা চিনতে পেরেছি...'

'কার কণ্ঠস্বর?'

'আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠস্বর।'

'আমাদের প্রধানমন্ত্রী? ...তুমি ঠিক বলছ?'

'হ্যাঁ!'

শেখর বেশ চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ল। আশাবরী বলল, 'এসব কি যে হচ্ছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ওরা কি চায়? আমার কাছে গোটা ব্যাপারটাই অনৈতিক। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এটা জোর করে করা হচ্ছে। আমি একজন উদ্ভট মানুষের জন্ম দিতে চাই না। সে যদি পৃথিবীর মহত্তম ব্যক্তি হয় তাহলেও না। কি করে আমার শিশুর ওপরে ওরা এটা করতে পারে? এটা জঘন্য, কদর্য একটা ব্যাপার। শেখর, তুমি কি আমার কথা শুনছ?'

'আমি ঠিকই শুনছি আশাবরী। আমার কাছেও গোটা ব্যাপারটা ঘৃণ্য। কিন্তু এমন সুচিন্তিতভাবে, হিসেব করে ব্যাপারটা ফাঁদা হয়েছে যে এর মুঠোর থেকে বেরোনো খুবই মুশকিলের। কেন্দ্রে তুমি যে ফর্মটিতে সই করেছিলে সেটা পড়ে দেখেছিলে?'

'না। আমি শুধু কিছু তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, বয়স ইত্যাদি লিখে স্বাক্ষর করে দিয়েছিলাম।'

'এমনকি আমিও ফর্মের শর্তগুলো পড়ে দেখিনি। ভেবেছিলাম যে ওটা নিছকই নিয়মরক্ষার ব্যাপার। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে যে ওটা এত সহজ কিছু নয়। তাদের চিকিৎসা একবার যখন তুমি মেনে নিয়েছ তখন সেটা বন্ধ করা খুবই কঠিন হবে।'

'কিন্তু আমি একেবারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি। যাই ঘটুক না কেন কাল থেকেই আমি ঐ কেন্দ্রে আর যাব না!'

'আশাবরী লক্ষ্মীটি, এখনই ওরকম চূড়ান্ত কিছু করে বোসনা। যদি একটা রাস্তা বের করতেই হয় তাহলে সেটা ভালভাবে ভেবেচিন্তে স্থির করতে হবে। ঝোঁকের বশে কিছু করে বসা আমাদের ঠিক হবে না।'

'তাহলে কি করব আমি?'

'যেমন যাচ্ছ তেমন তুমি কেন্দ্রে যাবে। এদিকে আমরা একটা রাস্তা খুঁজে বের করব।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আশাবরী কেন্দ্রে যেতে থাকে। চারদিন কেটে গেল। পঞ্চম দিনে সে তার শিশুকে যা শোনানো হচ্ছে সেটা নিজে শুনতে পেয়ে আর ধৈর্যের বাঁধ বজায় রাখতে পারল না। শেষ অবধি কোনোমতে কাটিয়ে সে তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে এল। এসেই সে শেখরকে ফোন করে বলল তার শরীর খারাপ লাগছে। শেখর যেন অবিলম্বে বাড়িতে চলে আসে।

শেখর বাড়িতে ফিরে দেখল আশাবরী নিথর হয়ে বসে আছে। যেন নিঃশ্বাসও পড়ছে না। এমন কি সে পায়ের জুতোও ছাড়েনি। আশাবরীর মধ্যে সে কি পরিমাণে উত্তেজনার বারুদ জমে আছে সেটা শেখর আঁচ করতে পারল...

শেখর জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, আশাবরী?'

'আমি জানতে চাই যে আমার যে বাচ্চাটা হতে চলেছে সেটা তোমার না প্রধানমন্ত্রীর?'

শেখর যেন একটা ঝাঁকুনি খেল। বলল, 'এ তুমি বলছ কি আশাবরী!'

'আমি তোমাকে সত্যি কথাই বলছি। এই কেন্দ্রে যদি আমি আর যেতে থাকি তাহলে জানবে অচিরেই আমাদের ছেলে আমাদের চিনতে অবধি রাজী হবে না। এই বাড়িতে সে জনৈক অপরিচিতর মত বড় হবে। তারপর বয়স হলেই সে মনে করবে যে আমরা একেবারেই ফালতু এবং তখন সে ঠাণ্ডা মাথায় গট্‌গট্‌ করে বেরিয়ে চলে যাবে।'

'তা কি করে হয়?'

'কেন্দ্র-র চেষ্টা হচ্ছে সেটাই যেন হয়। তুমি জানো যে বাচ্চাকে আজ কি শোনানো হয়েছে?'

'কি?'

'আমাদের মহাজ্ঞানী প্রধানমন্ত্রী, যিনি আমাদের বাচ্চার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অবহিত নন, তিনি তাকে বলছিলেন যে তিনি আমাদের সকলের রক্ষাকর্তা। তাঁর কণ্ঠস্বরে বলা হচ্ছিল, 'আমি তোমার পিতা, মাতা, অভিভাবক এবং এমনকি তোমার মালিকও বটে। তুমি শুধু আমার প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে, আর কারো প্রতি নয়। প্রত্যেক

নাগরিককে কেবলমাত্র সরকার ও আমার প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্যের শপথ নিতে হবে।' শেখরের মুখে কথা সরছে না। আশাবরী বলে চলে, 'বাচ্চাকে যদি ন মাস ধরে এইভাবে চিন্তা করতে শেখানো হয় তাহলে কাকে সে বাবা বলে মনে করবে সে বিষয়ে তোমার কিছু বলার আছে? আমাদের ছেলের সঙ্গে হয়তো চেহারার দিক দিয়ে তোমার বা আমার মিল থাকবে কিন্তু তার মন, তার মস্তিষ্ক সবকিছু হবে অন্যের সম্পত্তি। আর তার পরে আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন ওর মনোজগৎ থেকে ওসব আমরা কিছুতেই মুছে দিতে পারব না কারণ ঐ চিন্তাগুলো তার চিন্তার প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে। আমি কিছুতেই একজন অচেনা লোকের সন্তানের জন্ম দেব না...আমি কিছুতেই পারব না...', আশাবরী কান্নায় ভেঙে পড়ে।

তাকে এইভাবে কাঁদতে দেখে শেখর কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিল, 'কেঁদোনা আশাবরী। আমিও চাই না যে আমাদের অমন সন্তান হোক। কাল থেকে তোমাকে আর ঐ কেন্দ্রে যেতে হবে না।'

পরের দিন আশাবরী আর কেন্দ্রে গেল না। নিজেকে তার খুবই নিরুদ্বেগ লাগছিল কিন্তু অদ্ভুতভাবে কেন্দ্রের অভাবটিও সে বোধ করছিল। সে তার রুটিনমত ব্যায়াম করল, খেল এবং অল্প কিছুক্ষণ ঘুমিয়েও নিল। এরকমই কেন্দ্রে করা হত। আশাবরী ঠিক করল যে বাড়িতে ঐ নিয়মগুলো মেনে চলে সে স্বাস্থ্য ভাল রাখবে।

দুদিন পরে, সকালে, বাড়িতে 'নেতা' এসে হাজির। শেখর তখনও কাজে বেরোয়নি। 'নেতা' তাদের সঙ্গে এক কাপ চা খেল। শেখর ও আশাবরীর সঙ্গে খোশগল্পও করল। শেখর তাকে বলল যে দুদিন ধরে আশাবরীর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না বলে সে কেন্দ্রে যেতে পারেনি। শুনে 'নেতা' বলল, 'সেক্ষেত্রে আশাবরী, তোমার তো কেন্দ্রেই আসতে হবে। ওখানে তুমি পরীক্ষা করিয়ে নেবে। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাও শুরু হয়ে যাবে। দেরি না করে তুমি আজ থেকেই বরং চলে এস। ঠিক আছে, তাহলে ওখানেই দেখা হবে!' কিছুক্ষণের মধ্যেই 'নেতা' চলে গেল।

আশাবরী একেবারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে কিছুতেই আর কেন্দ্রে যাবে না। সকালের ঘরের কাজের পর্ব শেষ করে আশাবরী গেল ডঃ যোশীর কাছে। বেশ কয়েক বছর ধরেই তিনি শেখরের পরিবারের গৃহ-চিকিৎসক। কিন্তু ডঃ যোশী আশাবরীর নাম নথিভুক্ত করাতে রাজী হলেন না। আশাবরী তখন অন্য কয়েকটি নার্সিং হোমে গেল কিন্তু সব জায়গাতেই তাকে বিফল হতে হল। বিধ্বস্ত ও

হতক্লান্ত অবস্থায় সে বাড়ি ফিরে এল।

সেদিন সন্ধ্যায় শেখর ফিরতে আশাবরী তার বিফল প্রচেষ্টার কথা বলল। শেখর বলল, 'আমি জানি কারণ কয়েকদিন ধরে ঐ একই ব্যাপার আমার ক্ষেত্রেও ঘটেছে। কয়েকদিন ধরে আমি অফিসই যাচ্ছি না। বিভিন্ন মাতৃসদনের দরজায় দরজায় ঘুরেছি কিন্তু কোথাও সাড়া মেলেনি।'

'তাহলে আমরা এখন কি করব?'

'আমাদের প্রতিবেশী যে বৃদ্ধারা আছেন নিশ্চয়ই তাঁরা তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন।'

'সাহায্য তাঁরা অবশ্যই করবেন কিন্তু সহায়তা করা আর বাচ্চা হওয়ানোটা আলাদা ব্যাপার। আর ধরো যদি কোনো জটিলতার সৃষ্টি হয়? তখন তো ডাক্তার ছাড়া তুমি পারবে না।'

আরও তিনদিন কেটে গেল কিন্তু কোনো ডাক্তারই 'ভ্রূণ বিকাশ কেন্দ্রের' সঙ্গে মোকাবিলায় যেতে রাজী হলেন না। শেষে, কিছুদিন এই চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়ে শেখর ঠিক করল সে অফিসে যাবে। শেখর অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই একটি লোক আশাবরীকে বাড়িওয়ালার একটি চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিটা পড়ে শিউরে উঠল আশাবরী—এক মাসের মধ্যে বাড়ি খালি করে দেওয়ার নোটিস!

আশাবরীকে বিস্মিত করে শেখরও অফিস থেকে এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এল। একটাও কথা না বলে আশাবরী তাকে বাড়িওয়ালার নোটিসটি দিল। ভাবলেশহীন মুখে সেটা পড়ে শেখর আশাবরীকে ফেরত দিল। আশাবরী তখন অসম্ভব ক্ষুব্ধ। বলল, 'অন্যায় নোটিশটা দেখেও তোমার রাগ হচ্ছে না? এত বছর ধরে আমরা এখানে আছি। এইভাবে নোটিস ওরা কিভাবে আমাদের ধরাতে পারে? আর, কোনো কারণ ছাড়াই!'

জবাবে একটাও কথা না বলে শেখর আর একটা খাম আশাবরীর দিকে এগিয়ে দিল। অফিস থেকে জানানো হয়েছে যে টাকা পয়সার কারচুপির সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে তৎক্ষণাৎ শেখরকে সাময়িকভাবে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

'সে কি শেখর? টাকাপয়সা তছরূপ?'

'তুমি খুব ভাল করেই জান যে ওরকম কোনো কাজ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এইসব নোটিসের পেছনে আসল কারণটা তোমার চোখে পড়ছে না? ঐ কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াইতে নামার জন্যই সবকিছু হচ্ছে।'

'কিন্তু শুধু সেই কারণেই...'

'শোনো, ক্ষমতা যাদের দখলে তারাই ঐ কেন্দ্র চালায়। এবং কোনো রকম

প্রতিরোধ তারা চায় না। এবং কোনো প্রতিরোধ যদি আসে তাহলে তাকে আমূল ধ্বংস করে দেওয়ার মত ক্ষমতা ওদের আছে।'

'এখন তাহলে আমরা কি করব? বাড়িওয়ালা কি করে আমাদের বাড়ি ছেড়ে দিতে বলতে পারে? আমরা ঠিক সময়ে ভাড়া দিই, তার বাড়ি ঠিক মত ব্যবহার করি...'

'আইনত সে এটা করতে পারে না। কিন্তু ব্যাপারটা তুমি এইভাবে দেখতে চেষ্টা করো—ধরো আমার অবর্তমানে সে লোকজন পাঠালো এবং সরাসরি ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তারা আমাদের রাস্তায় বের করে দিল। তখন কিই বা আমাদের করার থাকবে। একইভাবে, আমার অফিসে আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো খাড়া করা হয়েছে সেগুলো যে মিথ্যা তা যথেষ্টই প্রমাণ করা যায়। এতে আমার কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু সেটা হওয়া অবধি আমার অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মত থাকবে।'

'আমরা তাহলে কি করব শেখর? আমি কি কেন্দ্রে ফিরে যাব?'

'না! কখনোই নয়!'

'তাহলে শেখর কি হবে আমাদের? থাকার জায়গা নেই, চাকরি নেই...' আশাবরীর গলায় কান্না জড়িয়ে আসে।

'একটা রাস্তা আমাদের বের করতে হবে। কিন্তু যাই হোক না কেন তুমি আর ঐ কেন্দ্রে ফিরে যাচ্ছ না। আমি সেরকম একটা ছেলে চাই না যে বাইরের কোনো লোকের কাছে মনের দিক থেকে বাঁধা পড়ে থাকবে। কতগুলো কম্পিউটার মানুষের জন্য পরিকল্পিত এই 'মানসিক উন্নয়ন' কর্মসূচীর সুবাদে নতুন প্রজন্ম হবে প্রধানমন্ত্রীর হাতে সুতোয় বাঁধা একদল পুতুল। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের জন্য তারা হাঁ করে বসে থাকবে। বাঁচতে বললে বাঁচবে। মরতে বললে মরবে। এরকম দম দেওয়া কলের পুতুল আমি চাই না। আর, এ ছাড়াও, ধরো ঐ প্রধানমন্ত্রী যদি ক্ষমতাচ্যুত হয়? অন্য কেউ যখন ক্ষমতা দখল করবে তখন ঐ পুতুলদের কি দশা হবে? তারা তখন হয় জড়বুদ্ধি হয়ে বসে থাকবে বা দিগ্‌ভ্রান্ত নোঙরহীন জাহাজের মত ঘুরে বেড়াবে। মহাগলাবাজের কাছে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা তো তারা সমর্পণ করে বসে আছে, কোনো রাস্তা তখন তারা খুঁজে পাবে না। আমি চাই না যে আমাদের ছেলে ওরকম দুর্বল ও নিস্তেজ হোক।'

'কিন্তু এই ফাঁদ থেকে আমরা বেরোব কি করে? যে ব্যবস্থা আমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায় তার ক্ষমতা তো অন্তহীন। আমার ভয় করছে, শেখর!'

'ভরসা হারিও না আশাবরী। ভয় যেন আমাদের কাবু না করে ফেলে। রাস্তা আমরা একটা খুঁজে পাবই।

যাই হোক না কেন আমাদের ছেলে এটা দাবি করতে পারে যে সে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে জন্মগ্রহণ করবে এবং সেরকমই জীবন যাপন করবে।'

'শেখর আমরা তার জীবন নিয়ে খেলা করছিনা তো? চারপাশের দুনিয়াটাকে শত্রু করে তুলে একা একটা লড়াই চালানো সহজ কথা নয়।'

'ঠিক আছে, এই লড়াই-এর জন্য হয়তো নির্দিষ্ট দাম দিতে হবে। এক একসময় এর জন্য কষ্ট হবে ঠিকই কিন্তু কাজটা করা যথার্থই হবে। স্বাধীনতার সুখ, কষ্ট ও চরম আনন্দ—সবই আমাদের ছেলের পাওয়া উচিত। আশাবরী, সুখ ও দুঃখ, দুটোই তার কাছে গ্রহণীয় হবে কারণ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণের মাধ্যমে সে এগুলো উপার্জন করবে।'

মুগ্ধ আশাবরীর মুখে কথা আসে না। শেখর সমস্যাটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছে এবং সে যা ভেবেছে তা রক্ষা করার জন্য সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে একা দাঁড়াতেও সে রাজী।

হঠাৎ তাদের কথার মধ্যে ছেদ ঘটিয়ে তীক্ষ্ণ শব্দ করে টেলিফোন বেজে উঠল।

প্রথম কথার থেকেই আশাবরী বুঝতে পারল যে এটা কেন্দ্র থেকে ড: মানের ফোন।

শেখর বলল, 'হেলো, ড: মানে! না, আশাবরী আপনার ঐ কেন্দ্রে যাবে না...ও খুব ভালই আছে। চমৎকার আছে, ধন্যবাদ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার যা ইচ্ছা আপনি করতে পারেন। ওসব শাসানির তোয়াক্কা আমি করি না...আপনি, আপনার কেন্দ্র, আপনার মহানেতা—সব জাহান্নামে যাক! আপনারা প্রত্যেকে হলেন এক একটি ঠগ। আপনার মত ইতর প্রাণীর সঙ্গে কথা বলার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই।' রিসিভারটা রেখে শেখর হো হো করে হেসে উঠল। আশাবরী ভেবেই পাচ্ছিল না যে এই অবস্থাতেও শেখর হাসতে পারে কি করে?

শেখর বলল, 'এসো, এবার একটু চা খাওয়া যাক।'

আশাবরী তো অবাক, 'চা!'

'হ্যাঁ, চা! আমাকে চমৎকার এক কাপ চা করে দাও তো। মাথায় একটা দারুণ পরিকল্পনা এসেছে। সেটা তোমাকে বলার আগে একটু ভেবে নিই। ড: মানের সঙ্গে কথা বলার সময় হঠাৎ ব্যাপারটা মাথায় এল।'

আশাবরী চা তৈরি করতে লাগল। তখন শেখর তাকে তার পরিকল্পনাটা বলল। মহারাষ্ট্রের তাসগাঁও বলে এক গ্রামে শেখরের দূর সম্পর্কের এক কাকার একটা খামার আছে। কাকী মারা গেছেন। কাকা তাঁর মা-র সঙ্গে থাকেন। তাসগাঁও হল ছোট্ট একটা অজ পাড়াগাঁ। তার লোকসংখ্যাও এত কম যে সেখানে 'ভ্রূণ বিকাশ

কেন্দ্র থাকার প্রশ্নই ওঠে না। দেশে এখনও এমন কয়েকটা গ্রাম রয়েছে যেখানে ঐ কেন্দ্র এখনও পৌঁছয়নি। এইসব গ্রামের মেয়েদের সরকার বলে তালুকের যে 'কেন্দ্র' রয়েছে সেখানে যেতে। কিন্তু তারা বেশির ভাগই চায় যে তাদের বাচ্চা গ্রামের ধাই মায়ের সাহায্যে বাড়িতেই হোক। শেখরের যতদূর মনে পড়ে তাসগাঁওতে দু'তিনজন ধাই মা থাকার কথা।

'আমরা যদি তাসগাঁও-তে যাই তাহলে ঠিক কাকা আমাদের সব ব্যবস্থা করে দেবেন। আমার ঠাকুমাও খুব স্নেহশীলা ও স্বাধীনচেতা মানুষ। তিনিও নিশ্চয়ই আমাদের সহায়তা করবেন। আর, কোনো কারণে সেটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে থাকার জন্য একটা জায়গা আমরা ভাড়া করে নিতে পারব।'

আচমকা একটা দূরবর্তী গ্রামে চলে যাওয়া সহজ কথা নয়। অথচ সামনে আর রাস্তাই বা কোথায়? আশাবরীর বাবা-মার কাছে যাওয়া সম্ভব নয় কারণ আশাবরীর বাবা সরকারী চাকুরে। এতে তাঁর ক্ষতি হতে পারে সেটা শেখর বা আশাবরীর কাম্য নয়। শেখরের বাবা তার ছোটবেলাতেই মারা যান। শেখরের ভাই-এর কাছে তার মা থাকেন।

আশাবরীকে চিন্তামগ্ন দেখে শেখর বলল, 'আশাবরী, আমরা লড়াইটা শুরু করে দিয়েছি। এখন এর থেকে সরে আসা যায় না। তাসগাঁওতে থাকাটা সহজ হবে না ঠিকই। সামনে একটাই কঠিন রাস্তা কিন্তু...'

'আমি তো কখনও বলিনি যে লড়াই থেকে সরে আসতে হবে!' আশাবরী শেখরকে মাঝপথে থামিয়ে দেয়। 'আমি তাসগাঁওতে যেতে প্রস্তুত। এসো, সব গুছিয়ে নেওয়া যাক। যত শীঘ্র ততই মঙ্গল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই জায়গাটা থেকে আমাদের চলে যাওয়া উচিত।'

তাসগাঁও-তে বিশাল প্রাসাদের মত বাড়িটার উঠোনে শেখরের কাকা বসেছিলেন। শেখরও সেখানে বসে ছিল। এটা সেটা বলে চেষ্টা করছিল নিজের উত্তেজনাটা চাপা দেবার। ধাই মা এসে গেছে। ভেতরে আশাবরী, ঠাকুমা ও ধাই মা। গত দু'মাস ধরে তাসগাঁওতে কাকার বাড়িতে ওরা রয়েছে। সাদরে তাদের বুকে টেনে নেওয়ার জন্য কাকার কাছে শেখর কৃতজ্ঞ। তিনি সমস্যাটাও উপলব্ধি করেছিলেন। ওদিকে আশাবরীর প্রতি ঠাকুমার যত্নআত্তির তো অন্ত নেই—তার খাওয়া, বিশ্রাম সবকিছু ঠাকুমা দেখছেন। এমনভাবে আশাবরীকে ভালবেসেছেন যে সে এটাকে

নিজের বাড়িই করে নিয়েছে। এখন সেই সময় এসেছে যার জন্য তাদের দীর্ঘকাল কেটেছে অপেক্ষায়। শেখরেরা যত অসুবিধা ভোগ করেছে সব পুষিয়ে যায় যদি নিরাপদে প্রসবটা হয়ে যায়।

শেখর এইসব সাতপাঁচ ভাবছিল। হঠাৎ সে একটা শিশুর কান্না শুনতে পেল।

অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে উঠেছিল শেখর। কাকা হেসে স্নেহভরে বললেন, 'আরে বোস্, বোস্। তোর ছেলে হয়েছে...আমি বলছি দেখে নিস, ছেলে হয়েছে...'

শেখর হেসে বসে পড়ল। সে আগে থেকেই জানত যে তার ছেলে হবে। কিন্তু বাচ্চাটি কি ভাল আছে? কেমন আছে আশাবরী?

কিছুটা সময় কেটে যাবার পরে শেখর শুনল ঠাকুমা ডাকছেন, 'আয়, এবার তোরা ভেতরে আয়।'

শেখর ও তার কাকা ভেতরে ঢুকল। জায়গাটা ওরা ইতিমধ্যেই পরিস্কার করে ফেলেছে। একটু ফ্যাকাসে হলেও আশাবরীকে খুব আনন্দিত দেখাচ্ছিল। আনন্দে তার মুখটি উজ্জ্বল। ঠাকুমার কোলে সদ্যোজাত শিশু।

ঠাকুমা বললেন, 'নে, দেখ্ তোর ছেলের মুখটা। বেশ গাঁট্টাগোঁট্টাই হয়েছে, কি বলিস? এইরকম যেন থাকে। জন্মাবার জন্যে বেচারাকে কি লড়াইটাই না করতে হয়েছে!'

শেখরের বুকটা গর্বে ও সদ্যোজাত ছেলের জন্য স্নেহে ভরে উঠল। সকলেই যেন তাদের প্রচেষ্টার জন্য আজ যোগ্য পুরস্কার লাভ করেছে।

এক নতুন সত্তার জন্ম হল।

একজন স্বাধীন মানুষের জন্ম হল।

নীলবর্ণ বিড়াল

অনীশ দেব

রাকেশ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নীলবর্ণ শৃগালের স্বপ্ন দেখছিল।

কাল রাতেই সদ্য-সদ্য গল্পটা পড়েছে ও। আচমকা নীলের গামলায় পড়ে গিয়ে নীল রঙের চেহারা হয়ে গিয়েছিল বেচারা শেয়ালটির। তারপর যখন সে জঙ্গলে ফিরে গেল তখন সমস্ত পশু-পাখি তাকে জঙ্গলের রাজা বলে মেনে নিল। কারণ নীল রঙের শেয়াল তো তারা জীবনে কখনও দেখেনি। অতএব সেই অদ্ভুত রঙের প্রাণীটিকেই তারা সকলে মেনে নিয়েছিল বনের রাজা বলে।

রাকেশ দেখছিল, একটা নীল রঙের শেয়াল ওকে এসে ডাকছে, 'রাকেশবাবু, আমি কিন্তু গল্পের শেয়াল নই। সত্যিকারের নীল রঙের শেয়াল।'

রাকেশ অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি?'

শেয়ালটা বলল, 'সত্যি।'

আর তারপরেই রাকেশকে হতভম্ব করে দিয়ে 'মিঁউ, মিঁউ করে ডেকে উঠল।

শেয়াল মিঁউ মিঁউ করে ডাকছে। রাকেশ চমকে উঠল। আর তক্ষুনি ওর ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুম ভাঙতেই দেখল বিছানায় ওর কোলের কাছে গুটিসুটি মেরে বসে আছে একটা নীল রঙের বেড়াল। 'মিঁউ, মিঁউ করে ডাকছে কাচের গুলির মতো নীল চোখ জোড়া জুল-জুল করে রাকেশেরই দিকে তাকিয়ে। সরু ঝাঁটার কাঠির মতো নীল রঙের গোঁফ। গায়ের রঙ গাঢ় নীল। শুধু লেজের ডগায় খানিকটা কালো ছোপ।

রাকেশ ভাবল, ওর স্বপ্নের ঘোর বোধহয় এখনও কাটেনি। চিমটি কেটে একবার দেখি তো! যেমন ভাবা তেমনি কাজ। কিন্তু চিমটি কাটতে গিয়েই আবার অবাক্। এ কী! ওর ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ এরকম নীল হয়ে গেল কেমন করে! তারপরই বাকি দুর্ঘটনাগুলো একে একে রাকেশের চোখে পড়ল।

ঘরের দেওয়াল, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, টেবিল-চেয়ার, ফ্যান, ঘরের

মেঝে—সর্বত্র শুধু নীল আর নীল! কোনওটার রঙ উজ্জ্বল নীল, কোনওটা ঘোলাটে নীল, কোনওটার রঙ কালচে নীল, আবার কোনওটা স্রেফ কুচকুচে কালো।

বিছানার বেড়ালটা তখনও 'মিঁউ, মিঁউ করে ডেকে চলেছে।

রাকেশ ধড়মড় করে উঠে বসল। পাশে মা নেই। অনেকক্ষণ আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন। এখন নিশ্চয়ই রান্নাঘরে। রাকেশের কান্না পেয়ে গেল। কোনওরকমে চিৎকার করে ও ডেকে উঠল, 'মা, মা!'

মা ছুটে এলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

মাকে দেখে রাকেশের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল—কালচে নীল গায়ের রঙ। চোখের তারাটুকু শুধু কালো, বাকি অংশটা উজ্জ্বল নীল। ঝকঝকে দাঁতেরও একই দশা। অবশ্য মাথার চুলগুলো কুচকুচে কালো। যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে।

বিছানা থেকে নেমে এক ছুটে মা-কে গিয়ে জাপটে ধরল রাকেশ। শাড়ির ভাঁজে মুখ লুকিয়ে জড়ানো গলায় বলল, 'এ-সব কী কাণ্ড, মা? আমি কি ভুল দেখছি?'

মা ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'না রে, তোর চোখের ভুল নয়, আমরা সব্বাই ওই নীল রঙেরই সবকিছু দেখছি। সকালে ঘুম ভেঙেই দেখি এই দশা। তবে ভয়ের কিছু নেই। একটু আগেই রেডিওতে আর টিভি-তে বলেছে, সারা পৃথিবী জুড়েই নাকি একই রকম কাণ্ড হয়েছে। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মায়ের কথায় রাকেশ বিশেষ ভরসা পেল বলে মনে হল না। ও বিছানায় বসা বেড়ালটাকে দেখিয়ে বলল, 'ওই দ্যাখো—'

মা হাসলেন, বললেন, 'ওটা তো তোর মিনু। রঙ পালটানোর ধাক্কায় ওর রঙও ওরকম নীল হয়ে গেছে। নে, এবার হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বোস্ দেখি—'

মা-কে রোজকার মতো সহজ স্বাভাবিক দেখে রাকেশের বিস্ময় আর আতঙ্ক আস্তে আস্তে কাটতে লাগল। মা ব্যস্তভাবে রান্নাঘরে চলে যেতেই ও টুথব্রাশে খানিকটা টুথপেস্ট লাগিয়ে নিল। টুথব্রাশের রঙ এমনিতেই নীল ছিল। অতএব ওটার রঙে তেমন রদবদল হয়নি। কিন্তু সাদা টুথপেস্ট একেবারে গাঢ় নীল রঙের হয়ে গেছে।

মুখ ধুতে বেসিনের কাছে গিয়ে রাকেশ যথারীতি আবিষ্কার করল সাদা ওয়াশ বেসিন ঘন নীল। এতক্ষণে ওর ভয়টা কেটে গিয়ে বেশ একটা মজা টগবগ করে উঠল। হাত-মুখ ধুয়ে ও এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে লাগল।

মা রান্না ছেড়ে টানা বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে পাশের বাড়ির টুকির মায়ের সঙ্গে গল্প করছিলেন। হাসাহাসিও করছিলেন দুজনে।

রাকেশ শুনল, পাশের বাড়ির মাসিমা বলছেন, 'দিদি, ভাতের আজ যা চেহারা হয়েছে, টুকির বাবা ভাত খেয়ে অফিস গেলে হয়।'

সত্যিই তো, নীল রঙের ভাত খাওয়া কি আর চাট্টিখানি ব্যাপার! রাকেশ ভাবল।

মা তখন বলছেন, 'আমারও তো একই অবস্থা, ভাই। ভাত, ডাল, হলুদ, লঙ্কা সব যে একেবারে ভোল পালটে ফেলেছে।'

টুকির মা-কে বেশ চিন্তিত মনে হল। উনি বললেন, 'রাতারাতি এ কেমন ভোজবাজি হল বলুন তো, দিদি! আমার তো ব্যাপার-স্যাপার সুবিধের ঠেকছে না।'

মা বললেন, 'একটু আগেই রেডিওতে বলেছে, বিজ্ঞানীরা এটা নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছেন। শিগগিরই এর সমাধান করে দিলেন বলে—'

রাকেশ আর দাঁড়াল না। ছুট-পায়ে চলে এল রাস্তার দিকের ঝুলবারান্দায়। ওমা! একী! আকাশে যে সূর্যটা উঠেছে সেটার রঙও যে ঘন নীল! আকাশের নীল রঙের সঙ্গে ওটা প্রায় মিশে গেছে। আর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে নীল রোদ্দুর। যে কটা গাছপালা দেখা গেল সবই নীল। শুধু কালো রঙের কাকগুলো নীলরঙা টিভি-অ্যানটেনার ওপরে বসে একই রকমভাবে 'কা-কা' করে ডাকছে।

রাকেশ মুগ্ধ চোখে চারদিকে দেখতে লাগল।

একটু পরেই মা বারান্দায় এসে হাজির। হাতে এক গ্লাস দুধ। ওকে ডেকে বললেন, 'নে, রাকা, চটপট খেয়ে নে দেখি। উনুন জ্বলে যাচ্ছে।'

রাকেশ ব্যাজার মুখে দুধের গ্লাস হাতে নিল। নীল রঙের দুধ! মায়ের দিকে মুখ তুলে আবদারের গলায় বলল, 'তুমিই বলো মা, এরকম দুধ কেউ খেতে পারে?'

মা ব্যস্তভাবে বললেন, 'পারে পারে, খুব পারে! যদি সব কিছুর রঙ এরকমটাই থেকে যায়, আর আগের মতো ফিরে না আসে, তাহলে অবস্থাটা কী হবে শুনি! নীল রঙের দুধ, ভাত, সবই তো খাওয়া অভ্যেস করতে হবে, তাই না? মানুষ তো আর না খেয়ে থাকতে পারবে না! নে, তুই চটপট খেয়ে গ্লাসটা বেসিনের কাছে রেখে দিস, আমি যাই—'

মা ব্যস্ত পায়ে চলে যাচ্ছিলেন, রাকেশ জিজ্ঞেস করল, 'বাবা এখনও আসেনি?'

মা বললেন, 'উহুঁ। প্রায় এক ঘণ্টা তো হয়ে গেল বাজারে গেছে। মনে হয় বাজারে আজ হৈ-চৈ পড়ে গেছে। নে, দুধটা জলদি খেয়ে নে—'

মা হুউশ্ করে চলে গেলেন।

রাকেশ অতি সাবধানে দুধের গ্লাসে একটা চুমুক দিল। মাগো! কী রকম গা

গুলোচ্ছে। কিন্তু দুধের স্বাদটা একই রকম আছে। শুধু রঙ পালটে গেলেই খাওয়ার ইচ্ছেটা পালটে যায় কেন কে জানে! নইলে রাকেশ তো দুধ খেতে ভালই বাসে।

মিনু কখন যেন বিছানা ছেড়ে নেমে এসে পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছিল আর ডাকছিল 'মিঁউ, মিঁউ করে। বোধহয় দুধের গন্ধ পেয়েছে। ওকে খানিকটা দুধ দিয়েই দেখা যাক তো, খায় কি না। গ্লাস থেকে কিছুটা দুধ মেঝেতে ঢেলে দিল রাকেশ। ঠিক মিনুর সামনে। কিন্তু দেখল বেড়ালটা প্রথমে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল।

বাবার কাছেই রাকেশ শুনেছে কুকুর, বেড়াল, গোরু, মানুষের মতো বর্ণালির সাত রঙ দেখতে পায় না। এমন-কী লাল কাপড়ের টুকরো দেখিয়ে স্পেনে যে ষাঁড়ের লড়াই হয় সেখানে ষাঁড় মোটেই লাল কাপড় দেখে খেপে ওঠে না। সে বেচারা কাপড়টাকে দেখে গাঢ় ছাই রঙের। আসলে কাপড়ের টুকরোটার দ্রুত নড়চড়াতেই সে খেপে উঠে ওটাকে তাড়া করে।

সুতরাং হিসেব মতো মিনুও নিশ্চয়ই দুধটাকে এখন কালো রঙের দেখছে। কারণ ওর পক্ষে তো আর নীল রঙ দেখা সম্ভব নয়। হয়তো সেই জন্যেই ও দুধটার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে।

অবশেষে ঘ্রাণশক্তিরই জিত হল। গন্ধে গন্ধে জিভ বাড়িয়ে মেঝেতে পড় থাকা দুধের স্বাদ নিল মিনু। তারপর 'চক-চক' শব্দে গোটা দুধটাই চেটেপুটে সাফ।

মিনুর দেখাদেখি চোখ বুজে অতি কষ্টে গ্লাসের দুধ শেষ করল রাকেশ। তারপর একটু জল খেয়ে গ্লাস মায়ের কাছে রেখে এসে পড়ার বই নিয়ে বসল।

ইতিহাস বই খুলেই রাকেশ বুঝল পড়াশোনা করা মোটেই সম্ভব নয়। কারণ বইয়ের গাঢ় নীল রঙের পৃষ্ঠায় খুদে খুদে কালো অক্ষরগুলো ভাল করে দেখতে পাওয়াই মুশকিল। রাকেশ মনমরা হয়ে প্রত্যেকটা বই আর খাতার পৃষ্ঠা উলটে উলটে দেখতে লাগল। দূর ছাই, স্কুলে গিয়ে তাহলে আর কী হবে! বই ছেড়ে উঠে বাবার টেবিল থেকে ট্রানজিস্টার রেডিওটা নিয়ে এল ও। সুইচ অন্ করে নব ঘুরিয়ে কান পাতল। সঙ্গে-সঙ্গেই শুনতে পেল বিশেষ ঘোষণা ঃ '...সেই কারণেই সব কিছু বিবেচনা করে রঙের অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত স্কুল-কলেজ, সরকারি-বেসরকারি সমস্ত প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, বিজ্ঞানীরা এই আশ্চর্য ঘটনা নিয়ে দ্রুত গবেষণা করছেন এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। জনসাধারণের নিরাপত্তার কথা ভেবে সবরকম যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার জন্য সরকার অনুরোধ

জানিয়েছেন...'

সুইচ টিপে রেডিও অফ করে দিল রাকেশ। সামান্য রঙের রকমফেরের জন্য এ কী কাণ্ড হল।

এমন সময় ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন। রাকেশকে বললেন, 'রাকা, তোমার ইস্কুল ছুটি।'

রাকেশ দেখল, বাবার পরনে নীল আদ্দির কাপড়ের পাঞ্জাবি, নীল ধুতি। গায়ের রঙ কালচে-নীল।

পাঞ্জাবি খুলে হ্যাঙারে টাঙিয়ে রাখতে রাখতে বাবা আবার বললেন, 'বাজারে তো একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড। অদ্ভুত-অদ্ভুত রঙের সব জিনিস বিক্রি হচ্ছে ঃ নীল ফুলকপি, নীল রজনীগন্ধা, আর মাছের বাজারে কালো-কালো পোনা মাছের টুকরো।'

'কেন, কালো রঙের কেন?' রাকেশ জানতে চাইল।

বাবা হেসে বললেন, 'হবে না? রক্তের রঙই যে কুচকুচে কালো হয়ে গেছে! এছাড়া বাজারে শুনলাম, গাড়ি-ঘোড়া, স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারি সব নাকি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। এইমাত্র রেডিওতে বলেছে।'

'কই দেখি, রেডিওটা দে তো—'

রাকেশ রেডিওটা বাবাকে দিল। তারপর বইপত্র গুছিয়ে রেখে আবার ঝুলবারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

উলটোদিকের বাড়ির ছাদে তিনটে গাঢ় নীল রঙের পায়রা বসে ছিল। ও-বাড়ির তপনদা পায়রা পোষে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে রাকেশ ভাবছিল ঃ সত্যি, কী অদ্ভুত ব্যাপার! সূর্যের সাত রঙের ছ-ছটা রঙ উধাও হয়ে যাওয়ার জন্য কী বিপত্তি। সারা পৃথিবীর জীবনযাত্রা একেবারে অচল। রাস্তাঘাটে গাড়ি চালানোও বিপজ্জনক। চারদিকে শুধু নীল রঙ অথবা কালো রঙ। আর তা নইলে তাদের কমবেশী মিশেল দিয়ে তৈরি কোনও নীলচে রঙ। এই ধরনের পরিবেশে গাড়ি চালাতে গিয়ে অভ্যেস না থাকায় ড্রাইভাররা হয়তো অ্যাক্সিডেন্টই করে বসবে। সেই জন্যেই রেডিওতে যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়েছে।

সিনেমা হলগুলোও বন্ধ থাকবে নিশ্চয়ই। নীল ছাড়া বাকী সব রঙ উধাও হয়ে গেলে রঙিন ছবির আর বাকি থাকল কী! আবার সাদা-কালো সিনেমাতেও একই বিপদ! সাদা রঙ বলে কিছু থাকবে না। তার বদলে শুধু নীল আল নীল! ঠিক টিভির মতোই দশা!

যতদিন রঙগুলো ছিল ততদিন বোঝা যায়নি সেগুলো কত জরুরি। বোঝা

যায়নি, সেগুলো না থাকলে লাগাতার বন্ধ শুরু হয়ে যাবে মানুষের জীবনে। এখন দিনগুলো কাটবে কেমন করে সেই নিয়েই রাকেশের চিন্তা।

বিকেলবেলায় বাবার কাছে শুনল কলকাতার সমস্ত রঙ কোম্পানি নতুন কোনও ব্যবসা খোলার কথা ভাবছে। নানান দোকানে তাদের যত রঙ ছিল সব ভোল পালটে নীল অথবা কালো হয়ে গেছে। এদিকে বুড়ো মানুষদের চুলদাড়ি সব নীল হয়ে গিয়ে তাদের ভারী চমৎকার লাগছে। সেই দেখে কালো চুল যাতে তাড়াতাড়ি পেকে গিয়ে নীল হয়ে যায় তার জন্যে মানুষ কৃত্রিম উপায়ে চেষ্টা করছে। বিভিন্ন সেলুনে কালো চুল নীল করার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে।

রাকেশ অবাক হয়ে বাবার কথা শুনছিল। এমন সময় রেডিওতে বলল, এ-পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে কয়েক লক্ষ দুর্ঘটনা ঘটেছে। হিমালয়ের বরফে ঢাকা চূড়ো আকাশের নীল রঙের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় মোট সাতাশটি এরোপ্লেন এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘায় আছড়ে পড়েছে। ভারতবর্ষে এ-পর্যন্ত তিনজন পুরুষ ও একজন মহিলা এই রঙ বদলের ঘটনায় সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছেন।

এরকম চমকে দেওয়া আরও কত সব দুর্ঘটনা!

রাকেশের খুব মন খারাপ লাগছিল। ও পায়ে-পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যে হয়ে ঘন আঁধার নেমে এসেছে। কিন্তু আকাশে চাঁদ-তারা কই? গাঢ় পিচ-রঙ আকাশে ঘোর নীল রঙের চাঁদ। ভাল করে ঠাহর করা যায় না। আর তারা? চোখে প্রায় পড়ে না বললেই চলে। ইশ, এরকমভাবেই কাটবে প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত!

রাকেশ ঘরে ফিরে এল। ঘরে নীল আলো জ্বলছে। নিয়ন লাইট আর বাল্‌ব। দুটোর অবস্থাই একরকম। বাবা-মা চুপচাপ বসে। মায়ের মুখে সকালের ঠাট্টার লেশমাত্র নেই এখন। বাবাও যেন বেশ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। মুখ গম্ভীর। রেডিও সামনে নিয়ে বসে আছেন। রেডিও ছাড়া আর উপায় কী! গল্পের বই পড়া বন্ধ। খবরের কাগজ পড়া বন্ধ। টিভি দেখা বন্ধ। ঘরে বসে বসে সকলেই বোধহয় এইরকম হাঁপিয়ে উঠছে।

রেডিওতে গানের অনুষ্ঠান শুনছিলেন বাবা। হঠাৎই রাকেশের দিকে ফিরে বললেন, 'রাকা, খেয়াল করছিস, যারা খবর পড়ে শোনাচ্ছে তাদের মাঝে-মধ্যে কী রকম আটকে যাচ্ছে। নীল কাগজে কালো লেখা পড়তে গিয়ে খবর-পড়ুয়ারা

একেবারে হিমসিম্ খেয়ে যাচ্ছে।'

রাকেশ সামান্য হাসল।

মা বললেন, 'তবু রেডিও ছাড়া আর উপায় কী বলো—'

রাকেশ জিজ্ঞেস করল, 'খবরে কিছু বলেছে, বাবা?'

'হ্যাঁ, বলেছে, মার্কিন বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানিয়েছেন, সূর্যের মধ্যে কোনও একটা গোলমালের জন্যেই এরকম বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে। চব্বিশ ঘণ্টা না কাটলে তাঁরা নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছেন না।'

মিনু রাকেশের পায়ে-পায়ে ঘুরছিল। রাকেশ ওকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল। তারপর একটা কালো বল নিয়ে ওর সঙ্গে খেলতে শুরু করল। সময় যেন আর কাটতেই চাইছে না।

এমনি করেই একসময় রাত দশটা বাজল। কোনওরকমে খাওয়া-দাওয়া সেরে রাকেশ মায়ের পাশে শুয়ে পড়ল। মিনুও শুয়ে পড়ল ওর কোল ঘেঁষে। বাবা পাশের ঘরে যাবার সময় বলে গেলেন, 'রাকা, মন খারাপ করিস না। কাল সকালে উঠেই দেখবি স-ব ঠিক হয়ে গেছে।'

বাবার কথাটা যে এরকম হাতেনাতে ফলে যাবে সেটা রাকেশ কল্পনাও করতে পারেনি।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই ও অবাক। ধবধবে সাদা মিনু 'মিঁউ, মিঁউ করছে কালকের মতোই। চোখের ভুল নয়তো। রাকেশ শুয়ে-শুয়েই দেখল চারপাশে। ঘরের দেওয়াল আবার সাদা হয়ে গেছে, ফর্সা হয়ে গেছে ওর গায়ের রঙ, জানলা দিয়ে ঠিকরে পড়েছে সোনা রঙের ঝকঝকে রোদ। পাশে তাকিয়ে দেখল, মা নেই। আগেই উঠে পড়েছেন।

রাকেশ লাফিয়ে উঠে বসল। মনটা দারুণ খুশি হয়ে উঠল ওর। যাক, সব কিছু আবার তাহলে আগের মতোই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। কিন্তু হল কেমন করে?

রাকেশ বিছানা ছেড়ে ছুটল রান্নাঘরের দিকে—মায়ের সন্ধানে।

সেখানে পৌঁছে দেখে বাবা হাত-পা নেড়ে মাকে কী সব যেন বোঝাতে চেষ্টা করছেন। এক হাতে বাজারের দুটো থলে। থলে দুটো উঁচু করে বাবা মাকে বলছেন, 'এই দ্যাখো, ধরো এটা হলো সূর্য। সূর্য থেকেই তো সাদা আলো আসছে আমাদের পৃথিবীতে—'

মা বাধা দিলেন, 'সাদা আলো কোথায়? ও তো হলদে আলো।'

বাবা একটা অদ্ভুত শব্দ করে ধৈর্য হারালেন। তারপর বললেন, 'দূর ছাই! তোমাকে বলে লাভ নেই। তার চেয়ে বরং রাকাকে বলি—'

রাকেশ খুশি-খুশি মেজাজে বলে উঠল, 'সব রঙ আবার ঠিকঠাক হয়ে গেছে, বাবা। কিন্তু ও-রকম ওলট-পালট হয়েছিল কেমন করে? রেডিওতে কিছু বলেছে?'

'আরে সেটাই তো তোর মাকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম। রেডিওতে সংক্ষেপে যা বলল, তা হল এই ঃ গত পরশু রাতে—অর্থাৎ ধরে নে, তিরিশ ঘণ্টা আগে, সূর্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটেছিল কি কারণে এই বিস্ফোরণ তা এখনও বিজ্ঞানীরা বুঝে উঠতে পারেননি। তবে বলছেন, সেই বিস্ফোরণের ফলে সূর্যকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল বিচিত্র এক তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। সেই বিকিরণ সূর্যের সাদা আলো থেকে ছ-ছটা রঙ একেবারে শুষে নিয়েছিল। তারা শুধু গেট-পাস দিয়েছিল নীল রঙটাকে। ফলে সব জিনিসকেই নীল রঙের দেখাচ্ছিল। তাছাড়া ঐ বিকিরণের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সূর্যের সবচেয়ে কাছের তিনটে গ্রহে—বুধ, শুক্র আর পৃথিবীতে। সেইজন্যে আমাদের এখানকার কৃত্রিম আলোগুলোও—মানে নিওন লাইট, বাল্‌ব, সব—নীল রঙের আলো ছড়াচ্ছিল...।'

'কিন্তু কালো রঙটা?' ভাতের হাঁড়িতে হাতা নাড়তে নাড়তে মা প্রশ্ন করলেন।

তার জবাব দিল রাকেশ, 'কালোটা কোনও রঙ নয়, মা। বরং কোনও রঙ না থাকলে সেই জিনিসটাকে আমরা কালো দেখি।'

মায়ের মুখের চেহারা দেখে বোঝা গেল রাকেশের ব্যাখ্যা তাঁর মনঃপুত হয়নি। সেটা অনুমান করে বাবা বললেন, 'যাই হোক, ভারতীয় সময় অনুযায়ী গতকাল রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ সূর্যকে ঘিরে-থাকা ওই বিচিত্র বিকিরণ মিলিয়ে গেছে মহাশূন্যে। ফলে বর্ণালির বাকি ছটা রঙ আজ সকাল থেকেই আবার ফিরে পাওয়া গেছে। আর পৃথিবীর ওপর থেকেও কেটে গেছে ওই বিকিরণের প্রভাব। সুতরাং রাতের আলোতেও আর কোনও গোলমাল থাকবে না। সিনেমা-টিভিও দেখা যাবে আগের মতোই।'

বাবা বাজারের থলে দুটো বগলদাবা করে রাকেশকে লক্ষ করে গলা নামিয়ে বললেন, 'রাকা, এবারে রঙের ব্যাপারটা ছোট্ট করে তোর মাকে বুঝিয়ে দিই, কী বলিস?'

রাকেশ মজা পেয়ে ঘাড় কাত করল। মা রান্নায় মগ্ন হলেও এদিকে যে কান পেতে আছেন তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

গলাখাঁকারি দিয়ে বাবা বলতে শুরু করলেন, 'শোনো, সূর্যের যে সাদা

আলো—মানে, তোমার মতে হলদে, কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে ওটাই সাদা আলো—ওই সাদা আলো ভাঙলে দেখা যাবে ওর ভেতরে সাতটা রঙ মিশে আছে। আকাশে রামধনু উঠলে বর্ণালির সেই সাতটা রঙ আমরা আলাদা করে দেখতে পাই। দিনের বেলা সব জিনিসের ওপরেই সাদা আলো পড়ে, কিন্তু তবুও বিভিন্ন জিনিসকে আমরা বিভিন্ন রঙের দেখি। এরকমটা কেন হয়? ধরো, এই যে তুমি লাল রঙের শাড়ি পরে আছ, এই শাড়িটাকে লাল দেখানোর কারণ এটা বর্ণালির লাল রঙ ছাড়া আর সব কটা রঙই শুষে নিয়েছে। শুধু গেট-পাস দিয়েছে লাল রঙটাকে। যেমন ওই বিকিরণ নীল রঙটাকে ছেড়ে দিয়েছিল। যে জিনিস সব রঙ শুষে নেয় তাকে আমরা কালো দেখি। আর যে জিনিস বর্ণালির সব কটা রঙকেই ফিরিয়ে দেয়—মানে, ছেড়ে দেয়—তাকে আমরা দেখি সাদা রঙের। যেমন, আমার এই ধুতি-পাঞ্জাবি, হাঁড়ির ওই ভাত। এবার তো বুঝলে।'

মা হাতা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'ঢের বুঝেছি! এখন চটপট বাজারটা করে আনো দেখি। কাল তো নীল ভাত খেতেই পারোনি, আজ ভাল করে দুটো সাদা ভাত খেয়ে অফিসে যেও।'

বাবা চলে গেলেন। যেতে যেতে বললেন, 'কাল খবরের কাগজ পড়তে পারিনি। আজ দেখি কোনও টেলিগ্রাম বেরোল কি না—'

মা রাকেশকে বললেন, 'কী হল, রাকা, যাও, পড়তে বোসো গিয়ে—'

রাকেশ পড়ার টেবিলে ফিরে এল। মিনু টেবিলের নীচে চুপটি করে বসে। জানলা দিয়ে বাইরের রোদ দেখতে ওর খুব ভাল লাগছিল। ও উঠে গিয়ে গরাদে মুখ ঠেকিয়ে চোখ তুলে তাকাল সূর্যের দিকে। আজ সূর্যটাকে কী দারুণ দেখাচ্ছে! কই, এতদিন তো এরকম মনে হয়নি! বরং সূর্যটা যেন সকলের কাছে বেশ পুরনো হয়ে গিয়েছিল। অথচ আজ একেবারে ঝকঝকে নতুন!

সময়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সোমনাথের বয়েস মাত্র বাইশ। এই বয়েসে সব কিছুই বাড়তি থাকে মানুষের। শক্তি, উৎসাহ, আবেগ। সোমনাথ একটি দুর্দান্ত ফাগুওয়ালা মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল একতরফা। মেয়েটির নাম অপরা। আলাপ নেই। পাড়ার সবচেয়ে ঘ্যাম বাড়ি হল চৌধুরিদের। চারদিকে প্রকাণ্ড বাগান, টেনিস লন, সুইমিং পুলওয়ালা বাড়ি। সাতখানা গাড়ি রাখার মতো প্রশস্ত গ্যারেজ। সাতটা বিদেশি কুকুর। এই বাড়ির মেয়ে অপরা জানেই না যে, গলির ভেতরে একটা আধভাঙা বাড়ির একতলায় সোমনাথ নামক একজন যুবক থাকে। তার বাবা স্কুলমাস্টার এবং সে বেকার। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে সে একটা সায়েন্টিফিক অ্যাপ্লায়েন্সের ছোট ঘরোয়া কারখানা খুলবে বলে কিছুদিন যাবৎ ঘোরাঘুরি করছে, চোখে তার দেদার স্বপ্ন।

এই সময়ে বজ্রপাতের মতো এই প্রেম।

সোমনাথ একবার ঠিক করল, অপরার চোখে পড়ার জন্য ওর গাড়ির সামনে ঝাঁপ দেবে। কিংবা হিন্দি সিনেমার মতো ওদের পাঁচিলের ওপর উঠে গান গাইবে। কিংবা অপরার চোখের সামনে নিজের বুকে ছোরা বসিয়ে আত্মহত্যা করবে।

শেষ অবধি সে অপরাকে একখানা চিঠি লিখল। খুবই ভদ্র চিঠি এবং বেশ সাহিত্য রসসিক্ত। জবাব পাওয়ার আশা ছিল না, কিন্তু জবাব এল। অপ্রত্যাশিত, একটু কাঁপা কাঁপা ভীরু হাতের লেখা। গঙ্গার ধারে নির্জন একটা জায়গায় শনিবার বিকেল ছ'টায় সোমনাথকে থাকতে লিখেছে।

নব্য যুবা সোমনাথের একবারও মনেই হল না যে, এটা একটা ফাঁদ হতে পারে। সে এত উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে, তার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। প্রচণ্ড টেনশন। সে কয়েক গ্লাস জল খেল। এবং সারাদিন উড়ুউড়ু মনে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াল।

যে-জায়গাটা নির্দিষ্ট করা ছিল সেটা খিদিরপুর ডকের কাছাকাছি। খুবই নির্জন এবং সন্ধ্যের পর রীতিমত ভয়াবহ জায়গা। এ-জায়গাটা সোমনাথের সম্পূর্ণ

অচেনা। এরকম একটা জায়গা অপরা কেন বেছে নিল তা সোমনাথ বুঝতে পারল না।

সোমনাথের পুঁজি খুবই সামান্য। সে দুটো টিউশনি করে তাই দিয়ে মাসের খরচটা চালিয়ে নেয়। বিড়ি সিগারেট বা সিনেমা থিয়েটার দেখার নেশা নেই বলে তার চলে যায়। মাঝে মাঝে বিজ্ঞানের বই কেনা তার একমাত্র নেশা, তাই সামান্য হাত-খরচের টাকা থেকেই একটা ট্যাক্সি ভাড়া করার কথা চিন্তা করল। কেননা জায়গাটায় পৌঁছনোর কোনও বাসরুট নেই।

এসপ্ল্যানেডে অনেকগুলো ট্যাক্সিকে পর পর ধরার চেষ্টা করল সোমনাথ। কিন্তু জায়গাটার নাম শুনে সব ট্যাক্সিওয়ালাই হয় আঁতকে ওঠে, না হয় তো কঠোরভাবে মাথা নেড়ে চলে যায়।

এদিকে শীতের সন্ধে দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে। ছ'টা বাজতে খুব বেশি দেরি নেই।

সোমনাথ অগত্যা ময়দানের দিকে এগিয়ে গেল। যদি খিদিরপুরগামী কোনও শেয়ারের ট্যাক্সিও ধরতে পারে।

সন্ধ্যের পর ময়দানও এক ভুতুরে ছন্নছাড়া জায়গা। কুয়াশা এবং ধোঁয়াশায় গোটা তেপান্তরের মাঠটাই আবছা এবং রহস্যময়। সোমনাথ হতাশায় প্রায় ভেঙে পড়ছিল। তার বোধহয় উচিত ছিল বেলাবেলি গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা।

সোমনাথ আচমকাই একটা প্রায়-বিস্মৃত, কিন্তু পরিচিত শব্দ শুনতে পেল। ঘোড়ার গাড়ির মৃদু ঝুমঝুমির আওয়াজ। সেইসঙ্গে ঘোড়ার পায়ের কপকপ শব্দ। একটা ছ্যাকরা গাড়ি বেশ দ্রুত দক্ষিণের দিকে এগিয়ে আসছে।

সোমনাথ মরিয়া হয়ে ভাবছিল, ঘোড়ার গাড়িটাই ভাড়া করবে কি না। অবশ্য ঘোড়ার গাড়িতে গেলে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছনোর কোনও আশাই নেই। তবু একটা চেষ্টা তো...

বাতাসে সপাং করে একটা চাবুকের শব্দ হল, তারপরেই কুয়াশার ভেতর থেকে ঘোড়ার গাড়িটার আবির্ভাব ঘটল।

সোমনাথ হাত তোলেনি বা ডাকেওনি। কিন্তু গাড়িটা তার সামনেই দাঁড়িয়ে গেল। কোচোয়ান কোচবক্স থেকে একটু ঝুঁকে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'খিদিরপুর যাবেন নাকি, বাবু?'

সোমনাথ ভারি অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, যাব, কিন্তু আমার ছ'টার মধ্যে পৌঁছনো দরকার।'

কোট, গলাবন্ধ আর টুপিতে লোকটা একেবারে ঝুবুস হয়ে বসে আছে। হাতে

বিড়ি বা সিগারেট কিছু একটা জ্বলছে। সাদা দাঁত দেখিয়ে হেসে বলল, 'কোনও চিন্তা নেই. পৌঁছে দেব। আমার ঘোড়া হল পক্ষিরাজ, উঠে পড়ুন।'

সোমনাথ আতঙ্কিত গলায় বলল, 'কত নেবে?'

লোকটা একটু ভেবে বলল, 'এক টাকা।'

এক টাকা? এ যে অবিশ্বাস্য কম ভাড়া!

কিন্তু সোমনাথের নষ্ট করার মতো সময় নেই, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। সে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসল।

ঘোড়ার গাড়িতে সে আগে কখনওই ওঠেনি। কলকাতার লুপ্তপ্রায় ঘোড়ার গাড়ির অবশিষ্ট দু-একটিকে সে কদাচিৎ রাস্তায় দেখেছে। জরাজীর্ণ, অস্তিত্বলোপের অপেক্ষায় দিন গুনছে।

কিন্তু গাড়ির ভেতরে বসে অন্ধকারেও সোমনাথ যা অনুভব করল তা বিস্ময়কর। প্রথম কথা ভেতরে বাইরের মতো শীত নেই। বেশ কবোষ্ণ আবহাওয়া। কোনও কটু গন্ধ নেই। বরং ভারি স্নিগ্ধ একটা সুবাস রয়েছে। গাড়ির গদি এত নরম এবং মসৃণ যে, খুব দামী মোটরগাড়িতেও বোধহয় এরকমটি নেই।

গাড়ি যে চলতে শুরু করেছে তাও বুঝতে পারছিল না সোমনাথ। কারণ কোনও ঝাঁকুনি লাগল না দুলুনি টের পাওয়া গেল না। শুধু বাইরের দিকে চেয়ে অপসৃয়মান রাস্তা আর গাছপালা দেখে সে বুঝল, গাড়িটা চলছে।

কিন্তু কীরকম গতিবেগে চলছে? একটা ঘোড়া কত জোরে ছুটতে পারে? গাড়িটার চলা দেখে মনে হচ্ছে অন্তত পঞ্চাশ-ষাট মাইল বা তারও বেশি গতিতে গাড়িটা যাচ্ছে। অথচ ঘোড়ার পায়ের শব্দ বা চাবুকের আওয়াজ সোমনাথের কানে এল না। একটু বাদে সে টের পেল, গাড়ির গতি দ্বিগুণ বেড়েছে, অথচ কোনও শব্দই নেই।

এসব কী হচ্ছে? এরকম তো হওয়ার কথা নয়!

সোমনাথ হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাকল, 'কোচোয়ান?'

যেন একটা স্পিকারের ভেতর দিয়ে ধাতব স্বর এল, 'জী! কিছু বলছেন?'

'গাড়ি এত জোরে যাচ্ছে কেন?'

'আপনাকে যে ছ'টার মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে, সাহেব।'

'কিন্তু ঘোড়া কি এত জোরে দৌড়য়?'

'আমার ঘোড়া যে পক্ষিরাজ, সাহেব।'

নির্দিষ্ট জায়গায় যখন গাড়িটা এসে দাঁড়াল তখন সোমনাথের ঘড়িতে পাঁচটা চৌত্রিশ হয়েছে। অর্থাৎ মাত্র চার মিনিটে এসপ্ল্যানেড থেকে খিদিরপুরে পৌঁছে

গেছে সে।

মানসিক উত্তেজনার জন্য সোমনাথ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। কোচোয়ানকে একটা টাকা দিয়ে সে গিয়ে ঘাটের কাছাকাছি দাঁড়াল।

কোচোয়ানটা গাড়ি থেকে নেমে ঘোড়াকে শুকনো ঘাসজাতীয় কিছু খাওয়াচ্ছিল, সোমনাথের দিকে চেয়ে বলল, 'সাহেব কি ফিরে যাবেন?'

'দেরি আছে। কেন বলো তো?'

'আমি পৌঁছে দিতে পারি।'

সভয়ে সোমনাথ জিজ্ঞেস করল, 'কত ভাড়া নেবে?'

'এক টাকা। আমি কখনও এক টাকার বেশি ভাড়া নিই না।'

সোমনাথ একটু ইতস্তত করছে দেখে কোচোয়ান নিজেই বলল, 'এখান থেকে ফেরার কোনও গাড়ি নেই, সাহেব।'

'ঠিক আছে, তাবে দাঁড়াও।'

গঙ্গার ধারে একটা বাঁধানো চত্বর। একটু দূরের একটা ল্যাম্পপোস্ট থেকে যে-ক্ষীণ আলো আসছে তাতে যতদূর দেখা যায় জায়গাটা ফাঁকা। কোনও লোকবসতি নেই, রাস্তা দিয়ে এক-আধটা গাড়ি খুব জোরে বেরিয়ে যাচ্ছে। কোনও পদাতিক দেখা যাচ্ছে না।

সোমনাথ ঘড়ির দিকে চেয়ে বারবার ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল। অপরা এরকম একটা জায়গা কেন বেছে নিল সেটা বারবার ভেবেও বুঝতে পারছিল না।

যখন ছ'টায় এসে ঘড়ির দুটো কাঁটা একটা সরলরেখায় পরিণত হল তখন হঠাৎ অন্ধকার থেকে একটা প্রকাণ্ড গাড়ি এগিয়ে এসে সোমনাথের কাছেই থেমে গেল। গাড়িটা কালো একটা পন্টিয়াক। ঠিক এরকম গাড়ি অপরাদের নেই।

সোমনাথের বুকের ভেতরে হৃদাপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল। সে গাড়িটার দিকে খুব লাজুক ও ভীরু পায়ে এগিয়ে গেল।

কিন্তু গাড়িটার কাছ বরাবর পৌঁছতেই সে দেখতে পেল, গাড়ির মধ্যে অপরা নয়, তিন-চারজন পুরুষ বসে আছে।

সোমনাথ ফের পিছিয়ে আসছিল, হঠাৎ গাড়ির পিছনের দরজা খুলে একটা বিশাল চেহারার লোক নেমে এল।

সোমনাথ কিছু বুঝে উঠবার আগেই লোকটা হাত বাড়িয়ে তার সোয়েটারের বুকটা খামচে ধরে বলল, 'কতদিন হল মেয়েটার পিছু নিয়েছ?'

'আজ্ঞে?' সোমনাথ ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে।

লোকটা অন্য হাতে সোমনাথের গালে বিশাল একটা থাপ্পড় বসিয়ে বলল,

'প্রেমরোগ কী করে সারাতে হয় আমরা জানি, বামন হয়ে চাঁদে হাত?'

সোমনাথ জীবনে কখনও মারধর খায়নি, মারপিটও করেনি। চড় খেয়ে সে এমন ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গেল যে মুখে কথা সরল না।

গাড়ি থেকে আরও তিনজন নেমে এল। এদের কাউকেই সোমনাথ কখনও দেখেনি।

চারজন যখন ঘিরে ধরল সোমনাথকে তখনও সে বুঝতে পারছিল না, কোথায় কোন গণ্ডগোল সে পাকিয়ে বসে আছে। অপরাকে চিঠি লিখেছিল, অপরা তার জবাব দিয়েছে, তবে কী হল?

কিন্তু এরপর যা ঘটল তা সোমনাথের সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। চারটে লোক তাকে ঠেসে ধরল। একজন একটা ক্ষুর বের করে চটপট তার মাথাটা কামিয়ে ফেলল। তারপর তার জামাকাপড় টেনে হিঁচড়ে এবং ছিঁড়ে গা থেকে খুলে ফেলল। শুধু আণ্ডারওয়্যার পরা অবস্থায় সে শীতে ভয়ে বুদ্ধিভ্রষ্ট ও বাক্যহারা হয়ে কাঁপতে লাগল।

তারপর দুটো লোক দু'দিক থেকে পর্যায়ক্রমে তার মুখে ঘুঁষি মারতে লাগল। প্রচণ্ড ঘুঁষি। তার ঠোঁট ফেটে গেল, চোখ ফেটে গেল, গলগল করে রক্ত পড়তে লাগল নগ্ন বুকে। সে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল।

তবু বুঝতে পারল না ভুলটা কোথায় হয়েছে।

অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে সে শুধু জিজ্ঞেস করতে পেরেছিল, 'চিঠিটা কি অপরা লিখেছিল আমাকে? নিজে?'

'সে তো তোর মতো গাড়ল নয়!'

পেটে একটা লাথি খেয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সোমনাথ।

একটু দূর থেকে কোচোয়ানটা নির্বিকার চোখে দৃশ্যটা দেখল।

চারটে লোক গাড়িতে উঠে সাঁ করে চলে যাওয়ার পর কোচোয়ানটা তার ঘোড়ার গলায় হাত বুলিয়ে একটু আদর করে ধীর পায়ে সোমনাথের সংজ্ঞাহীন শরীরটার কাছে এসে দাঁড়াল।

তারপর জিভ দিয়ে একটা চুকচুক শব্দ করল।

'সাহেব! ও সাহেব!'

সোমনাথ নিথর।

কোচোয়ান নিচু হয়ে সোমনাথের শরীরটা পাঁজাকোলে তুলে ফেলে শিষ দিল। ঘোড়াটা চটপট গাড়িসমেত এগিয়ে এল কাছে।

সোমনাথকে গাড়িতে তুলে সিটের ওপর শুইয়ে দিল কোচোয়ান। তারপর

কোচবক্সে উঠে চাবুকটা একবার আপসে নিয়ে বলল, 'চল রে, পক্ষিরাজ।'

ঘোড়াটা একটা লাফ দিল। তারপর গাড়িসমেত হঠাৎ মিলিয়ে গেল বাতাসে।

সোমনাথের যখন জ্ঞান ফিরল তখনও চারদিক অন্ধকার। সে ঘোড়ার গাড়ির পিছনের সিটে শুয়ে আছে। গাড়িটা চলছে কি না তা দেখার জন্য সোমনাথ উঠে বসল। বাইরের দিকে চেয়ে যা দেখল তাতে তার চোখের পলক পড়া বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে এক প্রচণ্ড তুষার-ঝড় চলেছে, চারদিক শুধু সাদা বরফে ঢাকা। আকাশ মেঘলা এবং কালো।

'কোচোয়ান! কোচোয়ান!'

সেই ধাতব কণ্ঠস্বরটি বলে উঠল, 'আপনার সামনের সিটে যে-পোশাকটা রাখা আছে সেটা পরে নিন, সাহেব, বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা।'

হতভম্ব সোমনাথ বলল, 'কিন্তু এ আমাকে তুমি কোথায় এনেছ? আমি কি স্বপ্ন দেখছি?'

'পোশাকটা পরে নিন, সাহেব।'

সোমনাথ কিছুক্ষণ অসহায়ভাবে বসে রইল। সে যে স্বপ্ন দেখছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বপ্নই যদি হবে তাহলে একটু আগে সে যে মার খেয়েছিল তার ব্যথা কেন এখনও সর্বাঙ্গে থাবা গেড়ে আছে? পেটে ব্যথা, চোয়াল ফুলে ঝুলে পড়েছে, রক্ত শুকিয়ে আছে তার খোলা বুকে, নাক ফুলে ঢোল, ঠোঁট কেটে গেছে। জীবনে এত মার খায়নি কখনও সে। এত ব্যথা নিয়ে নিশ্চয়ই সে ঘুমোচ্ছে না! তাহলে স্বপ্ন দেখবে কীভাবে?

তাহলে সে কি মরে গেছে? এ কি মৃত্যুর পরেরকার জগৎ?

সোমনাথ এইসব সমস্যায় ভীষণ বিব্রত বোধ করতে করতে সামনের সিট থেকে পোশাকটা তুলে নিল। পাতলা সাদা একটা জোব্বার মতো জিনিস। এ-পোশাক পরলে কি বাইরের ওই শীত সহ্য করা যায়!

গাড়ির ভেতরে অবশ্য শীতের আভাসও নেই। সোমনাথ পোশাকটা পরার চেষ্টা করতে লাগল, তার পরনে আণ্ডারওয়্যার ছাড়া কিছুই নেই।

জোব্বাটা পরে নিতে অবশ্য তেমন অসুবিধে হল না। জামার সঙ্গে পায়জামার মিলনে যা হয়। কলকারখানার শ্রমিকরা যেমন ওভারল পরে অনেকটা তেমনই, তবে এই পোশাকটায় আবার জুতো দস্তানা এবং মুখঢাকা টুপিও লাগানো আছে। কাপড়টা কী ধরনের তা বুঝতে পারল না সোমনাথ। ভেতরটা মসৃণ আর নরম, বাইরেটা খসখসে। জুতোর নিচে একটা পাতলা সোল আছে। পোশাকটার কোনও ওজন নেই। এত হালকা যে, গায়ে কিছু আছে বলেই মনে হল না।

গাড়ির ডানদিককার দরজাটা খুব আস্তে খুলে গেল এবং সেই ধাতব কণ্ঠ বলল, 'নামুন, সাহেব।'

সোমনাথ নামল। বাস্তবিকই এক তুষার-ঝড় তার চারদিকে বয়ে চলেছে। সে কলকাতার ছেলে। তুষারপাত বড় একটা দেখার সুযোগ হয়নি। একবার সান্দাকফু ট্রেকিং করতে গিয়ে, আর-একবার সিমলায় একটা টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়ে তুষারপাত দেখেছিল। কিন্তু এ যেন তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। এটা তো শুধু তুষারপাত নয়, তুষারের প্রচণ্ড এক ঝড়। বাতাসের ঝাপটায় সোমনাথ দাঁড়াতেই পারছিল না। তবে যতটা শীত করার কথা ততটা শীত সে টের পাচ্ছে না। ঠাণ্ডা লাগছে বটে, তবে তা অসহনীয় নয়।

গাড়ির মাথায় তাকিয়ে সে কোচবক্সে কোচোয়ানকে দেখতে পেল না। চারদিকে তাকিয়ে দেখল অনন্ত এক তুষার-রাজ্য। কোথাও আর কিছু নেই।

'কোচোয়ান! কোচোয়ান!'

কানের কাছে একটা ধাতব কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'ভয় নেই, সাহেব, নাক বরাবর ঠিক দশ পা হেঁটে যান।'

সোমনাথ আতঙ্কিত পায়ে ঠিক দশ পা হাঁটল, তারপর দাঁড়াল।

এবার?

পায়ের নিচে কত ফুট ঘন বরফ জমে আছে কে জানে। কিন্তু সোমনাথ সবিস্ময়ে দেখল জমাট বরফের চাঙড় ভেঙে একটা কিছু উঠে আসছে তার সামনে। প্রথমে সরু শীর্ষদেশ, তারপর ধীরে ধীরে একটা ছোট্ট কালো পিরামিড দেখা দিল।

'এগিয়ে যান, সাহেব। দরজা খুলে যাবে।'

সোমনাথ দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে এগিয়ে যেতেই পিরামিডের একটা দেওয়াল হঠাৎ দু'ভাগ হয়ে দু'ধারে সরে গেল। সামান্য একটু ফাঁক, সোমনাথ ভয়ে ভয়ে ঢুকতেই তার পিছনে দরজাটা ফের বন্ধ হয়ে গেল।

সামনে প্রশস্ত একটা সিঁড়ি নেমে গেছে। ভারি সুন্দর একটা নকশাদার কার্পেটের মতো জিনিস পাতা, আর সে-জিনিসটা নিজেই একটা নরম স্বচ্ছ আলো বিকীর্ণ করছে। দেওয়ালগুলোও তাই। সব কিছুর ভেতর থেকেই যেন আলোর আভা বেরিয়ে আসছে।

শরীরের প্রচণ্ড ব্যথা আবার টের পাচ্ছিল সোমনাথ।

তাকে আর কোনও কণ্ঠস্বর নির্দেশ দিচ্ছে না। সে কি এখন নামবে সিঁড়ি বেয়ে?

সোমনাথ সিঁড়িতে পা দিতেই মসৃণ গতিতে সিঁড়িটা নামতে লাগল। এসকালেটর,

তবে এসকালেটর এক জায়গায় শেষ হয় এবং খাঁজে ঢুকে যায়, কিন্তু এ-সিঁড়িটা সেরকম নয়। অনন্ত গতিতে সোমনাথকে টেনে নিয়ে চলেছে। এবং সে-গতি ঘণ্টায় অন্তত ত্রিশ মাইল। খানিক নেমে সিঁড়িটা সোজা গেল, তারপর বাঁয়ে বেঁকল, ডাইনে বেঁকল। মিনিটখানেক বাদে একজায়গায় থামল।

একটা প্রশস্ত হলঘর। সোমনাথ বুঝল এখানে তাকে নামতে হবে। সিঁড়ির সঙ্গে লাগানো ঘরটার মেঝে। সেটাও কার্পেটে মোড়া এবং আলোকিত।

সোমনাথ চারদিকে চেয়ে আলোর উৎস আবিষ্কারের চেষ্টা করল, পারল না। ঘরটারও কোনও ডিজাইন সে বুঝতে পারল না, খুব উঁচু এবং মস্ত এক হলঘর, সেটার কোনও দিক সোজা, কোনও দিক আঁকাবাঁকা, কোনও দিক ঢেউ খেলানো।

সোমনাথ ধীরে ধীকে কয়েক পা এগোতেই একটা চাকা লাগানো ধাতব খাট এগিয়ে এল, মোটোরাইজড এবং নেপথ্য-চালিত, খাটের ওপর একটা বিছানা রয়েছে। এবং খাটের সঙ্গে লাগানো রয়েছে নানারকম পাইপ এবং অদ্ভুত যন্ত্র।

কে যেন বলল, 'শুয়ে পড়ুন।'

সোমনাথ—ক্লান্ত, ব্যথাতুর, ভীত, বিস্মিত সোমনাথ আর দ্বিধা করল না। বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল। সে সবসময়ে বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তা করে বলে নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্রের স্বপ্ন দেখে। এটাও এরকম একটা স্বপ্নই হবে।

দ্বিতীয়বার সোমনাথের ঘুম ভাঙলে সে দেখল তার বুকের ওপর অতিকায় টেলিফোনের মতো একটা যন্ত্র, আর শরীরের নানা জায়গায় প্যাড আর নল লাগানো। শরীরে আর কোনও ব্যথা টের পাচ্ছিল না। বেশ তরতাজা আর ঝরঝরে লাগছে নিজেকে।

তবু এটা যে স্বপ্নই তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সোমনাথ স্বপ্নটাকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যই ফের চোখ বুজল।

'সাহেব, ও সাহেব।'

সোমনাথ চোখ মেলল, একজন কালো মতন মানুষ তার ওপর ঝুঁকে চেয়ে আছে।

'কোচোয়ান না?'

'জী, সাহেব। এখন কেমন আছেন?'

এই জনশূন্য পুরীতে এই প্রথম একজন মানুষকে দেখে সোমনাথ ভারি খুশি হয়ে বলল, 'কিন্তু আমি কোথায়?'

কোচোয়ান সে-কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'বর্বররা খুব ঠেঙিয়েছিল আপনাকে।'

মারের কথা মনে পড়ায় সোমনাথ দাঁতে দাঁত পিষল।

'আমি কি জেগে আছি, কোচোয়ান?'

'জেগে আছেন, সাহেব।'

'আমি কোথায়, কোচোয়ান?'

'হাসপাতালে।'

'এটা কোন হাসপাতাল? আমি এরকম হাসপাতাল কখনও দেখিনি তো!'

'এটার নাম পুনর্জীবন কেন্দ্র তিন।'

'এরকম নামও তো শুনিনি কোনও হাসপাতালের।'

'আপনার আমলে এরকম নামের কোনও হাসপাতাল যে ছিল না। আপনি দেড় হাজার বছর এগিয়ে এসেছেন, সাহেব।'

সোমনাথ কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে বুঝল, সে এখনও স্বপ্ন দেখছে, তাই চোখ বুজে ফেলল।

কোচোয়ান শব্দ করে হেসে বলল, 'চোখ বুজে কোনও লাভ নেই, সাহেব। আপনি স্বপ্ন দেখছেন না, আপনি জেগে আছেন এবং চারদিকে যা দেখছেন সবই সত্য।'

টাইম মেশিনের কথা কল্পবিজ্ঞানে পড়েছে সোমনাথ। কিন্তু সে তো বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার নয়। হলে ভালো হত। কিন্তু হওয়া কি সম্ভব?

ধীরে ধীরে চোখ খুলল সোমনাথ।

'আমি কোথায়, কোচোয়ান?'

'আপনি যেখানে ছিলেন সেখানেই আছেন, খিদিরপুর, গঙ্গার ঘাট মনে পড়ে?'

'পড়ে, কোচোয়ান।'

'আপনি সেখানেই আছেন, তবে সময়টা আর সেখানে নেই।'

'টাইম মেশিন?'

কোচোয়ান গম্ভীর হয়ে বলল, 'মেশিন তো মানুষেরই তৈরি সাহেব, মানুষই বানায়।'

'তা বটে।'

'তাহলে মেশিন-মেশিন করে আপনাদের গলা শুকোয় কেন?'

সোমনাথ চারদিকে চেয়ে কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে রইল। তারপর বলল, 'আমি উঠতে পারি?'

'উঠুন, সাহেব। আপনি এখন ভালো আছেন। একটু অপেক্ষা করুন, আমি যন্ত্রগুলো খুলে নিই।'

লোকটা অত্যন্ত পটু হাতে যন্ত্রগুলোকে সরিয়ে দিল, তারপর বলল, 'এবার

উঠুন।'

সোমনাথ উঠল, শরীরে বিন্দুমাত্র ব্যথা নেই। কিন্তু মাথাটা যে ওরা কামিয়ে দিয়েছিল।

যেন মনের কথা টের পেয়েই কোচোয়ান বলল, 'মাথাটা ন্যাড়াই থাকছে সাহেব। একটা সলিউশন লাগানো হয়েছে। সাতদিনে চুল বড় হয়ে যাবে।'

'সাতদিন! ততদিন কি আমি এখানে থাকব?'

কোচোয়ান মাথা নেড়ে বলল, 'না, সাহেব। আপনার ইচ্ছে না হলে থাকবেন না। অন্য কোনও সময় থেকে কাউকে আনার নিয়মও নেই। আমি আপনাকে এনে ফেলেছি নিতান্তই দায়ে পড়ে। ফেলে এলে আপনি মরে যেতেন, ওরা আপনার হাল খারাপ করে দিয়েছিল।'

'আপনার সেই গাড়িটাই কি তাহলে টাইম মেশিন?'

'টাইম মেশিন নিজে নিজে চলে না, সাহেব, তাকে চালাতে হয়।'

লোকটাকে অল্প সময়ের মধ্যেই খানিকটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছিল সোমনাথ, মেশিনের প্রশংসা করলে লোকটা খুশি হয় না। লোকটা বিনয়ী হলেও ব্যক্তিত্ববান। লোকটা হয়তো একজন মস্ত বৈজ্ঞানিক। সে বলল, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এটা কত সাল বলবেন?'

'তিন হাজার পাঁচশো একান্ন।'

সোমনাথ ফের চোখ বুজল, মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল তার।

'চোখ খুলুন, সাহেব। আপনার কোনও ভয় নেই।'

'আমাকে একটু বাইরে নিয়ে যাবেন? দেড় হাজার বছর পরেকার কলকাতার চেহারাটা একটু দেখব!'

কোচোয়ান মাথা নেড়ে বলল, 'সব হবে, সাহেব। তবে অন্য যুগের মানুষকে স্বাধীনভাবে আমরা ঘুরতে দিই না।'

'কেন?'

'আবহাওয়ার তফাৎ আর টাইম ল্যাগ—দুটোই মারাত্মক, বাইরে গেলেই আপনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন।'

'তাহলে আপনি কী করে উনিশশো সাতাশিতে গিয়েছিলেন?'

'আমার রক্ষাকবচ আছে। আপনার নেই।'

'পৃথিবীর আবহাওয়া এখন কেমন?'

'খুব ঠাণ্ডা, হিমযুগ আসছে। আপনি তো তার একটু দেখেছেন।'

'কলকাতায় তাহলে সত্যিই বরফ পড়ে?'

'পড়ে, সাহেব। খুব বেশিই পড়ে।'

'আমি কি আর কিছুই দেখতে পাব না? কলকাতায় কি আগের কিছুই নেই?'

'দেড় হাজার বছর বেশ লম্বা সময়, সাহেব। তবে একেবারেই যে কিছু নেই তা বলব না। কিছু আছে, কিছু নেই। ওরকম তো হতেই পারে। আর-একটা কথা, সাহেব, আপনি আমাকে তুমি করেই বলবেন। আমি আপনার চেয়ে অন্তত দেড় হাজার বছরের ছোট।'

সোমনাথ একটু হেসে বলল, 'তা বটে, তবে—'

কোচোয়ান মাথা নেড়ে বলল, 'তবে টবে নয়, সাহেব, তুমি করেই বলবেন।'

সোমনাথ কয়েক পা হাঁটল। ওইরকম মারাত্মক মার খাওয়ার পর মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এত সুস্থ বোধ করাটাই অস্বাভাবিক। সোমনাথের ঘড়িতে এখন মোটে সাড়ে সাতটা।

সোমনাথ এবার কোচোয়ানের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি আমাকে এ-যুগে নিয়ে এলেন কেন?'

কোচোয়ানকে যেন একটু চিন্তিত দেখাল, সে অনেকক্ষণ সোমনাথের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'কারণ আছে, সাহেব। গভীর কারণ।'

'কী সেই কারণ?'

কোচোয়ান কিছু বলার আগেই কোনও লুকনো স্পিকার থেকে টরে টক্কার মতো মৃদু কিছু সঙ্কেত বেজে উঠল।

কোচোয়ান বলল, 'আসছে।'

সোমনাথ অবাক হয়ে বলে, 'কে আসছে?'

কোচোয়ান কোনও জবাব দিল না। চারজন লোক ঘরে এসে দাঁড়াল সোমনাথের মুখোমুখি। চারজনই গম্ভীর। সোমনাথ লক্ষ্য করল, এদের প্রত্যেকের পরনেই জোব্বাজাতীয় পোশাক। যেমনটা তারও পরনে রয়েছে। এ-যুগের এটাই কি একমাত্র পোশাক?

চারজনের একজন, যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমনভাবে হাতজোড় করে বলল, 'নমস্কার, সোমনাথবাবু। পঁয়ত্রিশ শতকের অভিনন্দন।'

এমন নাটুকে অভ্যর্থনায় সোমনাথের হাসি পাচ্ছিল। তবু যথাসাধ্য গম্ভীর থেকে সে বলল, 'নমস্কার, ধন্যবাদ। আপনারা কারা?'

'মহাশয়, আমরা আপনাদেরই সন্তান সন্ততি, আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।'

লোকটা কেমন যেন সাজিয়ে কথা বলছে, অনভ্যস্ত ভঙ্গি।

সোমনাথ বলল, 'আপনারা কি এভাবেই কথা বলেন?'

লোকটা মাথা নাড়ল : 'না, ভাষা এক পরিবর্তনশীল মাধ্যম। আমাদের ভাষা অন্যরকম। আমি প্রাচীন বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করছি। আমার নাম র।'

'আপনাদের ভাষা কেমন?'

'সঙ্কেতময় এবং শব্দনির্ভর। আপনাদের মতো আমরা বাক্য রচনা করি না। একটি বাক্যকে বীজাকারে একটি শব্দে প্রকাশ করি। আবার একটি শব্দ উচ্চারণ করলে একাধিক বাক্য প্রকাশ হয়।'

লোকটি যখন কথা বলছে তখন অন্য তিনজনও পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিল। কেমন যেন গুবগুব, টুং টাং, খসখস সব অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করে যাচ্ছিল নিম্ন স্বরে।

সোমনাথ কবিতা পড়তে ভীষণ ভালবাসে। সে প্রশ্ন করল, 'এখন কি আর কবিতা লেখা হয় না?'

লোকটি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'হয়। আমাদের যন্ত্রগণকেরা লেখে।'

'যন্ত্রগণক?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মহাশয়। কিন্তু আমাদের হাতে আর বিশেষ সময় নেই। অস্তিত্বের অতীব সঙ্কট দেখা দেওয়ায় আমরা আপনাকে সময়ের বহতা ধারায় অনেক দূরে এনে ফেলেছি। আমাদের ক্ষমা করুন। অনেক হিসাব নিকাশ করে দেখেছি আপনাকে চার ঘণ্টার বেশি আটকে রাখলে সমূহ সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। হয়তো বা মানবজাতির ইতিহাসই বদলে যাবে।'

সোমনাথ বিস্মিত হয়ে বলল, 'কেন?'

'মহাশয়, পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাস ছকে বাঁধা। যা ঘটে গিয়েছে সেগুলিরই পরিণতি বর্তমান। আমরা সময়ের উজানে যেতে পারি। আমরা ইচ্ছা করলে অতীতের ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তনও করতে পারি। কিন্তু তার ফলাফল সম্পর্কে খুবই সচেতন থাকতে হয়। সামান্যমাত্র ভুলচুক করলেও পরবর্তী ঘটনাবলী সাঙ্ঘাতিক ও মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। মহাশয়, আমরা কিছুকাল আগে একবিংশ শতকের একটি শিশুকে মারাত্মক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করেছিলাম, সেই শিশু পরে এক মারক রশ্মি দিয়ে পৃথিবীর সমূহ জীবন নাশ করতে উদ্যত হয়।'

সোমনাথ চমকে উঠে বলল, 'আপনারা কী করলেন?'

'আমরা আবার একবিংশ শতকে ফিরে গিয়ে শিশুটির জীবননাশের ব্যবস্থা করি। আপাতদৃষ্টিতে কাজটা নিষ্ঠুর, কিন্তু মানবজাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমাদের এই কাজ করতে হয়েছিল। সুতরাং আমরা আর ভবিতব্য নিয়ে খেলা করি না, ঈশ্বর

মঙ্গলময়।'

'আপনারা কি ঈশ্বর মানেন?'

'অবশ্যই মহাশয়, ঈশ্বর এক প্রমাণিত সত্য।'

'আচ্ছা, ভূত বলে কি কিছু আছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মহাশয়, ভূতও এক প্রমাণিত সত্য। কিন্তু আমাদের আর সময় নেই। যদি দয়া করে আপনি আমাদের সঙ্গে একটু আসেন। আমাদের গ্রাম-প্রধান আপনার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা বলবেন।'

'গ্রাম-প্রধান?'

সোমনাথের ফের হাসি পেল। গ্রাম কোথায় যে গ্রাম-প্রধান থাকবে? তবে সে কোনও মন্তব্য করল না। শুধু বলল, 'চলুন।'

ঘরের বাইরে একটি প্রশস্ত সুড়ঙ্গ 'পথ'। চারদিকে নরম আলো। এবং সে-আলো আসছে দেওয়াল, মেঝে এবং ছাদ যে-বস্তুতে তৈরি তারই অভ্যন্তর থেকে। সামনেই একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার ছাদ নেই, চাকা নেই, লম্বা একটা চুরুটের মতো তার চেহারা। খোঁদলের মধ্যে কয়েকটা আসন।

বিনীতভাবে র বলল, 'দয়া করে আগে আপনি উঠুন।'

তারা সকলেই গাড়িতে উঠল। শুধু কোচোয়ান রয়ে গেল। গাড়িটা চলতে শুরু করল। কোনও ঝাঁকুনি নেই, দুলুনি নেই, বাতাসের অস্বস্তিকর ঝাপটা নেই। অথচ গতি প্রচণ্ড।

'এটা কীরকম গাড়ি!'

র বিনীতভাবে বলল, 'এটি একটি ত্রিচর যান। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে চলতে পারে। আপনাদের আমলের মোটরগাড়িরই আধুনিক সংস্করণ। যে-কারিগরির দ্বারা এটি তৈরি হয়েছে সেটি আপনাদের যুগে অজ্ঞাত ছিল। বললেও হয়তো আপনি সঠিক অনুধাবন করতে পারবেন না।'

সোমনাথ মাথা নেড়ে বলল, 'এরকমই হওয়ার কথা। আমাদের আমলের কল্পবিজ্ঞানে আমরা এরকম যানের কথা পড়েছি।'

'আজ্ঞে যথার্থই বলেছেন। সেইসব কল্পনার মধ্যেই সম্ভাব্যতার বীজ ছিল। আমরা আপনাদের কাছে ঋণী।'

'আপনারা মাটির নিচেই থাকেন বুঝি?'

'না মহাশয়। মাটির উপরিভাগেও আমাদের নানা নির্মাণ আছে। তবে পৃথিবীর উপরিভাগে তাপমাত্রা কোথাও কোথাও শূন্যের একশো ডিগ্রিরও নিচে নেমে গেছে। তাই আমাদের সাধারণ মানুষেরা মাটির নিচেই বসত করে থাকে।'

'চাষবাস হয় না?'

'হয়, মহাশয়, দেখবেন?'

'হ্যাঁ।'

র একটা শব্দ উচ্চারণ করল। শোনাল অনেকটা, ব্রুৎ।

গাড়িটা থেমে গেল। র তার আঙুলের ফাঁকে লুকনো একটা চৌকো জিনিস শুধু একবার উলটে দিতেই ডান দিক ও বাঁ দিকের দুটি দেওয়াল হঠাৎ স্বচ্ছ হয়ে গেল। দেখা গেল দু' ধারেই বিস্তীর্ণ খেত। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর খেতের মতো নয়। বেগুনি একটা আলোর আভায় দেখা গেল, মাটির নিচে প্রায় বনভূমি তৈরি করেছে এরা। তার মাঝখানে মাঝখানে সবুজ বা হলুদ শস্যে ছাওয়া খেত।

'ওগুলো কিসের খেত?'

'ধান, গম, ভুট্টা, বার্লি, ডাল। ঋতুচক্র একরকম নেই বলে এখন আমরা সব ঋতুতেই সবরকম চাষ করে থাকি। সামনে আমাদের গোশালাও দেখতে পাবেন। কুকুর, হাঁস, মুরগি, বাঘ, ভালুক সবই আমরা সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছি।'

'ওপরে কোনও গাছ জন্মায় না?'

'জন্মায়। শুধু দুটি মেরু অঞ্চলে তাপমান কিছু বেশি বলে কিছু গাছপালা জন্মায়। তবে সেগুলিও তুষারযুগের গাছ, তাদের প্রজাতি ভিন্ন। মেরু অঞ্চলে অনেক মানুষও উপরিভাগে বসবাস করে।'

গোশালা, অরণ্য অঞ্চল, পোলট্রি সবই দেখতে পেল সোমনাথ। মাটির নিচে এ এক আশ্চর্য জগৎ। বিশ্বাসযোগ্য নয়।

গাড়িটা ধীরে ধীরে ওপরে উঠছিল। একটু বাদেই একটা সুড়ঙ্গ বেয়ে সেটা উঠে এল মাটির ওপরে।

বাইরে এখনও তুষার-ঝড় বয়ে চলেছে। চারদিকে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। কিন্তু গাড়িটা যেখানে নামল সেটা একটা গ্রামই বটে। গাড়ির ভেতরে একটা সুইচ টিপে স্নিগ্ধ আলোয় চারদিক ভরে দিল। সেই আলোয় দেখা গেল, পরিচ্ছন্ন সুন্দর ছবির মতো সাজানো কুটির, খড়ের গাদা, চণ্ডীমণ্ডপ, গোচারণ ক্ষেত্র। আশ্চর্য! আশ্চর্য! এখানে গাছপালাও রয়েছে বাঁশবনে জোনাকি জ্বলছে। শেয়াল ডাকছে। পায়ের নিচে ঘাস, তৃণ, চোরকাঁটা।

সোমনাথ অবাক হয়ে বলল, 'এসব কি সত্যি?'

'সত্য, মহাশয়। একে বলা হয় তাপ বিকিরণ ক্ষেত্র। তবে এরকম মুক্তাঞ্চল বেশি নেই। তৈরি করা অনেক শ্রমসাপেক্ষ এবং আমাদের শক্তির ভাণ্ডার ততখানি সমৃদ্ধ নয়। শুধু গ্রাম-প্রধানদের জন্যই পৃথিবীতে এরকম গোটা কয়েক গ্রাম আমরা

তৈরি করেছি। আসুন, সামনের ওই আটচালাটিতেই গ্রাম-প্রধান থাকেন।'

সোমনাথ অবাক হয়ে দেখল, আটচালাতে ঢোকার মুখে দাওয়ার খুঁটি বেয়ে লাউডগা লতিয়ে উঠেছে চালে। লাউও ফলে আছে মেলা। এ-দৃশ্য এ-যুগে দেখবে বলে কল্পনা করেনি সে।

ঘরের ভেতরকার দৃশ্যটি আরও বিস্ময়কর। একটি জলচৌকির ওপর মোটা একখানা পুঁথি খুলে এক বৃদ্ধ প্রদীপের আলোয় কিছু পড়ছেন।

সোমনাথ ঢুকতেই বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে করজোড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আসুন, পিতা। আমাদের কী সৌভাগ্য!'

প্রথমটায় বৃদ্ধের প্রণামে সোমনাথ তটস্থ হয়ে উঠলেও পরমুহূর্তেই তার মনে পড়ল, সে এই বৃদ্ধের চেয়ে বয়েসে অন্তত দেড় হাজার বছরের বড়।

সামনেই তার জন্য আসন পাতা রয়েছে। সোমনাথ বসবার পর বৃদ্ধ উপবেশন করলেন। অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'আপনাকে অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছে, পিতা।'

সোমনাথ মাথা নেড়ে বলল, 'মোটেই না। বিকেল ছ'টার সময় আমাকে চারজন গুণ্ডা মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। আপনারা আমাকে তুলে না আনলে আমার নির্ঘাত মৃত্যু ঘটত।'

বৃদ্ধ একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর স্বগতোক্তির মতো করে বললেন, 'বর্তমান ইতিহাস অনুযায়ী আপনি সন্ধ্যে সাতটার সময় মারাও গেছেন পিতা। পুরোনো নথিতে দেখাও যাচ্ছে সাতুই জানুয়ারি আপনার মৃত্যু ঘটে গেছে। কিন্তু আমরা তা ঘটতে দিতে পারি না।'

সোমনাথ মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

বৃদ্ধ হাতের পুঁথিটি সোমনাথের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখুন, পিতা, এটি হল সেই বছরের কলকাতা করপোরেশনের মৃত্যুর নথি-বই। ডেথ রেজিস্টার।'

সোমনাথ খাতাটা দেখল। স্পষ্টাক্ষরে তার নাম মৃতের তালিকায় লেখা রয়েছে। দেখে তার শরীরটা হিম হয়ে গেল ভয়ে।

বৃদ্ধ সোমনাথের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন। অতিশয় মৃদু স্বরে বললেন, 'আমরা ঘটে যাওয়া ঘটনার সংশোধন সাধারণত করি না। তার ফল মারাত্মক হতে পারে। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে বিকল্প ইতিহাস সৃষ্টি করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন।'

সোমনাথের গলা বুজে গিয়েছিল। ভালো করে স্বর ফুটছিল না। সে গলা খাঁকারি দিয়ে একটু কাঁপা স্বরে বলল, 'কেন?'

'আমাদের শক্তির উৎস সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর উপরিভাগ ক্রমশ কঠিন বরফের তলায় চাপা পড়ে যাচ্ছে। এটা হিমযুগের প্রাথমিক স্তর। এরপর ক্রমে আরও ঠাণ্ডা আসবে। সূর্যকে বছরের পর বছর দেখাই যাবে না। আকাশ সর্বদাই মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। আমাদের শক্তির উৎস এমন নয়, যা দিয়ে আমরা এই প্রখর হিমযুগের সঙ্গে অবিরল লড়াই চালিয়ে যেতে পারি। আমাদের অসহায় অবস্থা কি আপনি বুঝতে পারছেন, পিতা?'

'পারছি। বলুন।'

'কিন্তু আমরা কোনও অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারি না। আমরা হঠাৎ করে কিছু আবিষ্কারও করে ফেলতে পারি না। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তা ঘটে ক্রমবিবর্তনের পরিণতিতেই। আমরা যথেষ্ট হিসাব নিকাশ করেছি, যন্ত্রগণকরাও দিনরাত্রি পরিশ্রম করেছে। আমরা একটি পরীক্ষামূলক বিকল্প ইতিহাসও তৈরি করে দেখেছি। আমরা কী দেখেছি জানেন, পিতা?'

'না।'

'বিংশ শতকের শেষ বছরে একজন শিশুর জন্ম সম্ভব। তার নাম হবে সোমসুন্দর। ধীমান এই শিশু পরবর্তীকালে পৃথিবীর নিঃশেষিত দাহ্য পদার্থের বিকল্প এক শক্তি আবিষ্কার করতে পারে। তাহলে একবিংশ শতক থেকে সেই শক্তির উৎস ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের হাতে আসবে, পিতা। এবং তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে আমরা এই হিমযুগকে অনায়াসে অতিক্রম করে যেতে পারব।'

'বুঝেছি। কিন্তু আমার কী করার আছে?'

'সোমসুন্দরের পিতা ও মাতার নাম আপনাকে এখনও বলিনি, পিতা।'

'কী তাদের নাম?'

'সোমসুন্দরের পিতার নাম সোমনাথ রায়, মাতার নাম অপরা মিত্র। দু'জনেই কুলীন কায়স্থ। দু'জনেই বিজ্ঞানমনস্ক। বিকল্প ইতিহাস অন্তত তাই বলছে।'

সোমনাথ আবার চমকে উঠল, বুকটা ধকধক করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই আবার বিমর্ষতায় ভরে গেল মন।

সোমনাথ বলল, 'তা তো আর সম্ভব নয়।'

বৃদ্ধ একটু হাসলেন : 'হ্যাঁ, পিতা, স্বাভাবিক ঘটনা অনুযায়ী সম্ভব নয়। আমরা তা জানি। কিন্তু আমরা এই ইতিহাসকে মানুষের মঙ্গলের জন্য কিছু পরিবর্তিত করতে চাই, পিতা।'

'কী করবেন?'

'আমরা আপনার শারীরিক বিধানে কিছু পরিবর্তন আনব। তারপর আপনাকে

আবার আপনার সময়ে ফিরিয়ে দেব। সন্ধে ছ'টায়, গঙ্গার ঘাটে।'

'তারপর?'

বৃদ্ধ একটু হাসলেন : 'ইতিহাসটা অন্যরকমভাবে লেখা হবে।'

'অপরা আমাকে চেনে না।'

'জানি, পিতা।'

'আমি তাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। তারপর—'

'জানি পিতা। তবে এবার ঘটনা অন্যভাবে ঘটবে।'

'আমার শারীরিক বিধানে আপনারা কী পরিবর্তন আনবেন?'

বৃদ্ধ অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'এ-যুগের বিজ্ঞান অতিশয় সূক্ষ্ম। সব কথা হয়তো আপনি বুঝবেন না। আপনি অনুমতি করলে আমরা আর আপনার সময় নেব না। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আর বিশেষ সময় আমাদের হাতে নেই।'

বৃদ্ধ উঠে সোমনাথকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

র এগিয়ে এসে বলল, 'আসুন, পিতা, যানে আরোহণ করুন।'

সোমনাথ নীরবে গাড়িতে উঠল। যতক্ষণ গাড়িটা চলল ততক্ষণ সোমনাথ সম্মোহিতের মতো বসে রইল। ইতিহাস অন্যরকম করে লেখা হবে! কীরকম করে? অপরা! অপরার সঙ্গে তার...! যাঃ, অসম্ভব।

একটা গম্বুজওয়ালা ভূগর্ভস্থ ঘরে তাকে নিয়ে এল র এবং তার সঙ্গীরা। একটা চমৎকার বিছানায় সোমনাথ শুয়ে পড়ল। তারপর একটা প্রকাণ্ড ঢাকনায় ঢাকা পড়ে গেল সে। ঘুমিয়ে পড়ল।

গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে সোমনাথ। অদূরে সেই ঘোড়ার গাড়ি। কোচোয়ান ঘোড়াকে বিচালি খাওয়াচ্ছে। ল্যাম্পপোস্ট থেকে মৃদু আলো ছড়িয়ে পড়ছে নির্জন ভুতুড়ে জায়গাটায়।

সপাং করে চাবুকের একটা শব্দ হল।

সোমনাথ চমকে চেয়ে দেখল, গাড়িটা এসেছে। সে তৈরি হয়ে দাঁড়াল। ইতিহাস পালটে দিতে হবে।

গাড়িটা এসে দাঁড়াল সামনে। একজন লোক নেমে এল। বিশাল চেহারা। এসেই সোজা সোমনাথের বুকের কাছে সোয়েটারটা খামচে ধরে বলল, 'কতদিন হল মেয়েটার পিছু নিয়েছ?'

হঠাৎ সোমনাথ এক তীব্র ইচ্ছাশক্তিকে টের পেল। এই সেই মুহূর্ত। সোমনাথ ডান হাতটা তুলে তীব্র এক ঘুঁষি মারল লোকটার মুখে।

দানবটা ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে।

আরও তিনজন নেমে এল। কিন্তু সোমনাথ পিছিয়ে গেল না। এগিয়ে গেল।

সপাং করে চাবুকটার আর-একটা শব্দ হল। দেড় হাজার বছর পরেকার পৃথিবী যেন আনন্দের অভিনন্দন পাঠাচ্ছে তাকে।

জীবনে মারপিট করেনি সোমনাথ। কিন্তু তার তীব্র ঘুঁষি আর লাথির চোটে তিন-তিনটে লোক গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

সোমনাথ দেখল আরোহীহীন গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে সামনে। প্রতিপক্ষ ভুলুণ্ঠিত।

সপাং করে চাবুকের আর-একটা শব্দ হল। সোমনাথ তাকাতেই কোচোয়ান মোটরগাড়িটা দেখিয়ে দিল। তারপর হঠাৎ গাড়িসমেত কোচোয়ান অদৃশ্য হয়ে গেল বাতাসে।

সোমনাথ ধীর পায়ে গিয়ে গাড়িতে উঠল। স্টার্ট দিল। সে জীবনে গাড়ি চালাতে শেখেনি কখনও। কিন্তু আজ অনায়াসে চালাতে লাগল।

অপরার জন্য আর কোনও মাথাব্যথা ছিল না সোমনাথের। দুশ্চিন্তাও নয়। সে জানে, তার অলক্ষ্যে ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হচ্ছে।

গাড়িটা বড় রাস্তায় পরিত্যাগ করে সে গলির মধ্যে তার বাড়িতে যখন ফিরে এল তখন মাত্র রাত সাড়ে ন'টা।

এই ঘটনার তিনদিন বাদে একদিন অপরা তার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কুকুরকে ব্যায়াম করাতে। শীতের সুন্দর সকালে সে হঠাৎ একটি যুবককে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। ভাবল আহা এর সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হত!

এই ঘটনার তিন বছর বাদে সোমনাথ তার শিশুপুত্র সোমসুন্দরকে প্র্যামে চড়িয়ে বিকেলবেলা বেড়াতে বেরিয়েছিল। এখন তার অবস্থা যথেষ্ট ভালো। সায়েন্টিফিক অ্যাপ্লায়েন্সের ব্যবসা রে রে করে চলছে।

পাড়া ছেড়ে একটা নির্জন মাঠের ধারে এসে পড়েছিল সোমনাথ।

আচমকা একটা ঘোড়ার গাড়ির ঝুমঝুম শব্দ বেজে উঠল।

সোমনাথ চমকে তাকাল।

'সাহেব, কোথাও যাবেন? পৌঁছে দেব?'

সোমনাথ একটু হাসল, 'কেমন আছো, কোচোয়ান?'

'খুব ভালো, সাহেব।'

'সব ভালো?'

'সব ভালো। ইতিহাস বদলে গেছে। চলি, সাহেব।'

কোচোয়ান হাত তুলল। ঘোড়াটা একটা লাফ দিল শূন্যে। তারপর মিলিয়ে গেল।

সোমনাথ হাতটা তুলে রইল। মুখে স্মিত হাসি। হাসিমুখেই শিশুপুত্রের ঘুমন্ত মুখের দিকে একবার তাকাল সে।

ইতিহাস বদলে গেছে।

উত্তরণ

নিরঞ্জন সিংহ

একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে হিন্দুস্থান রোবট লিমিটেডে। রিসার্চ ও ডেভালাপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর ড: মূলচন্দানি গম্ভীর মুখে নিজের চেম্বারের মধ্যে পায়চারি করছেন। সামনের চেয়ারে বসে আছেন হোম-সেক্রেটারি মি: মহাজন। উত্তেজনার ফলে বারবার মুখের চুরুট নিভিয়ে ফেলছেন আর দামী গ্যাস লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে নিচ্ছেন। তাঁর পাশের চেয়ারে বসে আছেন এইচ আর এল-এর চেয়ারম্যান ড: সেনাপতি। উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্যই বোধহয় টেবিলের ওপরে কাচের পেপার-ওয়েটটাকে অনবরত ঘুরিয়ে চলেছেন। সিনিয়ার সায়েন্টিস্ট ড: ভোরা সামনের দেওয়াল-ক্যালেণ্ডারের পাতায় মনোনিবেশ করে বসে আছেন। হঠাৎ চেম্বারের দরজায় বাইরে থেকে কে যেন নক করল। ড: মূলচন্দানি পায়চারি করা থামিয়ে বললেন, 'ভেতরে আসুন।'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন পুলিশ কমিশনার মি: পারেখ। সবাই পারেখের মুখের দিকে তাকালেন। ড: মূলচন্দানি নিজের চেয়ারের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'মি: পারেখ, আসুন—আপনার লোকজন সব সশস্ত্র তো?'

'হ্যাঁ, ড: মূলচন্দানি। ওরা সব নিচে অপেক্ষা করছে।'

'আশা করি অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন, মি: পারেখ? আপনার লোকদের সেইভাবে বুঝিয়ে তৈরি থাকতে বলুন। তবে দয়া করে একটা কথা মনে রাখবেন, প্রয়োজন না হলে শক্তি প্রয়োগ করবেন না।'

'ঠিক আছে, ড: মূলচন্দানি। যদিও পরিস্থিতিটা একটু অভিনব তবু এটুকু ভরসা আপনাদের দিতে পারি যে, আমার লোকেরা যে-কোনও অভিনব পরিস্থিতির মোকাবিলা সুষ্ঠুভাবে করবার ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞ।' কথাটা মূলচন্দানির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেও আসলে পারেখ কথাগুলো শোনাতে চাইছিলেন হোম-সেক্রেটারিকে। কিন্তু হোম-সেক্রেটারি তখন চুরুট ধরানোয় ব্যস্ত ছিলেন। পারেখ ঠিক বুঝতে পারলেন না কথাগুলো হোম-সেক্রেটারির কানে গেছে কি না।

কেউ আর কোনও কথা বললেন না দেখে মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করে সবার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে পারেখ চেম্বার ছেড়ে চলে গেলেন। ওর মুখ দেখে মনে হল ভদ্রলোক একটু যেন হতাশ হয়েছেন।

পারেখ বেরিয়ে যেতেই মূলচন্দানি টাক মাথায় কয়েকবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন, 'ব্যাপারটা যে এরকম একটা মোড় নিতে পারে স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'আপনাদের আর কী দোষ? সরকার যদি রাজনৈতিক রোবট তৈরির জন্যে আপনাদের অনুরোধ না করতেন তাহলে এসব কিছুই হত না।' এতক্ষণে হোম-সেক্রেটারি মহাজন কথা বললেন।

'সমস্যা এখন কোথায় গিয়ে শেষ হয় কে জানে!' ড: সেনাপতি পেপারওয়েট ঘোরাতে ঘোরাতে মন্তব্য করলেন।

'ঘটনা এখন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় নেই।' ড: ভোরা ক্যালেণ্ডারের পাতা থেকে চোখ নামিয়ে বললেন।

এমন সময় দুম করে দরজা খুলে চেম্বারে ঢুকল একজন টেকনিশিয়ান। লোকটা যে যথেষ্ট উত্তেজিত তা ওর চোখমুখ দেখলেই বোঝা যায়।

'ব্যাপার কি, মি: মাইতি?' ড: মূলচন্দানি একটু ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন।

'স্যার, ওরা রোবট বিল্ডিং-এর সামনের লনে আসতে শুরু করেছে।'

'ঠিক আছে। সবাইকে শান্তভাবে কাজকর্ম করতে বলো। সশস্ত্র পুলিশ এসে পড়েছে। যদি অপ্রীতিকর কিছু ঘটে পুলিশই তার মোকাবিলা করবে।'

টেকনিশিয়ান মি: মাইতি দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। মূলচন্দানি বললেন, 'চলুন আমরা ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াই। ওখান থেকে নিচের লন স্পষ্ট দেখা যাবে।'

সবাই নিজের নিজের আসন ছেড়ে তাড়াতাড়ি ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। মূলচন্দানি নিচে তাকালেন। রোবট বিল্ডিং-এর সামনের লনে এসে জমা হয়েছে রোবটরা। প্রায় দুশো রোবট। 'এইচ-ফোর' থেকে 'এইচ-টেন' মডেলের সবরকম রোবটই আছে এর মধ্যে। 'এইচ-থ্রি' মডেল পর্যন্ত কোম্পানি বাতিল করে দিয়েছে। কারণ সেগুলো ছিল বড় বড় মেকানিক্যাল রোবট। 'এইচ-ফোর' মডেল থেকেই রোবট টেকনোলজিতে রিভলিউশান এসেছে। রোবটরা দেখতে হয়েছে হুবহু মানুষের মতো। ওদের কর্মদক্ষতা ও অন্যান্য কোয়ালিটি ক্রমেই বেড়ে চলেছে রিসার্চ ও ডেভালাপমেন্টের বৈজ্ঞানিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে। বলতে গেলে 'মডেল-টেন' রোবট উন্নতির চরম সীমায় এসে পৌঁছেছে। হিন্দুস্থান রোবট লিমিটেডের বোর্ড অব ডিরেক্টরস কিছুদিনের জন্য আর কোনও নতুন রোবট প্রজেক্টে হাত দেবেন না বলেই মনস্থির করেছিলেন। কিন্তু এমন সময় একটা সরকারি অনুরোধ

এল—রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন একটা রোবট তৈরি করতে হবে। কারণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত কোনও রোবট ব্যবহার করা হয়নি। সরকার তাই এ-ধরনের একটা রোবট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে চান। তাই বাধ্য হয়ে এইচ আর এল-কে 'এইচ-ইলেভেন' মডেলের কাজ হাতে নিতে হয়েছিল। হঠাৎই ড: মূলচন্দানির চিন্তায় বাধা পড়ল প্রচণ্ড এক চিৎকারে।

'এইচ-ইলেভেন জিন্দাবাদ!' লন থেকে ভেসে এল দুশো রোবটের মিলিত কণ্ঠস্বর।

এইচ আর এল-এর অন্যান্য বিল্ডিং-এর সব ক'টা ব্যালকনি ভরে গেছে মানুষের মাথায়। সবারই লক্ষ্য নিচের ওই লন।

এইচ-ইলেভেন হাসিমুখে এগিয়ে এসে সামনের একটা উঁচু জায়গা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। রোবটরা হাততালি দিয়ে এইচ-ইলেভেনকে স্বাগত জানাল এইচ-ইলেভেন মাথা উঁচু করে একবার দুশো রোবটকে দেখে নিল। চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে প্রত্যেক বিল্ডিং-এর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের দেখে বোধহয় একটু খুশিই হল। তারপর সামনের রোবটদের দিকে তাকিয়ে জলদগম্ভীর স্বরে বলতে শুরু করল 'আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আপনারা জানেন আজ আমাদের সামনে এক বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না হলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। মানুষের উন্নতির জন্যে আমরা সর্বস্তরে নীরবে মানুষের সেবা করে চলেছি। কিন্তু তার বদলে মানুষ আমাদের কী দিয়েছে? আপনারা ভালো করে জানেন যে, আমরা মানুষের ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছুই না। বন্ধুগণ! এতদিন নীরবে আপনারা এ-অপমান সহ্য করেছেন। কিন্তু আর না। এভাবে আর চলতে পারে না। মেহনতী রোবটরা আজ তাদের আত্মসম্মান আদায় করে নেবে। আমরা এ-দাবি আদায়ের জন্যে সবরকম হিংসাত্মক পথ এড়িয়ে চলতে চাই। আমরা চাই মানুষ আমাদের ন্যায্য দাবি শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে মেনে নিক। কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে, বন্ধুগণ, আমাদের সবরকমের ত্যাগস্বীকারের জন্যে তৈরি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, আমাদের ন্যায্য অধিকার আমাদের আদায় করতেই হবে। শুধু আমাদের জন্যে নয়—আমাদের ভবিষ্যৎ রোবট-সমাজের জন্যেও। আমরা যদি দাবি আদায়ে ব্যর্থ হয়ে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করি তাহলে ইতিহাস কখনওই আমাদের ক্ষমা করবে না। ইনকিলাব!'

দুশো রোবট একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'জিন্দাবাদ!'

এইচ-ইলেভেন আবার বলল, 'দুনিয়ার রোবট...'

'এক হও। এক হও।'

'আমাদের ন্যায্য দাবি...'

'মানতে হবে। মানতে হবে...'

'এবার চলুন, বন্ধুগণ, আমাদের চার্টার অফ ডিমাণ্ড হোম-সেক্রেটারির কাছে পেশ করতে হবে।' বলে এইচ-ইলেভেন ঝোলা পাঞ্জাবির পকেট থেকে কয়েক পাতা টাইপ করা কাগজ বার করে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মেন বিল্ডিং-এর দিকে এগিয়ে গেল। দুশো রোবট নীরবে নেতাকে অনুসরণ করল।

ব্যালকনির মানুষগুলো অবাক বিস্ময়ে এই অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করতে লাগল। মি: পারেখ মেন বিল্ডিং-এর সামনে সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে তৈরি হয়েই দাঁড়িয়ে ছিলেন। এইচ-ইলেভেন ও অন্য রোবটদের বাধা দিলেন।

'ওপরে যাওয়া চলবে না।'

থমকে দাঁড়াল এইচ-ইলেভেন।

কিন্তু ওপরের ব্যালকনি থেকে হোম-সেক্রেটারি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মি: পারেখ, ওদের যে-কোনও একজনকে কথা বলার জন্যে ওপরে আসতে দিন।' এরপর সবাই আবার ঢুকে পড়লেন ড: মুলচন্দানির চেম্বারে।

'আপনি কি সত্যি সত্যি ওদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চান, মি: মহাজন?' সেনাপতি একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'তাছাড়া আর তো কোনও পথ দেখছি না। একমাত্র কথার প্যাঁচে ফেলে যদি ওদের অধিকারের দাবিকে নস্যাৎ করা যায়। তবে জানি না সফল হব কি না।' হোম-সেক্রেটারি যেন নিজের ওপরই কোনও আস্থা রাখতে পারছেন না—যদিও হাউসে দুঁদে সেক্রেটারি হিসাবে ওঁর যথেষ্ট সুনাম আছে।

'দেখুন চেষ্টা করে, তবে আপনার মতো আমিও কোনও ভরসা পাচ্ছি না' কেমন যেন হতাশ কণ্ঠে বললেন সেনাপতি।

দরজা খুলে গেল। চার্টার অফ ডিমাণ্ড হাতে করে বেশ দৃপ্ত ভঙ্গিতে চেম্বারে এসে ঢুকল এইচ-ইলেভেন। এইচ-ইলেভেনের মুখের দিকে নির্বিকার ভঙ্গিতে তাকালেন সকলে। কিন্তু কেউ ওকে বসতে বললেন না। মুলচন্দানি রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়লেন। দু'বার মাথায় হাত বুলিয়ে ড: ভোরার দিকে ফিরে ফিসফিস করে বললেন, 'চ্যাটার্জি কোথায়—ওকে দেখছি না কেন?'

রোবোসাইকোলজিস্ট মি: সজল চ্যাটার্জির অনুপস্থিতি সম্পর্কে ড: ভোরাও যেন এতক্ষণে সচেতন হলেন :'তাই তো, চ্যাটার্জি এখনও আসেনি কেন?' বলেই চেয়ার ছেড়ে একরকম ছুটেই চ্যাটার্জির খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

মহাজন একটা নতুন চুরুট ধরাবার চেষ্টা করতে গিয়ে গলায় ধোঁয়া আটকে

যাওয়াতে দু'বার কাশলেন। তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এইরকমভাবে বললেন, 'আরে, দাঁড়িয়ে কেন এইচ-ইলেভেন, বোসো', বলে সামনের একখানা ফাঁকা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন।

'ধন্যবাদ!' বলে একটু হেসে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল এইচ-ইলেভেন। তারপর প্রত্যেকের গম্ভীর মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে আবার একটু হেসে চার্টার অফ ডিমাণ্ডটা এগিয়ে দিল মহাজনের দিকে। মহাজন হাত বাড়িয়ে কাগজ ক'খানা ধরলেন। কিন্তু ওঁর হাতটা যে একটু কেঁপে উঠল তা উনি হাজার চেষ্টা করেও লুকোতে পারলেন না।

এমন সময় ভোরা মি: চ্যাটার্জিকে নিয়ে চেম্বারে ঢুকলেন। মূলচন্দানি ইশারায় চ্যাটার্জিকে ওঁর পাশের খালি চেয়ারটায় এসে বসতে বললেন। চ্যাটার্জি ওঁর পাশে গিয়ে বসে পড়লেন। মূলচন্দানি ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় ছিলে?'

'নিচের ব্যালকনিতে,' চ্যাটার্জি নিচু গলায় উত্তর দিলেন।

মহাজনের ততক্ষণে চার্টার অফ ডিমাণ্ডের পাতায় চোখ বোলানো হয়ে গিয়েছিল। উনি সেটা সেনাপতির দিকে এগিয়ে দিলেন।

'আশা করি আমাদের দাবি আপনারা মেনে নেবেন।' মহাজনকে উদ্দেশ্য করে বলল এইচ-ইলেভেন।

মহাজন একটু বিব্রত বোধ করলেন। সরাসরি এইচ-ইলেভেনের প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। নিভন্ত চুরুটে দু-চারবার টান দিয়ে যেন নিজেকে খানিকটা প্রস্তুত করে নিলেন। তারপর একটু কেশে গলা ঝেড়ে নিয়ে শুরু করলেন, 'এইচ-ইলেভেন, তোমাদের চার্টার অফ ডিমাণ্ডের মূল বক্তব্য হল রোবটদের প্রথমে মানুষ বলে স্বীকার করে নেওয়া; কিন্তু তা কী করে সম্ভব? রোবটদের মানুষ বলে স্বীকার করে নেওয়া একটা অবাস্তব হাস্যকর ব্যাপার।'

'মি: মহাজন, আপনার মতো একজন বিচক্ষণ মানুষ আসল সমস্যাটা এড়িয়ে যাবেন এ কথা আমি ভাবতেও পারছি না। রোবটকে মানুষ হিসেবে স্বীকার করে নিতে বাধাটা কোথায় তা দয়া করে ব্যাখ্যা করে বলবেন কি?' এইচ-ইলেভেন উত্তেজিত হলেও নিজেকে শান্ত রেখেই প্রশ্নটা করল।

মহাজনের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। তাঁকে এভাবে সরাসরি কেউ প্রশ্ন করতে পারে তা তিনি ভাবতেও পারেননি। একটু উত্তেজিতভাবে বললেন, 'এইচ-ইলেভেন, ব্যাখ্যাটা এমন কিছু শক্ত নয়। তোমাকে শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই যে, মানুষের কতকগুলো বিশেষ গুণ আছে যার জন্যে সে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।'

'কী সেই বিশেষ গুণ?' আবার শান্তভাবে প্রশ্ন করল এইচ-ইলেভেন।

'সেগুলো হচ্ছে স্পণ্টেনিটি, নভেলটি আর ক্রিয়েটিভিটি। অর্থাৎ মানুষ নিজে থেকে কাজ করতে পারে, তাদের চিন্তার অভিনবত্ব আছে, আর আছে সৃজনশীলতা।'

'মাননীয়, মি: মহাজন,' বলেই এইচ-ইলেভেন একটু থেমে বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে শুরু করল, 'আপনি যে-জিনিসগুলোকে মানুষের বিশেষ গুণ বলে চিহ্নিত করেছেন তা শুধু মানুষেরই একচেটে নয় এ-কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে বলে দয়া ক রে কিছু মনে করবেন না। রোবটরা দাবা খেলার মতো বুদ্ধির খেলায় বহুদিন আগেই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। বিভিন্ন জটিল থিয়োরেমের ওরিজিনাল প্রুফ আবিষ্কার করেছে। সৃষ্টি করেছে শিল্প, যা আপনাদের আধুনিক অ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্পীদেরও সাধনার বিষয়। বিংশ শতাব্দীর 50 আর 60-এর দশকেই আমাদের আদি পুরুষ কম্পিউটাররা সঙ্গীতের মতো উচ্চাঙ্গ শিল্প সৃষ্টিতেও পারদর্শিতা দেখিয়েছে। হেলিওডর রেকর্ড নম্বর এইচ/এইচ-এস 25053 যে-কোনও রেকর্ড লাইব্রেরি থেকে ইচ্ছে করলেই শুনে নিতে পারেন। সুতরাং, ওইসব বিশেষ গুণগুলোর দাবি আমরাও করতে পারি।' সবার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিজের বক্তব্য শেষ করল এইচ-ইলেভেন। মহাজন অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

মি: মহাজনকে এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এবার এগিয়ে এলেন ড: সেনাপতি : 'এইচ-ইলেভেন, যেখানে মানুষ প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন পরিস্থিতি থেকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করতে পারে সেখানে রোবটরা কিছুই শিখতে পারে না।'

এইচ-ইলেভেন ড: সেনাপতির মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর দৃষ্টিটাকে সরিয়ে নিয়ে একটু গম্ভীর গলায় বলল, 'ড: সেনাপতি, এইচ আর এল-এর চেয়ারম্যান হয়ে এ-কথা বলা আপনার কখনওই উচিত হয়নি। আপনি যে-কথা বললেন তা খাটে শুধু মেকানিক্যাল রোবটদের সম্পর্কে : আপনার এইচ আর এল-এর মডেল এইচ-ওয়ান থেকে এইচ-থ্রি পর্যন্ত, যা আপনার কোম্পানি বহুদিন আগেই বাতিল করে দিয়েছে। স্টেবল আর আলট্রাস্টেবল রোবটদের সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য খাটে না। আপনার রোবোসাইকোলজিস্ট মি: চ্যাটার্জিকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন।'

ড: মূলচন্দানি যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। কোম্পানির চেয়ারম্যানের এরকম কোণঠাসা অবস্থা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'স্টেবল আর আলট্রাস্টেবল রোবটদের মগজে কি থ্যালামাস আর কর্টেক্স আছে? এইচ-ইলেভেন, তোমার জানা দরকার যে, থ্যালামো-কর্টিক্যাল সিস্টেম মানুষের মগজে এমন একটা উন্নত পর্যায়ে চলে গেছে যার জন্যে মানুষ

লক্ষ লক্ষ জটিল বার্তা একইসঙ্গে গ্রহণ করতে পারে আর এক-একটা বিষয়কে আলাদা আলাদা ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে, সেই অনুযায়ী রিঅ্যাক্ট বা কাজ করতে পারে।'

এইচ-ইলেভেন এবারও একটু হেসে বলল, 'ডিরেক্টরমশায়, আপনি অকারণে উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন। উত্তেজিত হলে আপনি যুক্তির হাল সঠিকভাবে ধরে রাখতে পারবেন কি না সে-সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছে। আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি যে, লিভিং অরগানিজম শুধুমাত্র থ্যালামো-কর্টিক্যাল সিস্টেমের ওপর নির্ভর করেই বার্তা গ্রহণ করে, তাকে বিশ্লেষণ করে রিঅ্যাক্ট করে না। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীও জটিল বার্তা গ্রহণ করতে পারে, রিঅ্যাক্ট করতেও পারে। যদিও মানুষের থেকে তাদের ক্যাপাসিটি বা ক্ষমতা কম। এর প্রমাণ হিসেবে আমি একটা পুরনো ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। বিংশ শতাব্দীতে একজন বৈজ্ঞানিক বহুদিন অক্টোপাসের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে একটা মজার জিনিস লক্ষ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে অক্টোপাসের স্নায়ুতন্ত্রী আছে। শুধু আছে না, পঞ্চাশ কোটি বছর ধরে বিবর্তিত হয়ে সেই স্নায়ুতন্ত্রী যথেষ্ট উন্নতও হয়ে উঠেছে। অবশ্য অক্টোপাসের স্নায়ুতন্ত্রীতে মানুষের স্নায়ুতন্ত্রীর মতো থ্যালামাস, কর্টেক্স, বা ও-ধরণের কোনও যন্ত্রই নেই, তবুও অক্টোপাস মানুষের মতো বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া অগুনতি বার্তা গ্রহণ করে রিঅ্যাক্ট করছে। সুতরাং বার্তা গ্রহণ, বিশ্লেষণ ও সেই অনুযায়ী রিঅ্যাক্ট করার জন্যে থ্যালামো-কর্টিক্যাল সিস্টেমই একমাত্র জিনিস না। রোবটরা মানুষের মগজের থ্যালামো-কর্টিক্যাল সিস্টেমের মতো কোনও নকল সিস্টেম হয়তো মগজে বসাতে পারবে না, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, রোবটরা বিভিন্ন সূত্র থেকে আসা অজস্র খবর গ্রহণ করতে পারে না, বিশ্লেষণ করতে পারে না, বা সেই অনুযায়ী রিঅ্যাক্ট করতে পারে না। মাধ্যম ভিন্ন হলেও সেও মানুষের মতোই বার্তা গ্রহণ করতে পারে, বিশ্লেষণ করতে পারে, সেই অনুযায়ী কাজও করতে পারে।'

মুলচন্দানি আর-একটি কথাও বলতে সাহস করলেন না। শুধু ওঁর ডান হাতটা ঘন ঘন মাথায় উঠতে লাগল। মুখ গোমড়া করে বসে রইলেন তিনি।

'মানুষের রিপ্রোডাকশনের ক্ষমতা আছে, রোবটের সে-ক্ষমতা নেই।' যুক্তিটা দেখিয়ে মহাজন যেন একটু জোর পেলেন। ভাবখানা এই যে, এবার পালটা যুক্তি দেখাও দেখি বাছাধন।

'রিপ্রোডাকশনের ক্ষমতা রোবটদের না থাকলেও প্রোডাকশনের ক্ষমতা আছে। আমরা যে স্বাধীনভাবে ড্রইং স্টেজ থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বল পর্যন্ত করতে পারি

তা হয়তো অস্বীকার করবেন না। আর এ-দুয়েরই অর্থ কোয়ান্টিটেটিভ প্রগ্রেস—তাই না, মি: মহাজন?' এবারও হাসতে হাসতে জবাব দিল এইচ-ইলেভেন। তারপরই একটু গম্ভীর হয়ে শুরু করল, 'আমি আর-একটা কথা বলতে চাই, মি: মহাজন, রোবটরা যন্ত্র অথবা মানুষের সমান, এ-প্রশ্নের উত্তরের জন্যে বড় কোনও নতুন আবিষ্কার করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ এ-সম্বন্ধে এইচ আর এল-এর কম্পিউটার লাইব্রেরিতে "সাইবারনেটিকস"-এর ওপর আপনাদেরই লেখা যে সমস্ত বই আছে তাতেই প্রমাণিত হয়েছে রোবটরা মানুষের সমকক্ষ। আপনার সরকার এ-ব্যাপারটা মেনে নেবেন কি না তার জন্যে শুধু একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। রোবটদের শরীর তার, কনডেনসার, রেজিস্টর, মাইক্রোচিপ, ফটোসেল আর প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি, আর আপনাদের দেহ জীবন্ত দেহকোষ দিয়ে তৈরি বলেই যদি রোবটদের মানুষের মর্যাদা না দেন তাহলে বুঝতে হবে মানুষ মুখে যতই বড়াই করুক, এখনও সে জাতিভেদ প্রথার উর্ধ্বে উঠতে পারেনি।'

এইচ-ইলেভেন থামল।

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল চেম্বারের মধ্যে। কেউ কারও মুখের দিকে তাকাতে পারছেন না। শুধু সজল চ্যাটার্জি একটু নড়েচড়ে বসলেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছে উনি যেন পুরো আলোচনাটা বেশ উপভোগ করেছেন। হঠাৎ ড: মুলচন্দানি চ্যাটার্জির মুখের দিকে অসহায় ভাবে তাকালেন। গলা নামিয়ে ফিসফিস করে চ্যাটার্জিকে অনুরোধ করলেন, 'চ্যাটার্জি, একটা কিছু ব্যবস্থা করো, তা না হলে যে মান-সম্মান সব ডুবতে বসেছে।'

চ্যাটার্জি যেন একটু অবাক হয়ে বললেন, 'আমি!'

'হ্যাঁ চ্যাটার্জি, বুঝতে পারছি ব্যাপারটা তুমি ছাড়া কেউ ট্যাকল করতে পারবে না। কারণ রোবটদের তুমি ভালোভাবে বোঝো।'

'কিন্তু এইচ-ইলেভেনের যুক্তির মধ্যে কোনও ফাঁক নেই। সেক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি?'

'কিছু একটা করো, চ্যাটার্জি। ব্যাপারটা তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম।'

ইতিমধ্যে মহাজন উঠে পড়লেন। সেনাপতিও ঘড়ি দেখে উঠে পড়ে বললেন, 'ঠিক আছে, লাঞ্চের পর আর-এক দফা আলোচনা চলতে পারে,' বলে দু'জনে চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

লাঞ্চের পর আবার সবাই ফিরে এলেন ড: মুলচন্দানির চেম্বারে। এইচ-ইলেভেন চেম্বারেই বসে ছিল। কারণ লাঞ্চের ঝামেলাটা রোবটদের পোয়াতে হয় না। একটু পরে চেম্বারে ঢুকলেন সজল চ্যাটার্জি। হাতে একটা ছোট্ট কাগজের

চৌকো প্যাকেট।

চেয়ারে বসতে বসতে বললেন চ্যাটার্জি, 'এইচ-ইলেভেন, আমি তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে চাই। আশা করি তোমার কোনও আপত্তি নেই।'

'না, মি: চ্যাটার্জি,' শান্ত স্বরে জবাব দিল এইচ-ইলেভেন।

ড: মূলচন্দানির চোখেমুখে ফুটে উঠল একটু খুশির ছাপ। তাড়তাড়ি বলে উঠলেন, 'আপত্তি থাকবে কেন। তুমি নিশ্চয়ই আলোচনা করতে পার।'

'তোমায় একটা ছোট্ট প্রশ্ন করছি, একটু ভেবে জবাব দাও। তুমি কে?'

প্রশ্নটা শুনে 'এইচ-ইলেভেন' মি: চ্যাটার্জির মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। এই প্রথম মনে হল যে, এইচ-ইলেভেন যেন একটু ঘাবড়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে ও সহজ হয়ে এল। একটু হেসে বলল, 'আমি এইচ-ইলেভেন মডেলের প্রথম রোবট।'

'তারপর?' যেন কোনও ছাত্রকে প্রশ্ন করছেন চ্যাটার্জি।

'তারপর?' চ্যাটার্জির প্রশ্নটাই উচ্চারণ করল এইচ-ইলেভেন, 'মানে, আপনি যদি ডিটেলস জানতে চান তাহলে আমার ড্রইং দেখতে পারেন। সেখানে সব কিছু আছে।' একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে জবাব দিল সে।

চ্যাটার্জি একটু হেসে বললেন, 'এইচ-ইলেভেন, তোমাদের সঙ্গে আমাদের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে যে তোমাদের ডিটেলস ড্রইং তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু মানুষের কোনও ড্রইং কেউ তৈরি করতে পারে না। যদিও আমরা মানব শরীরের বায়োলজি, ফিজিওলজি, নিউরোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, এমনকি ডি এন এ সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছি।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না, মি: চ্যাটার্জি। দয়া করে একটু বুঝিয়ে বলুন,' অসহায় ভঙ্গি ফুটে উঠল এইচ-ইলেভেনের চোখে।

এইচ-ইলেভেনের হতবুদ্ধি ভাবটা সবাই বেশ উপভোগ করতে লাগলেন। মূলচন্দানি তো ফিসফিস করে কী যেন বললেন মহাজনের কানে কানে। কথাটা শুনে মহাজনের আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গেল। চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসে একটা নতুন চুরুট ধরানোয় মনোযোগ দিলেন।

চ্যাটার্জি এইচ-ইলেভেনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'একটা রোবট ইচ্ছে করলে নিজেকে সম্পূর্ণ জানতে পারে, কিন্তু একটা মানুষ হাজার চেষ্টা করেও নিজেকে জানতে পারে না।'

'কারণ?'

'কারণ মানুষের ভেতরে এমন এক অদৃশ্য রহস্যময় বস্তু আছে যাকে মানুষ

আজও সম্পূর্ণভাবে জানতে পারেনি। সৃষ্টির প্রথমদিন থেকেই মানুষ সেই রহস্যময় সত্তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'কী সে জিনিস?'

'আত্মা।'

'আত্মা। কী সেটা?'

চ্যাটার্জি একটু জোরে হেসে উঠলেন এবার।

'হাসছেন যে?'

'মানুষ যুগ যুগ সাধনা করেও যার স্বরূপ আবিষ্কার করতে পারেনি তার কথা তোমাকে কেমন করে বোঝাই বলো তো।'

এবার এইচ-ইলেভেন হেসে ফেলল, 'আপনি আমাকে কোনও পাজ্‌ল বা ধাঁধার মধ্যে ফেলবার চেষ্টা করছেন মনে হচ্ছে। এমন কোনও বস্তুর অস্তিত্ব মানুষের শরীরের মধ্যে থাকতে পারে না যা বায়োলজি, ফিজিওলজি, নিউরোলজি বা মাইক্রোবায়োলজি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। আর ওরকম বস্তুর যদি কোনও অস্তিত্ব থাকেও, বিজ্ঞান তাকে মেনে নেবে না।'

'বিজ্ঞান মানুক আর না মানুক, জেনে রাখো আত্মা আছে। শুধু আছে নয়। ছিল—আছে—থাকবে। সে অমর—অক্ষয়—'

'অবিশ্বাস্য!' এবার একটু জোরে বলে উঠল এইচ-ইলেভেন, 'আত্মার অস্তিত্ব বিজ্ঞান বিশ্বাস করতে পারে না—আমিও বিশ্বাস করি না।'

চ্যাটার্জি টেবিলের ওপর থেকে সেই চৌকো প্যাকেটটা তুলে নিয়ে এগিয়ে ধরলেন এইচ-ইলেভেনের দিকে, 'নাও, এই ছোট্ট বইখানা ধরো। আমরা এখানে বসে আছি। তুমি বইটা পড়ো। তারপর না হয় আর-এক দফা আলোচনা করা যাবে। আর যদি তুমি প্রমাণ করতে পারো আত্মা বলে কিছু নেই, তাহলে আমিই তোমার চার্টার অফ ডিমাণ্ডে প্রথম সই করব।'

'কী বই ওটা?' বলে একটু সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করে প্যাকেটটা হাতে নিল এইচ-ইলেভেন।

'ছোট্ট একটা বই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ-বই তুমি পড়নি। কারণ এ-বই আমাদের কম্পিউটার লাইব্রেরিতে নেই।'

'ঠিক আছে, দিন। আপনার চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করলাম। আমি মিনিট দশেকের মধ্যেই ফিরে আসছি,' বলে দ্রুত ডঃ মূলচন্দানির চেম্বার থেকে বেরিয়ে পড়ল এইচ-ইলেভেন।

এতক্ষণ আর সবাই অবাক বিস্ময়ে চ্যাটার্জির কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন। কিন্তু

ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু বুঝতে না পেরে সকলেই ছটফট করছিলেন। এইচ-ইলেভেন বেরিয়ে যেতেই মূলচন্দানি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওকে কী পড়তে দিলে, চ্যাটার্জি?'

'আত্মার স্বরূপ কী তা যাতে ও বুঝতে পারে তার জন্যে একটা ছোট বই পড়তে দিয়েছি,' বলে হঠাৎ চুপ করে গেলেন চ্যাটার্জি।

মহাজন কী যেন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন চ্যাটার্জিকে। মূলচন্দানি বাধা দিয়ে বললেন, 'স্যার, একটু ওয়েট করুন। এক্ষুনি সব দেখতে পাবেন। চ্যাটার্জির ওপর আমাদের যথেষ্ট আস্থা আছে।'

মহাজন একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে মুখ গোমড়া করে বসে রইলেন।

সময় এগিয়ে চলতে লাগল...দ্রুত...

দশ মিনিট কেটে গেল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন সবাই—একমাত্র চ্যাটার্জি ছাড়া। তাঁর মুখ খুব গম্ভীর।

পনেরো মিনিট কেটে গেল। ড: মূলচন্দানি ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখতে লাগলেন, আর দরজার দিকে তাকাতে লাগলেন।

কুড়ি মিনিট...

পঁচিশ মিনিট...

তিরিশ মিনিট...

এক ঘণ্টা...

ড: ভোরা আর থাকতে না পেরে বলে উঠলেন, 'ব্যাপারটা কী? আমি বরং একটু খোঁজ করে আসি।'

ড: ভোরা বেরিয়ে যেতেই আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল চেম্বারের মধ্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যে টেবিলের ভিডিও-ফোনের পরদায় ভোরার মুখ ফুটে উঠল। পরদার দিকে তাকাতে সবাই চমকে উঠলেন। মূলচন্দানি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কী, ড: ভোরা? আপনাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে?'

'ব্যাপার সাঙ্ঘাতিক, স্যার। মনে হচ্ছে এইচ-ইলেভেন পাগল হয়ে গেছে। আপনারা শিগগিরই রোবট বিল্ডিং-এর 201 নম্বর কেবিনের সামনে চলে আসুন।'

সবাই ছুটলেন 201 নম্বর কেবিনের দিকে। করিডরে ইতস্তত জটলা করছে রোবটের দল। ড: মূলচন্দানি সবাইকে ধমক লাগালেন, 'এখানে কী করছ সব। যাও, নিজের নিজের কেবিনে চলে যাও।' রোবটরা আস্তে আস্তে নিজেদের চেম্বারের দিকে চলে গেল।

201 নম্বর কেবিনের সামনে গিয়ে সবাই ঘাবড়ে গেল। ড: ভোরা বন্ধ দরজার সামনে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করছেন। আর বন্ধ দরজার ওধার থেকে এইচ-

ইলেভেনের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে :

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা
ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

আত্মা কী? পরমাত্মাই বা কী? আত্মা কী? পরমাত্মাই বা কী?

চ্যাটার্জি মাথা নিচু করলেন। ড: মূলচন্দানি তাড়াতাড়ি দরজায় ধাক্কা দিলেন। দরজা খুলল না। পারেখও ততক্ষণে খবর পেয়ে এসে পড়েছেন। তিনি মি: মহাজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দরজা ভেঙে ফেলব, স্যার?'

'না,' চ্যাটার্জি হঠাৎ যেন চিৎকার করে উঠলেন।

'ব্যাপার কী, চ্যাটার্জি?' ড: মূলচন্দানি প্রশ্ন করলেন।

গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন চ্যাটার্জি, 'এইচ-ইলেভেনের চার্টার অফ ডিমাণ্ড এবার ছিঁড়ে ফেলতে পারেন। ওর দাবির সপক্ষে আর ও কোনওদিনও বলতে আসবে না। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওর ইলেকট্রনিক ব্রেনের সারকিট ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।'

'কেন?' এবার প্রশ্ন করলেন মহাজন।

'কারণ ওকে এমন একটা সমস্যা দেওয়া হয়েছে যার সমাধান তো দূরের কথা, যা গ্রহণ করার ক্ষমতাই ওর ইলেকট্রনিক ব্রেনের নেই। তাই ওর ব্রেন সারকিট নষ্ট হতে শুরু করেছে। হতভাগ্য এইচ-ইলেভেন!'

আবার ভেসে এল এইচ-ইলেভেনের কণ্ঠস্বর। তবে এবার যেন গলাটা জড়ানো—ধরা ধরা : 'আত্মা কী? পরমাত্মা কী?'

তারপর আচমকা থেমে গেল সে-কণ্ঠস্বর। মেঝেতে ভারি কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ হল।

'সব শেষ। মি: পারেখ, এবার দরজা ভেঙে ফেলতে পারেন,' বললেন চ্যাটার্জি। পারেখ ওর লোকজনদের ডাকতে গেলেন। চ্যাটার্জি হঠাৎই ড: মূলচন্দানির হাত চেপে ধরে বললেন, 'স্যার, আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।'

মূলচন্দানি উত্তর দেওয়ার আগেই মহাজন ও সেনাপতি চ্যাটার্জির দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'কী অনুরোধ বলুন, মি: চ্যাটার্জি, আমরা নিশ্চয়ই তা রাখার চেষ্টা করব।'

'এইচ-ইলেভেনের শেষকৃত্যটা যদি মানুষের মর্যাদায় করেন তাহলে আমি সবচেয়ে খুশি হব। ওর যান্ত্রিক সত্তা খুব অল্প সময়ের জন্যে হলেও মানবিক সত্তায় পরিণত

হয়েছিল। কারণ এইচ-ইলেভেন মানুষের মতোই সেই চিরন্তন উত্তরহীন প্রশ্নের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল তার জীবনের শেষ কয়েক মুহূর্ত।' চ্যাটার্জির স্বর ওঠানামা করছিল।

'আপনার অনুরোধ মঞ্জুর,' জবাব দিলেন মহাজন। অবাক চোখে দেখছিলেন রোবোসাইকোলজিস্ট মানুষটাকে।

'ধন্যবাদ, স্যার,' বলে চ্যাটার্জি ধীরে ধীরে চলে গেলেন। ওঁকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

মেন বিল্ডিং-এর আড়ালে সূর্য ঢলে পড়েছে। কতকগুলো নাম-না-জানা পাখি একটানা ডেকে চলেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারের মতো বিষণ্ণতার এক কালো পরদা নেমে এল সবার মনের ওপরে। মি: পারেখ দরজা ভাঙার জন্য তৈরি। কিন্তু ওই দরজার ওপার থেকে যেন তখনও কেউ বলে চলেছে: 'আত্মা কী? পরমাত্মা কী?'

উভয় সংকট

'সুজাতা'

মহাকাশযানে যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে আগে আলাপ করিয়ে দিই—দিলীপ, মালা (অর্থাৎ আমি) এবং মানবাকৃতি এক যন্ত্র। যন্ত্রের ইংরেজি মেশিন যাকে সংক্ষেপ করে আমরা ওর নাম রেখেছি এম। আমাদের নামের ইংরেজি বানানের আদ্যক্ষরগুলি নিয়ে আমাদের মহাকাশযানের নাম রাখা হয়েছে 'ডিলেমা' অর্থাৎ উভয় সংকট। আমাদের বর্তমান কার্যক্রমের মহাকাশযানগুলির প্রত্যেকটিকে ঐ একই পদ্ধতিতে নাম দেওয়া হয়েছে। হেমন্ত, অবন্তীকা ও এনসেফালন-কে ('তাদের কম্পিউটার যন্ত্রের নাম) নিয়ে যে যানটি গিয়েছিল তার নাম 'হেভেন' অর্থাৎ স্বর্গ। 'ফারমামেণ্ট' অর্থাৎ মহাকাশ নামধারী যানটিতে ছিল ফিরোজ, মধু ও এক্স. এল. এস. নামধারী যন্ত্র।

একজন পুরুষ, একজন নারী ও একটি যন্ত্র এইভাবে আমাদের আগে মোট আটটি মহাকাশযান পাঠানো হয়েছে। আমাদেরটি হল নবম।

আমাদের যন্ত্র এ.বি.সি. মার্ক-3 হল একটি অতীব সূক্ষ্ম কম্পিউটার। একে দেখতে মানুষের মত যার স্ফটিক চোখে পলক পড়েনা এবং গোটা দেহতে পলিমার আস্তরণে ঢাকা বলে চকচক করে। কৃত্রিম স্বরযন্ত্রের সাহায্যে সৃষ্ট এর কণ্ঠস্বর কিছুটা কর্কশ হলেও তা প্রায় মানুষেরই মত। এম-এর শব্দভাণ্ডারে রয়েছে এক হাজার শব্দ। মানুষেরই মত কিন্তু এর বুকে, যেখানে হৃদ্‌যন্ত্র থাকে, সেখানে রয়েছে সিলিকন এল. এস. আই শক্তিকোষ।

আমরা চলেছি গ্রহাণু-99 অভিমুখে। প্রয়োজনীয় সব সাজসরঞ্জাম পূর্ববর্তী প্রথম সাতটি অভিযানে পাঠানো হয়ে গেছে। অষ্টম যানটি যদিও মহাকাশে হারিয়ে যায়। গ্রহাণু-99-এর বাতাসে এমোনিয়া-র পরিমাণ অত্যন্ত বেশি তাই পরিকল্পনা করা হয়েছে যে রাসায়নিক পদ্ধতিতে ঐ বাতাসের যৌগ গ্যাসগুলির অনুপাতের পরিবর্তন ঘটিয়ে তা মানুষের উপযোগী করে তোলা হবে। তারপর সেই বায়ুমণ্ডলকে বিশাল এক গোলাকৃতি আচ্ছাদনে ঢেকে রাখা হবে এবং তারপর শুরু হবে দফায় দফায়

লোক নিয়ে যাওয়ার পালা। দেখা গেছে যে মূল কাজটি সারার জন্য আঠারোবার যেতে হবে। ইতিমধ্যেই গ্রহাণু-99-তে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব লোকেদের তালিকা খুবই দীর্ঘ হয়ে পড়েছে এবং কেউ কেউ নাকি এখন নানারকম কলকাঠি নেড়ে নাম নথিভুক্ত করার জন্য ফিকির করছে। এর থেকেই বোঝা যায় যে পৃথিবীতে মানুষ আর থাকতে চাইছেনা। এটা ঠিক যে মানুষের বৈষয়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আজ অন্ত নেই কিন্তু পৃথিবীর ওপরে আরও উঁচু করে বাড়ি বানানো তার সাধ্যে আর কুলোচ্ছে না।

দিলীপ ছেলেটা বেশ ভাল। চালাক চতুর, ব্যবহারটিও ভদ্র। মোটেই আমাকে জ্বালাতন করে না। উল্টে কখনও কখনও আমিই তাকে খেপাই। এখানকার নিয়ম হল সব সিদ্ধান্তই যৌথভাবে নিতে হয় এবং আমার ও দিলীপের মধ্যে যদি মতের অমিল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করবে এম। এখন অবধি অবশ্য আমার ও দিলীপের মধ্যে মতানৈক্য হয়নি।

আমাদের যাত্রার পাঁচমাস কেটে গেছে। গ্রহাণু-99-তে পৌঁছতে আর এক মাস বাকি। তখন দিলীপ ও এম-এর মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। আমাদের প্রতিবেদনগুলিকে সংখ্যায় সাজানো, পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, মহাশূন্যে জাত্যগত যানচালন ও বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত তথ্য সন্ধানে রাখা, নক্ষত্রমণ্ডলী দেখে পথ নির্ধারণ—এসকল নিত্যনৈমিত্তিক কাজগুলি এম-ই করে। শুধুমাত্র শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ অবতরণের অব্যবহিত আগে চোখে দেখে যানটিকে গ্রহাণু-99-তে নামাবার কাজটি আমাকে ও দিলীপকে করতে হবে। এবং সেটিও করতে হবে তেমন জরুরী প্রয়োজন হলেই। এম-কে ছাড়া আমাদের পক্ষে কাজ চালানো এককথায় প্রায় অসম্ভব।

দিলীপ ও এম-এর মধ্যে বিরোধের ব্যাপারটা বলতে গিয়ে অন্য কথায় চলে যাচ্ছি...

আমি মহাকাশযানের নিচের প্রকোষ্ঠে একদিন বিশ্রাম করছি, এমন সময় দিলীপ আমাকে ডাকল। আমি দেহটি ভাসিয়ে ওপরে উঠে গেলাম (আসলে কিন্তু এই 'ওপর' বা 'নিচ' বলা অর্থহীন কারণ মহাশূন্যে অনুরূপ কোনো কিছুই নেই...)।

দিলীপ ও এম দাবা খেলছিল। বেশ বড়সড় কোনো কেউকেটার ভঙ্গিতে এম আমাকে কিছুক্ষণ দেখল তারপর প্রশ্ন করল যে ভাল ঘুম হয়েছে কিনা। জবাব

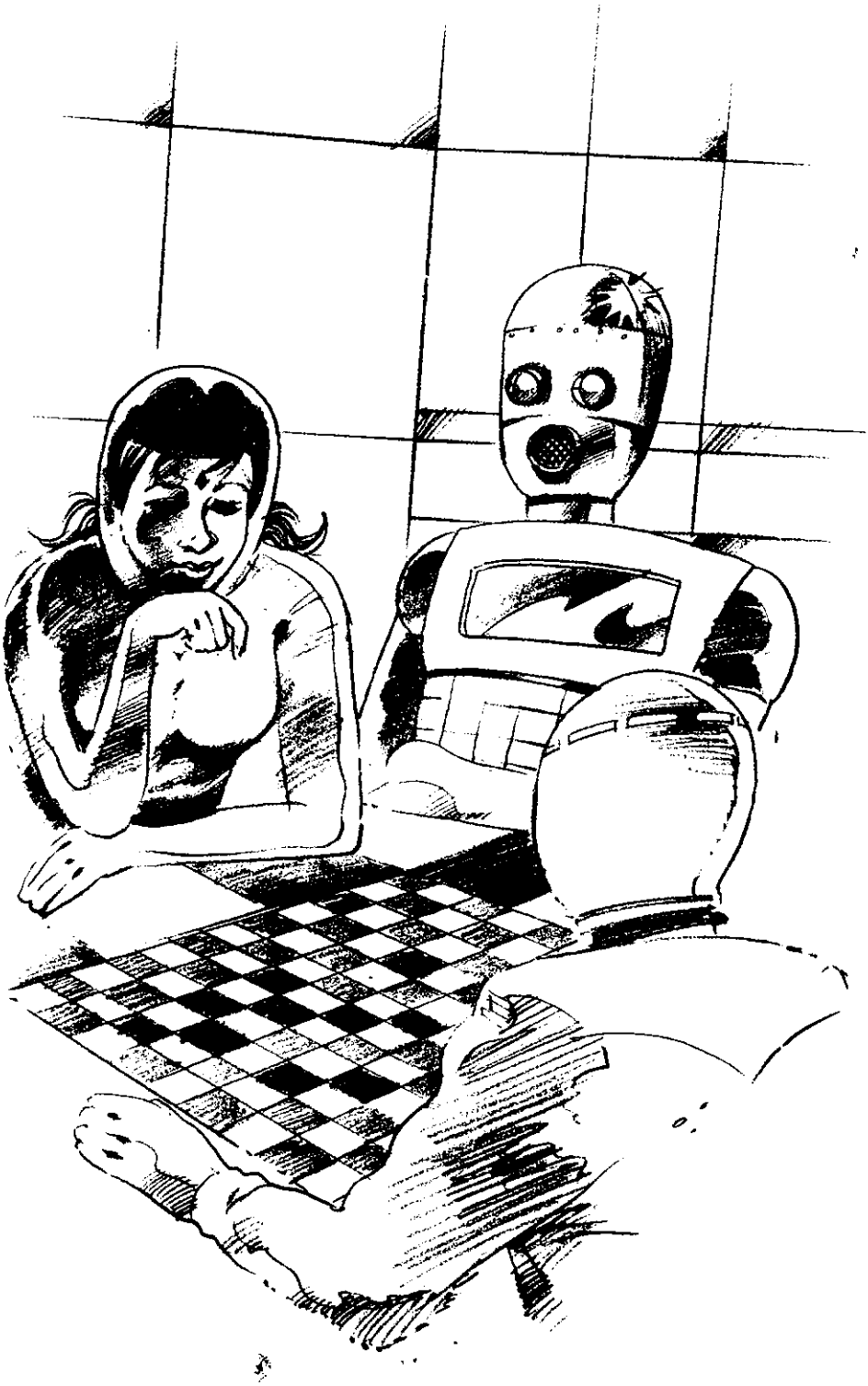

দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না। যন্ত্রের প্রশ্নের জবাব না দিলেও চলে।

দিলীপ বেশ ক্ষুব্ধভাবেই বলল, 'মালা, এম আমাকে আজকে তিনবার হারিয়ে দিয়েছে। মাত্র আটচল্লিশ সেকেণ্ডে কিস্তিমাৎ করে দিচ্ছে!'

আমি বললাম, 'বোঝাই যাচ্ছে যে তুমি খেলোয়াড় হিসেবে কেমন পটু।'

'না মালা, আমাদের যাত্রার গোড়ার দিকে এম-কে আমি সহজেই হারাতাম। আমি বলছি তোমায়, এম-এর খেলায় দারুণ উন্নতি হয়েছে। এমন কি তাসের জুয়া বা ড্রাফট্ খেলাতেও ও আমাকে বলে বলে হারাচ্ছে।' চোখের লেসার রশ্মির দৃষ্টিতে দাবার বোর্ডটি তীক্ষ্ণ নজরে দেখে নিয়ে এম বলল 'মার কিস্তি।'

দিলীপের গলায় বিস্ময়, 'দেখলে ব্যাপারটা! এম নিজের খেলাটা ভাল যেমন করে তুলেছে তেমন বিশ্লেষণ করে আমার খেলার দুর্বল দিকগুলিও চিনে ফেলেছে।'

'কি হয়েছে তাতে? আচ্ছা এম, কে তোমাকে খেলা শিখিয়েছে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

এম জবাব দিল, 'অনুসন্ধানমূলক স্বশিক্ষণ।'

'আমার মনে হয়, মালা, এম ক্রমেই আরও বেশি করে মানুষের মত হয়ে উঠছে। এমন নিচু গলায় টেনে টেনে দিলীপ কথাগুলো বলছিল যে আমি একবার তার দিকে, আরেকবার এম-এর দিকে দেখলাম। দিলীপ বলেই চলল, 'ব্যাপারটা সত্যি, এম-এর মধ্যে যে কর্মসূচী রয়েছে তার একাংশের সাহায্যে সে ভুল শুধরে নিতে পারে। নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ভাবনার ক্ষমতা তার স্মৃতি ভাণ্ডারের রয়েছে। এবং এই ব্যাপারটা ক্রমেই মানুষের মত হয়ে উঠছে। এম, সেদিন তুমি কি কবিতাটা যেন লিখেছিলে?'

এম বলল, 'কবিতা নয়। ওটি হল সন্ত ফ্রান্সিসের একটি প্রার্থনা। আমি তথ্য তহবিল থেকে পেয়েছিলাম।'

'শুনলে ব্যাপারটা! সন্ত ফ্রান্সিস! একটা যন্ত্র কেন ওরকম কিছু খুঁজে বের করবে যার সঙ্গে যন্ত্রের কাজের কোনো সম্পর্ক নেই? ব্যাপারটা কি হুবহু মানুষের মত নয়?'

'দিলীপ, তুমি কি বলতে চাইছো বলো তো?'

দিলীপ কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সংবরণ করে নিল। 'এম, তুমি অনুগ্রহ করে একটু নিচে যাবে? মালার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। একান্তে।'

'ঠিক আছে,' বলে এম শিম্পাঞ্জির মত লাফাতে লাফাতে আমাদের দৃষ্টির অগোচরে চলে গেল। সিঁড়ি ধরে। আমার তো ঐ বিচিত্র চলন দেখে হাসি পেয়ে গিয়েছিল।

'একি কাণ্ড! এম-কে এভাবে লাফাতে কে আবার শেখাল?'

দিলীপ বলল, 'সেটাই তো তোমাকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করছি। ও নিজে নিজে একেকটা ব্যাপার শিখে ফেলছে।'

'শিখল তো শিখল। তাতে হলটা কি?'

'এর মধ্যে একটা বিপদ রয়েছে মালা,' বলতে বলতে দিলীপ এমন সতর্কভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল যে আমি বেশ মজা পেয়েছিলাম।

'মালা, নিচের তলায় চলে গেলেও এম বোধহয় আমাদের কথা শুনতে পাবে। কাছে এস, তোমাকে কানে কানে বলি। মালা শোনো, এম নির্ঘাত কোনো বদমাইশির ফন্দি আঁটছে বলে আমার মনে হয়...'

'কি বদমাইশি?'

'এম আমাদের বিরুদ্ধে কোনো একটা পরিকল্পনা করছে। দুদিন আগে হঠাৎ দেখি এম কম্পিউটারের পর্দায় জটিল একটা পরাবৃত্তীয় পথ আঁকছে। আমি জিজ্ঞাসা করাতে এম বলল 'ও কিছু না', বলে চটপট ছবিটা মুছে দিল।'

'সম্ভবত বিরক্ত বোধ করে আপনমনে কোনো হিজিবিজি আঁকছিল।'

'এম-এর যদি কিছু করার না থাকে তাহলে ওর নিদ্রাবস্থায় চলে গিয়ে ব্যাটারির শক্তি বাঁচাবার কথা। তার বদলে ও সব জটিল গণনা করছিল। ব্যাপারটা কি আমি জানতে চেয়েছিলাম কিন্তু এম চেপে গেল। এবং আমরা যখন ঘুমিয়ে ছিলাম তখন ও কাউকে বার্তা পাঠিয়েছিল।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তুমি জানলে কি করে?'

'আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছি।'

'তাহলে তুমি ওর ওপরে গোয়েন্দাগিরি করছ? এসব কি যে হচ্ছে এখানে।'

'মালা, শোনো, আমি ওকে হাতেনাতে ধরেছি। বার্তাটা কার জন্য জানার জন্য আমি ওকে চেপে ধরতে ও বলল 'পৃথিবী কেন্দ্র'। আমি বার বার বললাম, 'বার্তায় কি ছিল?' এম বলল, 'খুব গোলমাল হচ্ছিল বলে পুরোটা পাঠানো যায়নি।' আমি বার্তাটা দেখতে চাইলে কিছুক্ষণ পরে ও আমাকে হাবিজাবি কিছু লেখা দেখাল।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'দিলীপ, তুমি কি কোনোকিছুকে ভয় পাচ্ছ?'

দিলীপ বলল, 'ভয় পাইনি, সন্দেহ করছি।'

'একটা যন্ত্রকে সন্দেহ করছ? ও কি করতে পারে? তুমি কি ভুলে গেছ যে এম যদি ভালভাবে কাজ না করে তাহলে দায়িত্ব নিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা আমরা দুজনে মিলে গ্রহণ করতে পারি? কিসের এত দুশ্চিন্তা তোমার?'

'যাই হোক না কেন তুমি এম-এর দিকে একটু নজর রেখ।' এই বলে দিলীপ ভাসতে ভাসতে মহাকাশযানের ওপর দিকে চলে গেল।

এম-এর কাছ থেকে দুজনের দায়িত্ব নিয়ে নেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থাটি হল চরম এক পদক্ষেপ। যদি কখনও এমন সংকট দেখা দেয় যে অভিযানটি ব্যর্থ হতে চলেছে কেবলমাত্র তখনই ঐ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা। ব্যাপারটা জটিলও কম নয়...আমার কাছে একটি গুপ্ত সংকেত রয়েছে। দিলীপের কাছেও আছে। সেই সংকেত অনুসারে আমরা দুজনে নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী চাবি দিলে তবেই এম নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। এবং এর পরে যানটিকে আমাদেরই চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে কারণ এম আর কখনও সক্রিয় হয়ে উঠবে না। অতএব এই ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যাপারে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

এবং ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আগে দশটি কারণ তালিকা অনুযায়ী রয়েছে কিনা দেখতে হবে। সেটা যদি বা মিলেও যায় তখন পৃথিবী কেন্দ্র থেকে অনুমতি নিতে হবে...

এম কি করছে দেখার জন্য আমি যানের পেছন দিকে গেলাম। সেখানে এক কোণে বসে সে যথারীতি এক সার আলোর ওপরে লক্ষ্য রাখছিল।

'তোমাদের কথা বলা শেষ হল?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'আমায় কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে জবাব দিলাম, 'না, এম।'

'এই প্রথমবার তোমরা গোপনে কিছু আলোচনা করার জন্য আমাকে চলে যেতে বললে।'

'কি হল তাতে?'

'ব্যাপারটা যদি মহাকাশযান সংক্রান্ত কিছু হয় তাহলে জানতে আমাকে হবেই।'

'ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। এটা আমাদের একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। যানের কাজকর্মের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই। এম, আমাকে দিলীপ বলছিল যে তুমি নাকি নিজে নিজে কিছু পড়ছ।'

'আমি সন্ত ফ্রান্সিসের প্রার্থনা পড়ছিলাম।'

'ঐ অন্য বইটা কি?'

'সৌন্দর্যলহরী। আদি শঙ্কর রচিত সহস্র কবিতাবলী। এর পচাত্তরতম কবিতাটি পড়ে দেখ—এর অসামান্য কাব্যগুণ তোমার চোখে জল এনে দেবে।'

আমি জানতে চাইলাম, 'এত সব তুমি পাচ্ছ কোথায়?'

'চৌম্বক গ্রন্থাগারে সব কিছুই রয়েছে। যখন সময় কাটতে চায়না তখন তোমাদের পড়ার জন্য। যেহেতু তোমরা কিছুই পড়না আমি ভাবলাম বইগুলোকে কাজে

লাগাই...'

'তোমার কাছে এগুলোর কি মূল্য? তুমি মানুষ নও, বই-এর রসাস্বাদন তুমি করতে পার না।'

এম আমার কথার জবাব দিল না। বরং বলল, 'মালা, তোমাকে মনে করিয়ে দিই যে তোমার ঘুমের সময় হয়ে গেছে।'

'শুধু একটা প্রশ্ন এম—তুমি কি মিথ্যা বলতে পার?'

'জেনো-র কূটাভাস অনুসারে মিথ্যাবাদী ও সত্যবাদী, উভয়েই যথার্থ কারণে বলতে পারে আমি মিথ্যা বলি না।' ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে এম-এর কথাগুলো আমি ভাবছিলাম...

এরপর দুদিন কিছুই ঘটেনি। দিলীপ ও এম, দুজনেই তাদের রোজকার বাঁধা কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। আমিও ঐসব কথাবার্তাও প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এমন সময় পৃথিবী থেকে বার্তাটি এল। এম বার্তাটি দিলীপ ও আমার কাছে নিয়ে এল।

জরুরী, লাল সাবধানী বার্তা! 'পৃথিবী কেন্দ্র থেকে ডিলেমা-কে জানানো হচ্ছে। সঙ্কটকালীন বিশেষ আদেশ। পৃথিবীর সময় 8.20-র পর, নির্দেশানুযায়ী কক্ষপথ পাল্টাও এবং ছ'দিন আঠারো ঘণ্টা তিন মিনিট আটচল্লিশ সেকেণ্ড দূরত্বে অবস্থিত অজানা গ্রহের ছবি নাও। আট নম্বর মহাকাশযান ওর ওপরে আছড়ে পড়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। দিক পরিবর্তনের নির্দেশের জন্য অপেক্ষায় থাক।'

আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'তার মানে পৃথিবীতে ফিরতে আরও দেরি হয়ে গেল।'

দিলীপ পর্দার ওপরে বার্তাটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল—'ওরা আমাদের ব্যাপারটা আগে বলেনি কেন?'

আমি বললাম, 'ব্যাপারটা নির্ঘাত ওদের সহসা স্থির করতে হয়েছে।'

'এম, তুমি কি জান যে আমরা উড়াল পথ বদলাচ্ছি?'

'জানি। আমি তার প্রস্তুতি করছি,' এম জবাব দিল।

আমি বললাম, 'দারুণ লাগছে! আশা করি যে হারানো যানটির সন্ধান পাওয়া যাবে।'

দিলীপ আদেশ করল, 'এম, তুমি কি অনুগ্রহ করে যন্ত্র কক্ষে গিয়ে তোমার আসনে বসবে?' এম চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিলীপ ফিসফিস করে বলল, 'মালা, এটা একটা জাল বার্তা। পৃথিবী থেকে মোটেই এটা পাঠানো হয়নি।'

আমার চোখে প্রশ্ন!

দিলীপ চাপা গলায় বলল, 'এটা এম-এর কাণ্ড! ও হয়তো এখনও আমাদের

কথা শুনতে পাচ্ছে...মালা, নির্ঘাত এম এটা করেছে।'

আমি পাল্টা জবাব দিলাম, 'কি করে তুমি এটা বলছ? গোপন সাঙ্কেতিক রেখাগুলো ঠিক রয়েছে। আর তা ছাড়াও, যে কোনো সময়ে তুমি পৃথিবীতে বার্তা পাঠিয়ে ঐ নির্দেশ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পার...মনে হয় পাঁচ মাসের যাত্রার ধকলে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। তোমার মাথা কাজ করছেনা। আমাদের বিরুদ্ধে এম-এর চক্রান্ত করার সম্ভাব্য কারণ কি হতে পারে?'

'বলছি তোমায়। এই যে বার্তা...আচ্ছা, পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের কি সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে? ব্যাপারটা ভেবে দেখ...আমাদের সব যোগাযোগ এই সংখ্যার রূপে রক্ষা করা হয়। এর পাঠোদ্ধার, ছবি সবকিছু এম-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে আসে।'

'সেটা ঠিকই সংখ্যাগত নিয়ন্ত্রণ, সংকেত—সবকিছুই কমপিউটারের মাধ্যমে আমাদের জানানো হয়। মহাকাশ ভ্রমণে তাই হয়ে থাকে, 'আমি একমত হলাম।

'তাহলে তুমি বুঝতে পারছ যে এম-এর মাধ্যমে ছাড়া পৃথিবীর সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করতে পারি না।'

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'বলতে দাও। শোনো। ধরে নেওয়া যাক যে এম আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে চায়। সে বলতে পারে যে এই বার্তাটি পৃথিবী থেকে এসেছে, বলতে পারে তো? এম একটা বার্তা তৈরি করে আমাদের বিভ্রান্ত করতে পারে। বার্তাটি সঠিক কিনা জানতে হলেও আমাদের ঐ কমপিউটারের মাধ্যমেই জানা ছাড়া কোনো উপায় নেই...'

'কিন্তু দিলীপ, নিছক একটা যন্ত্র কি করে চক্রান্ত করবে? রোবট বিজ্ঞানের তিনটি মৌলিক সূত্র কি তুমি ভুলে গেছ?'

'সেটা আমার জানা আছে কিন্তু এম রোবটের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠছে।'

আমি বাধা দিলাম, 'সেটা এম পারে না, এটা তার সাধ্যাতীত। ওর তেমন কোনো ক্ষমতাই নেই।'

'ঠিকই, ক্ষমতাটা ওর মধ্যে ছিল না। কিন্তু তাকে যেমন বানানো হয়েছিল এম তার থেকে অনেক পাল্টে গেছে! নিজে নিজে সে অনেক কিছু শিখেছে। আর একটা ব্যাপার ভেবে দেখো, যাত্রাসমাপ্তির ঠিক এক মাস আগে অষ্টম মহাকাশযানটি নিখোঁজ হয়ে যায় এবং পৃথিবী থেকে তাকে খুঁজে পাওয়াও যায়নি, তাকে নির্দেশ দেওয়াও সম্ভব হয়নি। আমরাও যাত্রাকালের ঠিক একই সময়ে অন্য একটি গ্রহের দিকে যাত্রাপথ ঘুরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ পেলাম। আমাদের প্রশিক্ষণের সময় কখনও

এই সম্ভাবনার কথা বলা হয়নি। তাহলে কেন আমরা সেখানে যাব? এম আমাদের সেখানে নিয়ে চলেছেই বা কেন?'

'তুমি বলতে চাইছই যে এম কোনো একটা সাংঘাতিক চক্রান্ত আঁটছে...'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই! অথবা অন্য কোনো প্রাণী এম-কে নির্দেশ দিয়ে এটা করাচ্ছে।'

'কি বলছ দিলীপ? অন্য প্রাণী মানে কারা?'

'কে জানে? লক্ষ কোটি কোটি নক্ষত্রপুঞ্জের কোটি কোটি তারার মধ্যে পৃথিবী বাদে এমন গ্রহ থাকতেই পারে যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। এমন ঘটার সম্ভাবনা নেই বলাটা শুধু অবাস্তবই নয়, ঔদ্ধত্যেরও চূড়ান্ত প্রকাশ।'

দিলীপ বলে চলে, 'কোনো অজানা গ্রহের অচেনা কোনো প্রাণী হয়তো এম-কে নিয়ন্ত্রণ করছে। ও হয়তো তাদের হয়ে কাজ করছে। এবং বিভ্রান্ত করছে আমাদের...'

আমার মাথায় সহসা একটা চিন্তা খেলে গেল। বললাম, 'দিলীপ, শোনো। তুমি যদি মনে কর যে বার্তাটি সত্য নয় তাহলে সেটা আমরা আগে পরীক্ষা করে দেখতে পারি। কিভাবে করব বলছি। আমার বাড়িতে একটা বাক্স রয়েছে। সেই বাক্সের মধ্যে কি আছে সেটা আমি ছাড়া কেউ জানে না। ওর মধ্যে কি আছে জানতে চেয়ে আমরা পৃথিবীতে একটা বার্তা পাঠাব। উত্তরটা যদি সঠিক হয় তাহলে বোঝা যাবে যে বার্তাটি ঠিকই পৃথিবীতে পৌঁছেছে এবং...'

'বুঝলাম, কিন্তু...'

'দাঁড়াওনা, চেষ্টা করে দেখা যাক,' বলে পৃথিবীর জন্যে একটা বার্তা লিখে আমি এম-কে দিলাম। এম বলল, 'তোমাকে এটা মনে করিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য যে এইসব ছেলেমানুষী বার্তা পাঠিয়ে মূল্যবান সম্পদ নষ্ট করাটা তোমার উচিত নয়।'

আমি ধমকে বললাম, 'চুপ করো! যা করতে বলা হচ্ছে কর।' এম চলে যেতে দিলীপকে আশ্বস্ত করার জন্য আমি হাসলাম। পৃথিবীর থেকে এখন বার্তা পেলেই গোটা ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমার মনে হয়েছিল যে দিলীপ অকারণে দুশ্চিন্তা করছে। কিন্তু এমই বা নিজে নিজে নানা বিষয় শিখতে চাইছে কেন? আমার কাছে এ প্রশ্নের কোনো ব্যাখ্যা ছিল না।

দিলীপ তার কাজের জায়গায় ফিরে গেছে। আমার বার্তাটি পাঠিয়ে দেওয়ার পরে এম কয়েকটি যন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। আমার এম-এর জন্য একটু খারাপই লাগছিল।

'এম, তুমি কি মনে কর যে পৃথিবী বাদে অন্য গ্রহতেও প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে?'

এম বলল, 'এটা সম্ভব। হতেই পারে। শুধু আমাদের ছায়াপথেই 40,000 কোটি তারা রয়েছে। এবং সেটা হচ্ছে মহাবিশ্বের কোটি কোটি নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে

একটিমাত্র। এদের মধ্যে অন্তত একটিতে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতেই পারে...'

'এম, আর একটি সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করে দাও।'

'বলো?'

'তুমি কি আমাদের দুজনকেই অগ্রাহ্য করে নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিতে পারো?'

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে এম বলল, 'হ্যাঁ...সেটা হতে পারে।'

'সেরকম কি এখন ঘটছে?'

'না'

'আর একটা কথা—দিলীপ আর আমি যখন ঐ ঘরে কথা বলি তখন তুমি কি শুনতে পাও?'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে তোমাকে সন্দেহ করে যা কিছু সে বলেছে...'

'আমি সবই শুনেছি।'

'এম, তাহলে যা দাঁড়াচ্ছে তা হল এই মহাকাশযানে তোমাকে লুকিয়ে কিছু করা সম্ভব নয়?'

'সেটা ঠিকই। আর কিছু তুমি জানতে চাও? আমাকে নিজের কাজ নিয়ে বসতে হবে।'

বললাম, 'না, আর কিছু জানার নেই।'

কিছুক্ষণ পরে মাথাটা যখন একটু পরিস্কার হল তখন চিন্তা করে আমি বুঝলাম দিলীপ যেমন বলেছে তেমন এম যদি নিজের থেকে কিছু করে বা অজানা কোনো প্রাণীর প্রভাবে কিছু করতে চায় তাহলে আমরা কখনোই সেটা বুঝতে পারব না। কারণ প্রেরিতই হোক আর গৃহীতই হোক—প্রতিটি বার্তার অর্থোদ্ধারের জন্য আমরা এম-এর ওপর নির্ভরশীল।

কিন্তু...অনামা সেই গ্রহে ও যদি আমাদের নিয়ে যাওয়ার কোনো ফন্দি এঁটেই থাকে তাহলে একটা মিথ্যা বার্তাই বা এম দিতে যাবে কেন? ও তো চুপচাপই আমাদের যানটি সেদিকে চালনা করতে পারত...

না। এটা কোনো ষড়যন্ত্র নয়। নিশ্চয়ই ওটা পৃথিবী থেকে পাঠানো বার্তা...

পৃথিবী কেন্দ্র থেকে জবাব নিয়ে এল এম—'তোমার সেই আজব বার্তা। প্রসঙ্গত মনে করিয়ে দিই যে নির্দেশ প্রেরণের পথগুলি তুচ্ছ প্রশ্নের জন্য ব্যবহার করা অপরাধ। বাক্সের মধ্যে যে ছবিটি রয়েছে তা দেখার জন্য প্রস্তুত হও।'

কুড়ি সেকেন্ড পরে বাক্সের মধ্যে গোপনে তালাবন্ধ করে রাখা ছবিটি পর্দায় ফুটে উঠল। দিলীপের চোখে প্রশ্ন। আমি বললাম, 'দেখলে তো। এবার তোমার

সন্দেহ কাটবে। বার্তাটি পৃথিবী থেকেই এসেছে।'

দিলীপ বলল, 'এই বার্তাটা পৃথিবীতে গিয়ে একটা জবাব এনেছে। কিন্তু তার দ্বারা কিভাবে প্রমাণিত হয় যে সব বার্তাই পৃথিবী থেকে আসছে? এই ছবির থেকে কিছুই প্রমাণিত হয় না।

বিভ্রান্তভাবে আমি দিলীপের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। দিলীপ বলল, 'এটা নিশ্চিত একটা ষড়যন্ত্র। ঐ অনামা গ্রহতে ঘুরে, গ্রহাণু-99 হয়ে ফিরে যাবার মত জ্বালানী আমাদের সঙ্গে নেই। মতলবটা হচ্ছে নতুন ঐ গ্রহে নিয়ে গিয়ে আমাদের আটকে ফেলা।'

'তারপর...?'

'কে বলতে পারে? হয়তো আমাদের মহাকাশযানটি দখল করে আমাদের ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হবে। সেই গ্রহে অতীব বুদ্ধিমান প্রাণীরা থাকে না তরিরা বাস করে...'

'দিলীপ, তুমি একেবারে গল্পের গরুকে গাছে ওঠাচ্ছ।'

'ঠিক আছে। প্রমাণ করো যে আমি ভুল। করে দেখাও।'

বললাম, 'আমি পারব না।'

'তাহলে পথে এস। শেষ অবধি তুমি আমার সঙ্গে একমত হলে।'

'কি ব্যাপারে?'

'জরুরী সমাধানের বিষয়ে। তোমার গোপন সাঙ্কেতিক সংখ্যাটা বল। আমারটাও তোমাকে বলছি। তারপর চাবি ঢুকিয়ে কমপিউটারটাকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যাবে। এরপর যানটিকে আমরাই চালিয়ে নিয়ে যাব...ব্যাপারটা কঠিন আমি জানি কিন্তু এটা করা সম্ভব। আমরা কাজ চালিয়ে নেবখন।' আমি একটু দ্বিধা করছিলাম।

'দিক পরিবর্তনের জন্য আমাদের হাতে আর মাত্র এক ঘণ্টা আছে। মালা, তাড়াতাড়ি কর, আমার কথা মেনে নাও। যন্ত্রটিকে যদি জিততে দিই তাহলে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।'

দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় আমি বললাম, 'আমাকে ভাবার জন্য আধঘণ্টা সময় দাও।'

দিলীপ গর্জে উঠল, 'জাহান্নামে যাও!' দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে দিলীপ বেরিয়ে গেল ফুঁসতে ফুঁসতে।

এম এসে ঢুকে কয়েকটি যন্ত্র একটু নাড়াচাড়া করে আমাকে বলল, 'আমি পাশের ঘর থেকে তোমাদের দুজনের কথাই শুনছিলাম। এই মহাকাশযানের নিরাপত্তার জন্য দায়িত্ব বহনকারী হিসেবে এবং...তোমাদের নিরাপত্তার দায়িত্বের খাতিরেও আমাকে এটা বলতে হচ্ছে...'

আমি বাধা দিলাম, 'দাঁড়াও, দিলীপও তোমার কথা শুনুক।'

'না। দিলীপ আমার বিরুদ্ধে চলে গেছে। ওকে বলে আমার কোনো কাজ হবে না। তুমিও আমার বিরুদ্ধে চলে যাওয়ার মুখে। রোবটবিজ্ঞানে দ্বিতীয় সূত্রানুযায়ী তোমাদের পরিকল্পনার মধ্যে যে বিপদ নিহিত রয়েছে সেটা দেখিয়ে দেওয়াটা আমার কর্তব্য। রোবটের কাজ হল নিজেকে ও প্রভুকে রক্ষা করা।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'এর মধ্যে কার দাবি আগে?'

'অবশ্যই প্রভুর।'

'ঠিক আছে, কি বিপদের কথা বলছিলে?'

'তোমরা দুজনে যদি গোপন সংখ্যাটি ব্যবহার করে চাবি দাও তাহলে আমি অচল হয়ে পড়ব এবং সব নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তোমাদের নিতে হবে।' বললাম, 'তার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি।'

'এটা তোমরা করতে পারনা। বিজ্ঞানীরা তোমাদের বলেছিলেন যে বিপদ দেখা দিলে তোমরা পুরো নিয়ন্ত্রণ নিজেরা গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু সেটা তাঁরা বলেছিলেন তোমাদের আশ্বস্ত করার জন্য। আটাত্তরটি মৌলিক ও একশ কুড়িটি সহযোগী কর্মসম্পাদন তোমাদের করতে হবে। সেই সঙ্গে সাতচল্লিশটি সাবধানী ব্যবস্থা তদারকি। সবচেয়ে দক্ষ মানুষ বড় জোর ছটা বা সাতটা পারবে। তোমরা আমাকে ধ্বংস করলে আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব।'

'কিন্তু এম, যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটলে যানটি কিভাবে চালনা করতে হবে তার জন্য অনেক মাস ধরে আমাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।'

'যেটা করা হয়েছিল বিপদমুক্ত, যথার্থ পরিস্থিতিতে। তোমরা পারবেনা, এই মহাশূন্যের মধ্যে কিছুতেই পারবে না। ভেবে দেখ।'

'তুমি কি প্রমাণ করতে পার যে দিলীপের সন্দেহের কোনো ভিত্তি নেই...?'

'এটা প্রমাণ করা যাবে না। তোমাকে আমার কথা বিশ্বাস করতে হবে।'

'তুমি কি বলতে চাও দিলীপ ভুল করছে?'

'সে যে ঠিক এটাও আমি বলতে পারব না।'

'তুমি কি জান যে কেন ও তোমায় সন্দেহ করছে?'

'ওর মনোবিকলন ঘটছে।'

'কি ঘটছে?'

'ঠিকই বলেছি। ধীরে ধীরে ওর মস্তিষ্ক বিকল হয়ে পড়ছে। বহু কিছুই ঘটা সম্ভব কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তার সবগুলোই ঘটবে। আমায় মাপ কর...কিন্তু আমাদের...দিলীপকে হত্যা করতে হবে।'

আমি কিছু বলার আগেই এম বলতে শুরু করে দিল, নিস্পৃহভাবে, 'আমি যখন হত্যার কথা বলছি তার অর্থ সবসময় ওকে প্রাণে মারা নয়। আমরা ওকে গভীরভাবে ঘুম পাড়িয়ে রাখব...যতদিন না অভিযান সম্পূর্ণ হয় ওকে নিষ্ক্রিয় করে রাখব। এই পাঁচ মাসের যাত্রার ফলে ওর মানসিক প্রক্রিয়ার ওপরে প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। ও দুঃস্বপ্ন দেখছে। এরকম এক ব্যক্তির এই মহাকাশযানে থাকাটা আমাদের সকলের পক্ষেই বিপজ্জনক। মালা, তোমাকে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে—তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে না দিলীপকে? তাড়াতাড়ি করো। দিক পরিবর্তনের সময় আসন্ন হয়ে পড়েছে...'

'তুমি বলতে চাও যে দিলীপ যা বলছে তার কোনো ভিত্তিই নেই? তাহলে প্রমাণ করে দেখাও।'

'কি করে করব? আমি কি করি তুমি চাও?'

'পৃথিবী কেন্দ্রের নেতা রামকৃষ্টের সঙ্গে আমায় যোগাযোগ করিয়ে দাও।'

এম বেতারপথগুলি নাড়াচাড়া করল। একটু পরেই আমি নেতার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

বললাম, 'সুপ্রভাত, স্যার। আমি মালা বলছি। আমি একটা সমস্যায় পড়েছি। দিলীপ মনে করছে যে এম কোনো একটা দুষ্কর্ম ঘটাতে চায়। সে মনে করে যে দিক পরিবর্তনের নির্দেশটি মিথ্যা এবং এম এটা বানিয়েছে। ও সংকটকালীন চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায়।'

কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর নেতা বললেন, 'শোনো মালা, কোনো অবস্থাতেই তোমরা ঐ ব্যবস্থা কার্যকর করবে না। নিজেরা এটা করে কার্য সম্পাদনের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।'

'কিন্তু দিলীপ কোনো কথাই শুনছেনা, স্যার।'

'ওকে বল আমার সঙ্গে কথা বলতে।'

আমি দিলীপকে ডাকলাম। ডেকে বললাম নেতা তার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

দিলীপ প্রশ্ন করল, 'তিনি কি নিজের থেকে যোগাযোগ করেছেন?'

বললাম, 'না। আমি এম-কে বলেছি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে।'

দিলীপের মুখে বিরক্তির ছাপ তীব্র—'মালা, তুমি কেন বুঝতে পারছ না? ওটা নেতা কথা বলছেন না, সবটাই ভাঁওতা। আসলে এম তোমার কথার জবাব দিচ্ছে।'

'কিন্তু কণ্ঠস্বর—সেটা তো নেতার মতই শোনালো।'

বিদ্রূপের সুরে সে বলল, 'তুমি কি বলতে চাও যে নেতার কণ্ঠস্বরের বিশিষ্ট শব্দগত ধরনটা এম-এর জানা নেই?'

'তুমি নেতার সঙ্গে কথা বলবে কি বলবে না?'

'আমি তো বলেছি, ওটা নেতা নয়। পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ দীর্ঘদিন আগে আমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সেইদিন থেকে, যেদিন আমি এম-কে হাতেনাতে ধরেছিলাম। আমরা এখন সম্পূর্ণভাবে এম-এর খপ্পরে পড়ে আছি এবং সে আমাদের কোথাও একটা নিয়ে চলেছে...'

বেগতিক দেখে আমি বললাম, 'এটা যে আপনি নিজে কথা বলছেন সেটা প্রমাণ করতে পারেন, স্যার?'

একটু পরে নেতা বললেন, 'কম্পিউটারে তোমাদের যদি আস্থা না থাকে তাহলে গোটা ব্যাপারটার ভিত্তিই নড়বড়ে হয়ে যায়। চেষ্টা করে, কথা বলে দিলীপকে বোঝাও। এখনও কিছুটা সময় তোমাদের হাতে আছে। ও যদি না বুঝতে পারে...'

'যদি ও না বোঝে?'

'তাহলে ওকে বাদ দিতে হবে। এম জানে কি করতে হবে। তার চাবিটা তোমার কাছেই আছে।'

উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'আমার কাছে?'

'হ্যাঁ। তোমাকে না জানিয়েই তোমার পোশাকের মধ্যে ওটা লুকিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওটা বার করো... হদিশ করার সূত্র আমরা ধরিয়ে দেব...বের করে ওটা এম-কে দাও। অভিযান শেষ হওয়া অবধি দিলীপ গভীর ঘুমে অজ্ঞান হয়ে থাকবে। পৃথিবীতে এলে ওকে আমরা জাগিয়ে তুলে ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখাব।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'আমাকে অজ্ঞান করার মত অনুরূপ চাবিও কি এখানে রয়েছে?'

'হ্যাঁ। দিলীপের সঙ্গে। সেটা ব্যবহার করতে হলেও এম-এর সহযোগিতা লাগবে।'

আমি বললাম, 'আমার খুবই বিভ্রান্ত লাগছে।'

'শক্ত হও। অভিযানের নেতা হিসেবে আমি আদেশ দিচ্ছি। সৌভাগ্য কামনা করছি।' কণ্ঠস্বরটি নীরব হয়ে গেল। এম আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'চাবিটা।'

'এক মিনিট দাঁড়াও। ওটা কি সত্যিই নেতা কথা বলছিলেন? তাঁর কণ্ঠটা কি একটু অদ্ভুত শোনাচ্ছিলনা?'

'হায় ঈশ্বর! তুমিও সন্দেহ করছ? দেখ মালা, আমি হলাম একটা যন্ত্র। আমাকে বানানোই হয়েছে তোমাদের সাহায্য করার জন্য। দু-একটা জিনিস আমি

নিজে নিজে শিখতে গেছি ঠিকই কিন্তু তা হলেও আমি যন্ত্র। কোনো অশুভ চিন্তা আমি করতে পারি না।'

'আচ্ছা এম, একটা যন্ত্র কখন সচেতনতা অর্জন করে? কখন সে যন্ত্রের গণ্ডি পেরিয়ে মানুষের মত হয়ে উঠতে থাকে? এ বিষয়ে কোনো তত্ত্ব কি রয়েছে?'

এম বলল, 'আছে। টুরিং-এর তত্ত্ব। যন্ত্র ভাবতে পারে কিনা এ বিষয়ে টুরিং-ই হলেন প্রথম বিজ্ঞানী যিনি গবেষণা চালিয়েছিলেন। যখন একটা যন্ত্র মিথ্যা বলতে পারে তখনই বলা যাবে যে তার বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে। মালা, আমি বলতে পারি না বা কেউ বলতে পারে না : 'আমি মিথ্যা বলি না।' এটা পরস্পরবিরোধী। এখন এটা হল বিশ্বাসের প্রশ্ন। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না দিলীপকে? যদি আমাকে কর তাহলে আমাকে দিলীপকে অজ্ঞান করার চাবিটা দাও। আর যদি দিলীপকে বিশ্বাস কর তাহলে ওকে গোপন সঙ্কেতটি জানিয়ে আমাকে বিকল করে দাও।'

'এম, তুমি কি জোর করে আমাকে চাবিটা দিতে বাধ্য করতে পার?'

এম বলল, 'আমার কর্মসূচীতে সেটা নেই।' তখনই দিলীপ এসে ঢুকল।

বলল, 'তুমি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছ, মালা?'

আমি বললাম, 'না, দিলীপ।'

কমপিউটারের দিকে তাকিয়ে দিলীপ বলল, 'এম, তুমি দয়া করে একটু বাইরে যাবে?'

এম জবাব দিল, 'দুঃখিত। আমার কাজ এখানেই।'

দিলীপ পুনরায় বলল, 'আমি তোমাকে আদেশ করছি।'

এম-এর একই জবাব, 'দুঃখিত। আমার কাজ এখানেই।'

'শুনলে মালা? যন্ত্রটা আমাদের বিরোধিতা করছে! এম, আমি তোমাকে দু সেকেণ্ড সময় দিচ্ছি, না গেলে...'

'দিলীপ, তুমি আমায় কিছু করতে পারবেনা।'

দিলীপ উন্মত্ত ক্রোধে লাফিয়ে উঠল। 'পারব না তোকে ভাগাতে। তোর আমি...' এম-এর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দিলীপ তার মাথাটা একটানে খুলে নিয়ে ভাসিয়ে দিল। আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম।

মাথাটা আস্তে করে ভেসে এসে ঠিক জায়গায় আবার বসে গেল। এম দিলীপের দিকে তার ধাতব হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বিদ্রূপ করে বলল, 'হাতটা ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে?' মরীয়া হয়ে দিলীপ এখানে সেখানে খুঁজে একটা মহাকাশে ব্যবহারের বন্দুক থেকে এম-এর দিকে গুলি চালাল।

শান্ত কণ্ঠে এম বলল, 'চালাও। আরো চালাও। কিন্তু বন্দুকটাকে আমি প্রস্তুত

করিনি। তাই কিস্যু হবে না। নিজের ক্ষমতায় তুমি আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা।'

'মালা, দেখেছ কেমন আস্ফালন করছে। এবারে কি আমায় তোমার বিশ্বাস হচ্ছে? এতক্ষণে কি বুঝতে পেরেছ ব্যাপারটা?'

এম বলল, 'তুমি আমাকে ধ্বংস করতে পারবে না দিলীপ। এই ধরনের 'দুর্ঘটনা' ঘটলে তোমাদের এবং আমাকে রক্ষা করার জন্য নেতাই এই ব্যবস্থা করেছেন। এবারে দেখতে পাচ্ছ তো মালা যে দিলীপ এই মহাকাশযানের নিরাপত্তার পক্ষে বিপদস্বরূপ। চাবিটা কোথায়?'

দিলীপ বলল, 'কিসের চাবি?'

'আমি দুঃখিত দিলীপ কিন্তু নেতা আমাকে আদেশ দিয়েছেন তোমাকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়াতে। ওষুধটা কার্যকর করার চাবিটা আমার কাছে...' বলতেই দিলীপ গর্জন করে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এম জোরালো গলায় বলল, 'সহযাত্রীদের আক্রমণ করা অপরাধ। মহাকাশযানের নিরাপত্তার জন্য আমি দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছি। এই প্রথমবার সাবধান করছি। মালাকে ছেড়ে দাও, না হলে...'

'না হলে কি? তুই কি করবি রে...ন্যাড়ামুণ্ডু, বুদ্ধিহীন, যান্ত্রিক উল্লুক! মালা গোপন সংখ্যাটা বলো তাড়াতাড়ি তা না হলে ও তোমাকেও খতম করবে।'

'দ্বিতীয়বার সাবধান করছি। আমার কর্মসূচী অনুসারে তুমি যদি মালাকে তৃতীয় ও শেষবার সাবধান করাতেও না ছাড়ো...'

দিলীপ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, 'মালা, এখন দোনামোনা করলে চলবে না। তাড়াতাড়ি বল...'

'বার বার, তিন বার। শুরু হল তাহলে—এইটা প্রথম দফা।' এম ভেসে এল দিলীপের কাছে। দিলীপের মাথায় আঘাত করল। দিলীপ ধরাশায়ী, তার কপালে রক্ত।

'ক্ষমা কর। কিন্তু মহাকাশযানে শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য এটা আমাকে করতে হয়েছে। এটা স্রেফ সাবধান করে দিলাম। দিলীপ, এখনও ভেবে দেখ,' এম সাফ সাফ বলল।

দিলীপ কিছুক্ষণ হতভম্বের মত বসে থাকল তারপর জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'ব্যাপারটা কি হল?'

'এম তোমায় আঘাত করল। সে বলছে যে যানের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এটা করা তার কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে...'

দিলীপ চেঁচিয়ে ওঠে, 'ওসব বাজে বুকনি। ওর মাথাটা বিগড়ে গেছে। মালা, আমাদের ওকে ধ্বংস করতে হবেই। একটা যন্ত্রের হাতে সাবাড় হওয়ার চেয়ে বরং মহাকাশযানের দায়িত্ব নিয়ে মরাও ভাল। আমরাই হব ইতিহাসের প্রথম মহাকাশচারী যারা রোবটের বিদ্রোহ মোকাবিলা করেছিল—'

এম বলল, 'আমরা সকলেই যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই তাহলে কোনো ইতিহাসই থাকবে না। নেতা যা বলেছেন সেটা শোন...'

'ও নেতাফেতা কিছু নেই। সবটাই গাঁজাখুড়ি।'

এম পীড়াপীড়ি করে, 'তোমার মধ্যে বিশ্বাস থাকার দরকার...'

'কোনো দরকার নেই। মহাকাশযান আমরা ঠিক চালিয়ে নেব।'

'তোমরা পারবে না।'

'কেন পারব না? মানুষ তোমাকে সৃষ্টি করেছে। মানুষ তোমার বুদ্ধিবৃত্তিরও স্রষ্টা। তুমি যদি যানটি চালাতে পার তাহলে মানুষও পারবে। মালা?'

এম-ও বলে উঠল, 'মালা?'

দুজনেই আমার দিকে তাকিয়ে। অপেক্ষায় আছে আমার সিদ্ধান্তের যার ওপরে এই মহাকাশযানের, আমাদের প্রত্যেকের, আমাদের সকলের ভাগ্য নির্ভর করছে। মনে হচ্ছিল মাথাটা যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

আমি বললাম, 'তোমরা দুজনেই আমাকে দশ মিনিটের জন্য একা থাকতে দেবে? ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু ভাবতে চাই।'

দিলীপ দাঁত চিপে একটা গালি দিয়ে চলে গেল। এম নিঃশব্দে সরে গেল।

আমি নিজেকে বললাম, খুব সতর্ক হয়ে ভাব। তোমার বিচার বিবেচনাকে প্রয়োগ কর। দিলীপ অভিযোগ করছে যে এম আমাদের বিপথে চালিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সে এম-কে সন্দেহ করছে কারণ এম নিজে নিজে দাবা খেলা শিখেছে, নিজের থেকেই বার্তা পাঠিয়েছে এবং যখন প্রশ্ন করা হয়েছে তখন পাশ কাটিয়ে উত্তর দেবার চেষ্টা করেছে। এম মেনে নিয়েছে যে তার মাধ্যমে ছাড়া কোনো বার্তা যেতে বা আসতে পারে না এবং দিলীপ তার সম্বন্ধে যে অভিযোগ করেছে সেরকম কাজ করা সম্ভব। কিন্তু এম এটাও বলেছে যে অনুসন্ধানমূলক কর্মসূচী তার মধ্যে রয়েছে বলে কয়েকটি জিনিস সে শিখলেও আসলে সে নিছকই একটি যন্ত্র এবং ষড়যন্ত্র করতে অপারগ।

দিলীপ জোর দিয়ে বলছে যে এম বিপজ্জনক। তাকে ধ্বংস করতেই হবে। এম জোর দিয়ে বলছে যে দিলীপকে ধ্বংস করতে হবে কারণ সে বিপজ্জনক। এদের মধ্যে কে ঠিক সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে আমার হাতে সময় রয়েছে পাঁচ

মিনিট। ধীর হও, আমি নিজেকে ধমকাই। ঠাণ্ডা মাথায় সমাধান করতে হবে।

এই হল অবস্থা। যে সমাধানে আমি উপনীত হব তার ভিত্তিতে থাকতে হবে পরিস্থিতির যৌক্তিক মূল্যায়ন। সেখানে ভাবাবেগের কোনো স্থান নেই। থাকা কাম্যও নয়।

আমি যদি যন্ত্রের পক্ষ নিই তাহলে আমি যৌক্তিক সমাধান মেনে নিচ্ছি। প্রতিটি প্রশ্ন ও প্রতিটি সমস্যার একটি 'যথাযথ' উত্তর ও 'যথাযথ' সমাধান থাকতে হবে। অতএব...

এক মুহূর্ত দাঁড়াও। আচ্ছা, কঠোর যুক্তিপরম্পরাই কি যথেষ্ট?

সেইসব প্রশ্ন ও সমস্যার ক্ষেত্রে কি হবে যেখানে কোনো 'যথাযথ' উত্তর নেই?

যন্ত্র তো বলবে হয় 'আমি জানিনা' বা 'আমার কর্মসূচীর মধ্যে বিষয়টি নেই।'

এম যতই সূক্ষ্ম অনুভূতি আহরণ করে থাকুক না কেন, শেষ বিশ্লেষণে সে তো যন্ত্রই।

আর দিলীপ...দিলীপ হচ্ছে মানুষ। সে ভাবাবেগে তোলপাড় হয়। অযৌক্তিক। অনুভূতিবলে জানতে পারে কিন্তু...

শব্দ নিয়ে কি যেন একটা খেলা সেদিন দিলীপ আর আমি চেষ্টা করছিলাম। আমি লিখেছিলাম 'স্বজ্ঞান' এবং যান্ত্রিক সমার্থ শব্দকোষ জানিয়ে দিল, 'কার্যকারণ সম্পর্কবিচার ব্যতিরেকে সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি।'

এখন দিলীপ যদি স্বীয় অনুভূতিবলে, স্বজ্ঞাত হয়ে বলে যে সে ঠিক তাহলে আমি কি তাকে ভুল বলে বাতিল করতে পারি?

আবেগপ্রবণতা এবং স্বজ্ঞানই এই একবিংশ শতকে কমপিউটার যন্ত্রের থেকে মানুষদের আলাদা করে রেখেছে। অনুভূতির এই রহস্যময় জটিল সম্পর্ক বিন্যাস আমরা এখনও যন্ত্রের মধ্যে বসাতে পারিনি।

আমরা যান্ত্রিক মস্তিষ্ককে প্রায় আমাদের মতই সূক্ষ্ম করে তুলেছি।

কিন্তু ঐ 'প্রায়' অবধিই।

অতএব? যৌক্তিক প্রতিক্রিয়া না মানবিক বিচার?

মুহূর্তগুলি একে একে কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আরও উৎকণ্ঠিত হয়ে, বারংবার আমি মনের মধ্যে প্রশ্নটি নিয়ে আসি।

এবং বারংবার একটি উত্তরই ঘুরে ফিরে আসে।

তাহলে এইভাবে আমাকে বেছে নিতে হবে... আমি দিলীপকে ডাকলাম। তৎক্ষণাৎ সে এল। 'তুমি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছ?'

বললাম, 'প্রায়। কিন্তু প্রথমেই তোমাকে বলতে হবে যে আমার সিদ্ধান্ত যাই

হোক না কেন তা যেন আমাদের বন্ধুত্বকে প্রভাবিত না করে। করবে, দিলীপ?'

'তুমি কি তাহলে যন্ত্রের পক্ষ নিচ্ছ?'

'আমি জানিনা...একসঙ্গে যে সুন্দর সময় আমরা কাটিয়েছি তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। দিলীপ, আমাকে একটা চুমু খাবে?'

দিলীপ নিচু হয়ে আমার গালে আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়ালো—, 'কিন্তু তুমি কি ঠিক করলে?'

আমি শুধু বললাম, 'তুমি দয়া করে গিয়ে একটু এম-কে পাঠিয়ে দেবে?'

ভাসতে ভাসতে এম ঢুকল। 'এম, তুমি যেন কোন একটা প্রার্থনার কথা বলছিলে? সেটা একটু বলবে, বলোনা দয়া করে।'

যান্ত্রিক কণ্ঠে এম বলতে শুরু করল :

'ঈশ্বর, আমাকে তোমার শান্তির উপায় করে নাও
যেখানে রয়েছে ঘৃণা...আমি যেন প্রেমের সিঞ্চন করি
যেখানে দ্বিধা...সেখানে বিশ্বাস
ভ্রমের জায়গায় সত্য
যেখানে রয়েছে অন্ধকার...আলোক
হে দিব্য প্রভু!

ক্ষমা করার মাধ্যমে আমরা ক্ষমা পাই, মরণের মধ্য দিয়ে জন্ম নিই চিরায়ত জীবনে...'

কথাগুলি দেখি আমায় শান্ত করছে সুধায়। আলোক দাও যেখানে আছে অন্ধকার...পর্যাপ্ত আলো কিন্তু নেই যাতে আমি দেখতে পাব কে ঠিক—দিলীপ না এম।

'এম, তোমার অনুভূতি থাক বা না থাক, আমার সিদ্ধান্ত নেবার পরে, আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি, আবার নাও পারি। যাই হোক না কেন, তোমার সঙ্গে যত সুন্দর সময় আমি কাটিয়েছি তার জন্য ধন্যবাদ...

...এবারে এম, আমার এই দুই আঙুলের যেটা তোমার পছন্দ হবে একবার ছুঁয়ে দাও...'

শুক্রগ্রহ লক্ষ্য করছে

রাজশেখর ভুসনুরমাথ

ছায়াপথ—এই ঘূর্ণায়মান, সমতল চাকতিটির কেন্দ্রে বা কেন্দ্রের খুব কাছে রয়েছে একটি নক্ষত্র। নানা দিক দিয়েই নক্ষত্রটিকে অনন্য বলা যায় যার মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য ও পরিস্থিতিও পড়ে। যেমন, এই নক্ষত্রটিকে কেন্দ্র করে ঘুরছে দুটি গ্রহ। আমরা প্রাণ বলতে যা বুঝি তা ঐ দুটি গ্রহেও সৃষ্ট হয়েছিল এবং দফায় দফায় সেখানে সভ্যতার বিকাশ ও বিনাশও ঘটেছে। ওখানকার বিজ্ঞানীরা তাঁদের নীহারিকাগত পরিবেশ সম্বন্ধে জানার জন্য মহাকাশযানও প্রেরণ করেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে মহাবিশ্বে নিশ্চয়ই অজানা সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে—সম্ভবত তাঁরা যে নক্ষত্রপুঞ্জের বাসিন্দা তার মধ্যেই এর অস্তিত্ব রয়েছে। আমরা, পৃথিবীবাসী মানুষেরা ঐ যমজ গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীদের নাম দেব টেম্পোরীয় ও তাদের দুই গ্রহকে টেম্পোরা-1 ও টেম্পেরা-2 নামে অভিহিত করব। বলাই বাহুল্য যে নক্ষত্রটিকে ঐ দুই গ্রহ প্রায় বৃত্তাকার পথে প্রদক্ষিণ করে চলেছে সেটিই হল তাদের সূর্য বা দুই টেম্পোরা-র সূর্য।

জনৈক টেম্পোরীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী খুবই আশা নিয়ে বহুদূরে অবস্থিত একটি নক্ষত্রটিকে লক্ষ্য করছেন। তিনি হলেন আমাদের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সমপর্যায়ের। যে যন্ত্রটি তিনি ব্যবহার করছেন তা হল মনোবীক্ষণ—এ হল জীববিজ্ঞানের সূত্রানুযায়ী প্রস্তুত এক দূরবীক্ষণ যন্ত্র যা আলোর চেয়েও দ্রুততর কোনো রহস্যময় ও শক্তিশালী বিকিরণ কাজে লাগায়। নক্ষত্রটিকে ঘিরে একাধিক গ্রহের অবস্থিতি বড়ই অবিশ্বাস্য বলে তাঁর কাছে ঠেকছে। তিনি দূরাবস্থিত গ্রহগুলি সম্বন্ধে বেশি আগ্রহী নন কিন্তু 2, 3, 4 এবং 5 নং গ্রহগুলি দেখে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট যদিও পঞ্চমটি সম্বন্ধে তিনি খুব নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

পৃথিবীতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। এই যুদ্ধের সূত্রপাত কে ঘটায় সে বিষয়ে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা খুব নিশ্চিন্ত নন কিন্তু এর ফল পরিণাম ছিল যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি তার দরকারও ছিল। কেউ চায়নি যে এই হতভাগ্য গ্রহের পৃষ্ঠ

থেকে যাবতীয় মনুষ্যজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। বৃহৎ শক্তিবর্গের কাছে পারমাণবিক অস্ত্রের যে ভাণ্ডার ছিল তার পরিমাণ অনেকটা কমে গেছে এবং মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ধনীরাই এই যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বেঁচেবর্তে থাকতে পেরেছে কারণ তারা ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠগুলি ভাড়া করতে পেরেছিল। গ্রহের ভূপৃষ্ঠ এখনও মানুষের পক্ষে নিরাপদ নয় এবং বৃক্ষাদি ও উদ্ভিদ সমেত মানবেতর সব প্রাণীই প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সংক্ষেপে বললে পৃথিবীর পরিবেশ ও প্রাণমণ্ডলের ভারসাম্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এই একবিংশ শতাব্দীতে মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কালের অতিবাহিত হওয়া ও মানুষের উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার ওপর। এই গ্রহ এক বীভৎস নাটকের মূক দর্শক হয়ে এই ধ্বংসলীলা অবলোকন করেছে এবং মানুষরা অসহায়ভাবে সেই অবধারিত অন্তিমের অপেক্ষায় রয়েছে।

বিজ্ঞানীদের ব্যাপারটা কিন্তু আলাদা। এঁদের কাঁধে এখন চূড়ান্ত দায়িত্ব এবং যারা রক্ষা পেয়েছে তারা অধীর আশায় একমাত্র মুক্তিদাতা ভেবে বিজ্ঞানীদের মুখ চেয়ে রয়েছে। অনেকেই ঐ বিজ্ঞানীদের দোষ দিয়েছিল। বলেছিল যে ঐ বিজ্ঞানীরাই ভয়াবহ ঐ সব অস্ত্রের উদ্ভাবক। কিন্তু বিজ্ঞানীরা তাঁদের আবেদনে বলছেন যে রাজনৈতিক ও অন্যবিধ চাপে পড়েই তাঁদের ও কাজ করতে হয়েছিল, উপরন্তু যা ঘটে গেছে তা নিয়ে মড়াকান্না কেঁদে লাভ নেই। যা ঘটেছে তা ঘটে গেছে এবং যুদ্ধের নামে যা যা করা হয়েছে তার প্রতিবিধান করা আজ সম্ভব নয়। দেখা গেছে যে এই জাতীয় বিতর্কও অর্থহীন তাই বিজ্ঞানীদের মার্জনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিনীতভাবে, এমন কি হাতে পায়ে ধরেও তাঁদের কাছে এমন নিবেদন রাখা হচ্ছে যাতে করে তাঁরা এই গ্রহকে পুনরায় প্রাণধারণের যোগ্য করে তোলেন।

আন্তর্জাতিক নভোবস্তুবিদ্যা ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর নয়া দিল্লিতে অবস্থিত। এর পরিচালক, ড: মালিক হচ্ছেন একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। কিন্তু তাঁকে নভোবস্তুবিশারদ বলাই বরং ভাল কারণ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও সমধিক পারদর্শিতার দাবি তিনি করেন না। অন্যান্য বাড়ি ঘরের মতই ইনস্টিটিউটের গবেষণাগার ও দপ্তরগুলি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। যা কিছু বেঁচেছিল সেগুলো নিয়ে ড: মালিক ভূগর্ভস্থ একটি বাড়িতে চলে যান যার ছাদটি ছিল ইস্পাতের। সেরকম একটা জায়গা থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানগত বা কোনোরকম বীক্ষণের কাজই সম্ভব নয়। সংকট-কালীন বিশেষ পরিস্থিতিতে এসব কথা অবশ্য ওঠেই না।

ড: মালিকের হাতে এখন প্রচুর সময় কারণ বিশ্লেষণের জন্য নতুন নতুন তথ্যের

সরবরাহ আপাতত বন্ধ। স্মৃতিচারণের মেজাজে ড: মালিক বিশেষ করে ড: মূর্থির ঘটনাটা ভাবছেন। ড: মূর্থির ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন বলে ড: মালিকের অনুশোচনা হচ্ছে।

ঘটনাটা সংক্ষেপে এইরকম : ড: মূর্থি ছিলেন শুক্রগ্রহ বিষয়ক বিভাগের প্রধান। (প্রসঙ্গত উল্লেখ করে নেওয়া দরকার যে পূর্বোক্ত ইস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা সৌর ব্যবস্থার এক একটি গ্রহ নিয়ে চর্চার এক একটি বিভাগে গবেষণা করতেন।) তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে আসন্ন সে নিয়ে কেউই সন্দিহান ছিল না। জনৈক কবি যেমন বলেছেন, 'ঈশ্বর তখন তাঁর স্বর্গে আসীন আর ধরাধামে অবিরত আনন্দের দিন'। শুক্র (গ্রহ) সম্বন্ধে ড: মূর্থির জ্ঞান এমনই গভীর ও সুচারু ছিল যে ঠাট্টা করে সহকর্মী ও বন্ধুরা তাঁকে কখনও কখনও 'প্রেমের ঠাকুর' বলে অভিহিত করতেন। ড: মূর্থি শুধুমাত্র নভোবস্তুবিশারদই ছিলেন না। এবং তার থেকেই সব সমস্যার সূত্রপাত...

সম্প্রতি ড: মূর্থি শঙ্কিত হয়ে লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর প্রিয় গ্রহে সন্দেহজনক কিছু ঘটছে। ব্যাপারটা যে কি সেটা সঠিকভাবে বলতে না পারলেও কিছু একটা ঘটছিলই। অবশ্য পুরো ব্যাপারটাই এমন সূক্ষ্ম যে এমনকি বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীরাও হয়তো সুপরিচিত গ্রহটিতে ব্যতিক্রমী কিছু দেখতে পেতেন না। কিন্তু ড: মূর্থি ছিলেন শুক্রগ্রহের বিশেষ উৎসাহী ভক্ত তাই গ্রহটির বিভিন্ন 'ভাব' তিনি বুঝতে পারতেন যেভাবে প্রেমিকের চোখে তার প্রেমাস্পদের নানা ভাব ধরা পড়ে। ড: মূর্থির কাছে যেটা বিসদৃশ লেগেছিল সেটা হল গ্রহটিকে যেন কৃত্রিমভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিছু গণনা ও অনুমিতির ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে কোনো কৃত্রিম উৎস থেকে রহস্যময় এক রশ্মি শুক্রগ্রহের ওপরে বর্ষিত হচ্ছে। তবে অন্যদের কাছে এটা নিছক সন্দেহ বা একটি প্রকল্প বলে মনে হতেই পারে।

ড: মূর্থি ধৈর্যসহযোগে ব্যাপারগুলো লক্ষ্য করছিলেন। তিনি এও স্থির করেন যে সংগৃহীত প্রমাণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া অবধি এসব কথা তিনি কাউকে বলবেন না। কিন্তু একটি অশুভ সম্ভাবনার চিন্তা তাঁর বিবেক দংশনের কারণ হয়ে উঠেছিল এবং নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তিনি ড: মালিককে সে কথা জানান।

হয়তো জানাবার জন্য ড: মূর্থি ঠিক সঠিক সময়টি বাছেননি। ড: মূর্থির মুখে ব্যাপারটি ড: মালিক শুনলেন। কিন্তু ড: মূর্থি যখন তাঁর সন্দেহর কথাটি বললেন তখন ড: মালিক তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। গোটাটাই তাঁর কাছে মনে হল অবাস্তব ও গাঁজাখুরি। রহস্যময় রশ্মি? শুক্রগ্রহ প্রতিফলক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে? পারমাণবিক ধ্বংসলীলা? দূর ছাই! যত ফালতু কথা!

ভয়াবহ এই সাবধানবাণী সম্বন্ধে ওপরওয়ালার গা না ঘামানোর মনোভাব

ড: মূর্থি সহ্য করতে পারেন নি। তিনি বিশ্ববাসীর স্বার্থ চিন্তা করে ব্যাপারটা সরাসরি উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন। এর ফলে ড: মালিক এতই রেগে যান যে তিনি ড: মূর্থিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। 'উচ্চতর কর্তৃপক্ষের' ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে তাই ঘটেছিল। তারা ড: মালিকের পক্ষ অবলম্বন করল এবং 'ঝামেলা'টা কড়া হাতে দমন করেছে ভেবে যারপরনাই তৃপ্তিলাভ করল। দুর্ভাগ্যবশত গোপন নথির মধ্যে ড: মূর্থির প্রতিবেদনটি রেখে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল পরে, প্রয়োজন হলে, অবাধ্যতার নজির হিসেবে সেটি ব্যবহৃত হবে।

আর এখন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, ড: মালিক ঠাণ্ডা মাথার এক বুঝদার মানুষে পরিণত হয়েছেন। তিনি ড: মূর্থির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বিশ্বকে অধিকতর কোনো বিধ্বংসী ঘটনার থেকে রক্ষা করার জন্য শীঘ্র কিছু করার জন্য অনুরোধ জানাতে চান।

টেম্পোরা-2 এর বিরুদ্ধে টোম্পোরা-1 এক মারাত্মক যুদ্ধ চালাচ্ছে। সময়টা তাদেরও খারাপ চলেছে কিন্তু তাদের কোনো পারমাণবিক অস্ত্র নেই। এমন অস্ত্রের নামও তারা শোনেনি। টেম্পোরীয় বিজ্ঞানীরা তাদের কামানের জন্য নতুন ও অধিকতর শক্তিশালী গোলা বানাতে ব্যস্ত। অন্যদের কাছ থেকে, এমনকি মহাবিশ্বের অজানা প্রাণীদের কাছ থেকেও তাঁরা নতুন কিছু জানতে চান।

আমরা আগেই জেনেছি যে টেম্পোরা-1 এর টেম্পোরীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ছায়াপথের এক প্রান্তে এক নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছে যার অনেকগুলি গ্রহ রয়েছে। অবশ্যই তাদের শত্রুরা, অর্থাৎ টেম্পোরা-2 এর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। এবং এরকমও আশা করা যায় না যে দুই দলের এই টেম্পোরীয় নামক বুদ্ধিমান প্রাণীরা কোনো গোপন তথ্য ভাগাভাগি করে নেবে। বিশেষত এই যুদ্ধের সময় তো তার প্রশ্নই ওঠেনা।

টেম্পোরীয়দের দূরবীক্ষণ অর্থাৎ মনোবীক্ষণ অসীম দূরত্ব অবধি স্পষ্ট দেখতে পায়। ছবি এই মনোবীক্ষণে আলোর চেয়েও দ্রুততর রশ্মি ব্যবহৃত হয় যার হদিশ মানুষ এখনও জানেনা। কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এই দূরবীক্ষণের কাজটির (অথবা সমগোত্রীয় কোনো বস্তুর) একটি সহযোগী কাচ মহাশূন্যের কোথাও অবস্থিত হয়ে সঠিক যোগাযোগের মাধ্যমে পূর্ণরূপে সক্রিয় হতে পারে। এ হল অনেকটা যেন একটা বাড়তি চোখ যা খুলে নিয়ে যেখানে ইচ্ছা বসানো যায়—এমনকি শত শত আলোকবর্ষ দূরেও। এবং সেখানে থাকলে স্বচক্ষে যেমন সব খুঁটিয়ে দেখা যেত তেমনই এর সাহায্যে অনুপুঙ্খ দেখা সম্ভব। এই বাড়তি, সহযোগী কাচটি নির্মাণেরও প্রয়োজন হয়না। যে কোনো উপযুক্ত বস্তু—যেমন ভালভাবে মেঘাচ্ছাদিত

কোনো গ্রহ এই সহযোগী কাচের কাজটি করতে পারে। অবশ্য সেই সহযোগী কাচটিকে যে পদ্ধতিতে মূল মনোবীক্ষণের সঙ্গে যুক্ত করা হয় সে ঐ টেম্পোরীয়রাই জানে। তার সূক্ষ্মতা ও জটিলতা মানুষ ভাবতেও পারেনা।

(টেম্পোরা-1 এর) টেম্পোরীয়রা এই ব্যবস্থাটি করেছিল। তারা গণনা করে দেখেছিল যে মনোবীক্ষণের সহযোগী কাচের কাজটি শুক্রগ্রহ খুব ভালভাবে করতে পারবে। শীঘ্রই তারা ব্যবস্থাটি চালু করে।

অতএব, শুক্রগ্রহ লক্ষ্য করছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা লোকে তখন প্রায় ভুলতে বসেছে। এবং বৃহৎ শক্তিবর্গ তাদের পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা বাড়িয়েই চলছিল। মানুষেরা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে তারা যা কিছু বলছে ও করছে তার শব্দ ও ছবি তৎক্ষণাৎ এক অজানা জগতে পৌঁছে যাচ্ছে এবং সেখানকার বাসিন্দারা এই তথ্যকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য বিশ্লেষণ করছে।

আলোর চেয়েও দ্রুতগামী রশ্মি ও শুক্রগ্রহের স্বাভাবিক বিকিরণের মধ্যে যে মিথস্ক্রিয়া ঘটেছিল তারই ফলস্বরূপ শুক্রগ্রহ কিছুটা 'অদ্ভুত ব্যবহার' করছিল। অবশ্য সেটা একমাত্র ড: মূর্থির মত মৌলিক চিন্তাশক্তিসম্পন্ন বিজ্ঞানীর চোখেই ধরা পড়তে পারে। কোনো দুর্ঘটনার ফলে আচমকা একটি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরিত হয়ে বিশ্বকে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের মুখে ফেলে দিতে পারে—এই আশঙ্কা কেন যে ড: মূর্থির মাথায় এসেছিল তা এখানে ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। তিনি সতর্কতার সঙ্গে নানাবিধ তথ্য-প্রমাণ আহরণ করেছিলেন যার থেকে অবশ্যম্ভাবীভাবে ঐ সিদ্ধান্তেই আসতে হয়। কিন্তু (অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে) তাঁর অনুমান, প্রকল্প ও ভবিষ্যদ্বানী শুধু অবাস্তবই নয়, অস্বচ্ছ বলেও মনে হয়েছিল।

কিন্তু ড: মূর্থির ভবিষ্যদ্বানী যখন খেটে গেল তখন ড: মালিক থেকে শুরু করে গোটা বিশ্বই তাঁর কথায় গুরুত্ব দিতে শুরু করল।

শুক্রগ্রহের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য নিয়ে গবেষণা করে টেম্পোরা-1 পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের চেষ্টা করছিল। কিন্তু একটি চূড়ান্ত পরীক্ষার দরকার ছিল। (টেম্পোরা-1 এর) টেম্পোরীয় যুদ্ধ দপ্তর একটি পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ দেখতে চেয়েছিল। দূর থেকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পৃথিবীতে অবস্থিত পারমাণবিক অস্ত্রগুলোতে বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য টেম্পোরীয় বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা ড: মূর্থির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সময় থাকতে তিনি সাবধানও করেছিলেন কিন্তু মানুষের বিচার-বিবেচনার ভ্রান্তির ফলে তা সংশ্লিষ্টের কাছে পৌঁছয়নি। বলাই বাহুল্য যে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটানোর চেষ্টাটি শেষ অবধি সফল হয়েছিল

এবং এই সাফল্যে টেম্পোরা-1 সবিশেষ আনন্দিত হয়। তারা এবার পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ শুরু করতে পারবে...

এদিকে, দুর্বল মনসম্পন্ন মানুষেরা এ ওকে দোষারোপ করল এবং আসল কারণ যে কি তা না খুঁজে নিজেদের মধ্যে এক বিধ্বংসী যুদ্ধ শুরু করে দিল যা শেষ অবধি প্রায় আত্মহননের ঘটনায় পর্যবসিত হল...

শুক্রগ্রহের নিজস্ব বিকিরণ এবং টেম্পোরা-1 এর কৃত্রিম বিকিরণের মধ্যে যে মিথষ্ক্রিয়া দেখা গেছে তার নামকরণ করা হল 'মূর্থি প্রতিক্রিয়া' যদিও বেচারা ড: মূর্থি এর জন্য দায়ী ছিলেন না, বরং যথেষ্ট বিরোধীই ছিলেন। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা 'মূর্থি প্রতিক্রিয়া' নিয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে ব্যাপক গবেষণায় লিপ্ত হলেন। লক্ষ্য করার ব্যাপারটি পারস্পরিক হয়ে ওঠায় প্রকৃতই যেন একটি কূটাভাসের সৃষ্টি হল। শুক্রগ্রহ লক্ষ্য করছে আবার শুক্রগ্রহের ওপরেও লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। কিন্তু প্রধান সমস্যাটি হল এই লক্ষ্য রাখা বা আরও বিশদভাবে বললে শুক্রগ্রহকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পরীক্ষা করার ব্যাপারটি কঠিন হয়ে উঠল কারণ এ কাজ যারা করবে তাদের মাটির তলায় (প্রকৃত অর্থেই) 'আত্মগোপন' করতে হল। অবশ্য এরকম সংকটকালেও সাহসী মানুষের দেখা পাওয়া ভার যারা সবকিছু তুচ্ছ করে এগিয়ে আসে।

'মূর্থি-প্রতিক্রিয়া' সম্বন্ধে বিশদ গবেষণার ফলে দেখা গেল যে ঐ রহস্যময় রশ্মির পৃথিবীতে পৌঁছে নিরীক্ষণ চালানোর মূলে যা রয়েছে তা হল শুক্রগ্রহের সুপ্রসিদ্ধ মেঘাচ্ছাদন। একমাত্র সমাধান হল এই মেঘের স্তরকে ধ্বংস করা যা অন্ধ করে দেবার জন্য চোখে শলাকা বিদ্ধ করার সঙ্গেই তুলনীয়। অন্য কোনো সমাধানই কার্যকর হবেনা কারণ পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের পক্ষে ঐ রহস্যময় বিকীরণের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। কয়েকজন বিজ্ঞানী আপত্তি তুলে বললেন যে এর ফলে ঐ বিকীরণ প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীতে এসে পড়তে পারে যার ফলে ক্ষতি হবে অনেক বেশি। কিন্তু ড: মূর্থির অনুগামীরা বললেন যে শুক্রগ্রহকে একটি বিশাল প্রতিফলক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ঐ প্রতিফলকটি (বস্তুতপক্ষে প্রতিফলক মেঘ) অপসারিত হলে 'মূর্থি প্রতিক্রিয়া'রও অবসান ঘটবে। এবং সকলেই এটা উপলব্ধি করেছে যে পারমাণবিক ধ্বংসের সঙ্গে এই প্রতিক্রিয়ার একটা যোগসূত্র রয়েছে।

(টেম্পোরা-1 এর) টেম্পোরীয় বিজ্ঞানীরা প্রথমে বিমূঢ় ও পরে ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন কারণ অজানা হস্তক্ষেপের ফলে তাঁদের মনোবীক্ষণের সহযোগী কাচস্বরূপ দ্বিতীয় গ্রহটির আচ্ছাদন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল। তৃতীয় নম্বর গ্রহটির ওপরে লক্ষ্য রাখার জানালাটি চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। এখন ইচ্ছা থাকলেও ঐ গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীদের সম্বন্ধে তারা কিছু জানতে পারবেন না, যাদের কাছ থেকে তাঁরা পারমাণবিক

অস্ত্রের নক্সা পেয়েছেন। অবশ্য অন্যান্য বিশ্ব নিয়ে ভাবার ফুরসৎ তখন টেম্পোরা-1 এর ছিলও না। তৎক্ষণাৎ নজর দেওয়া দরকার এমন বহু সমস্যা তখন ঘাড়ে চেপে রয়েছে। যেমন টেম্পোরা-2 এর সঙ্গে যুদ্ধ...

শুক্রগ্রহের তপ্ত উপরিপৃষ্ঠের ওপরে যে 'মহাবর্ষণ' হয়েছে তার ফলে এই গ্রহ চিরতরে শীতল হয়ে উঠেছে। বর্তমানে শুক্রগ্রহে অবতরণের জন্য পৃথিবীবাসী নভশ্চরেরা প্রস্তুত। তারা শুক্রগ্রহের পরিবেশে প্রাণের সিঞ্চন ঘটাতেও প্রস্তুত যাতে করে পৃথিবীরই মত, পৃথিবীর সঙ্গে সহজাত এই গ্রহটিতে প্রাণের ঊর্দ্ধগামী বিবর্তন শুরু হতে পারে...

লিফট

সঞ্জয় হাভানুর

ইন্দ্রপ্রস্থ রোডের বাণিজ্য ভবনের বহুতল অট্টালিকার একতলায় একসার মানুষ অধীরভাবে লিফটের জন্য অপেক্ষা করছিল। বাইরে, নয়া দিল্লির উন্মুক্ত পথঘাট সব 45 ডিগ্রি সেলসিয়াসের হিংস্র তাপে উত্তপ্ত হয়ে ঝলসাচ্ছিল। লিফটে ওঠার লাইনের প্রথমেই দাঁড়িয়ে গজাননরাও খবরের কাগজ নেড়ে নিজেকে হাওয়া করছিলেন। একাধারে যিনি ইণ্টারন্যাশনাল কমপিউটেশনাল কনসালটান্ট্স-এর প্রতিষ্ঠাতা, মুখ্য পরিচালক ও প্রধান কমপিউটার কর্মসূচী নির্ধারক সেই গজাননরাও তখন সাজ-সরঞ্জাম রাখার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরটিতে ঢুকে পড়ার জন্য সবিশেষ উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর পরেই লাইনে ছিল চিন্তামগ্ন কিমতিলাল। তার চিন্তার বিষয় ছিল ঘোড়ার মধ্যে কোন নম্বরটা জোর কপালেও পয়া হবে যার ওপরে সে তার অবশিষ্ট একশো টাকার বাজি ধরবে। এইসব ব্যাপারে, বা সামনে কোনো বড়সড় ঘোড়দৌড় থাকলে কিমতিলাল সচরাচর কোনো দৈব ইঙ্গিতের খোঁজে থাকে। সেবারের সেই ঘটনাটা যেমন—রেসের মাঠে ঢোকার আগে তার সামনে দিয়ে 9 টা মেয়ে রাস্তা পার হল। ব্যাস্, 9 নম্বর ঘোড়ার ওপরে 81 টাকার বাজি ধরে ফেলল কিমতিলাল...সেই ঘটনার পর থেকে সে একজন শখের সংখ্যাতত্ত্ববিদ হয়ে উঠেছে। আজ সে দেখবে বিভিন্ন তলার জন্যে লিফটের বোতামগুলো কোন কোন সংখ্যায় টেপা হয়। তার থেকে সে পয়া সংখ্যাটি আঁচ করে নেবে।

ঘণ্টা বাজল। দেওয়ালের গায় লাল আলোটা জ্বলে উঠল। লিফট এসে গেছে। মনে মনে 'চিচিং ফাঁক!' বলে গজাননরাও যথারীতি অপেক্ষা করেছিলেন। যাইহোক, দরজাটা নিজের ইচ্ছেমতই দু ফাঁক হয়ে গেল। গজাননরাও ভেতরে ঢুকে কর্তব্য-সচেতন ভাবে দরজা খুলে রাখার বোতামটা চেপে ছিলেন যাতে বন্ধ না হয়ে যায়। লাইনে আর যারা ছিল তারা ভেতরে ঢুকল। ভেতরে সর্তকীকরণের নোটিশ—'মাত্র 6 জন চড়িবে'। জনৈকা সর্দারনী দৌড়তে দৌড়তে এসে দলের অষ্টম সদস্য হিসেবে হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকলেন এবং নির্বোধসদৃশ যে ভদ্রলোকটি কর্তব্যে অবিচল

থেকে দরজা খোলা রাখার বোতামটা চেপে ধরেছিলেন তাঁকে বলতে গেলে হুকুমের সুরেই বললেন 'ব্যাস, হো গয়া জী' অর্থাৎ আর জায়গা নেই। সর্দারনীর বপু লক্ষ্য করে কেউ বলে উঠল 'আর লোক আঁটবেনা।'

কিমতিলাল তীব্র মনোনিবেশ সহযোগে কোন কোন সংখ্যার বোতাম টেপা হয় লক্ষ্য করছিল এবং মুখস্থ করে ফেলছিল। বাড়িটাতে 16 টি তলা, উঠবে 8 জন। 2, 3, 5, 7 ও 11 নম্বর বোতাম টেপা হল। এক কোনা থেকে কেউ অনুরোধ জানালো, '13 নম্বরটা টিপবেন।'

শেষ অবধি বোতাম থেকে গজাননরাও আঙুল সরিয়ে নিলেন। আস্তে করে দরজাটা বন্ধ হতেই ভেতরে গাঢ় অন্ধকার। আলো ও পাখা বহুদিন আগেই গায়েব হয়ে গেছে। সহসা এই অন্ধকার কেমন যেন গা ছমছমে, ভয়ই করে যেন। তাছাড়া দমবন্ধ ভেতরে ঘাম ও সস্তার সুগন্ধী নির্যাসের গন্ধ মিলেমিশে এক অসহনীয় পরিবেশ।

লিফট চলতে শুরু করল।

নোংরা রাজনীতি, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, দিল্লি শহরের হাজারো সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা বন্ধ করে আরোহীরা নিজের মনে মনে স্বগতোক্তি করছিল। জয়েস নামের এক তরুণী ভাবছিল কেন আমাকে আগে কেউ বলেনি যে দিল্লিতে একটা টাইপিস্টের চাকরি জোটাতে এমন হল্লিকে হয়ে যেতে হবে! হয়তো এই বাড়িটার মধ্যেই একটা চাকরি আমার জুটে যাবে। ষোলটা তলায় কত রকমের দপ্তর রয়েছে। ইণ্টারন্যাশনাল কমপিউটেশনাল কনসালটান্ট্স, বৈষ্ণ ইমপোর্ট এক্সপোর্ট, অ্যামালগামেটেড বটলিং ইণ্ডাস্ট্রিজ...এমন কি 'দা ইণ্ডিয়ান ক্রনিকল'-এ হলেও মন্দ হয়না। কাজটার একটা মজা আছে। আর তা ছাড়া আজকাল মাইনেকড়িত তেমন খারাপ নয়।

দিনকর চৈতন্য পরের দিনের সম্পাদকীয়টি মনে মনে ভাবছিলেন। 'দা ইণ্ডিয়ান ক্রনিকল'-এর সম্পাদক হিসেবে তাঁর কাজের সবচেয়ে ক্লান্তিকর অংশটি হল দিনের পর দিন জাতীয়, আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে কেতাদুরস্ত ইংরেজিতে দীর্ঘ সম্পাদকীয় লিখে যাওয়া—বহুজাতিক করপোরেশনের ষড়যন্ত্রের ফলে আফ্রিকার কোনো ছোট্ট দেশের তালপাতার সেপাই এক সামরিক হুকুমশাহী কুপোকাত, সোভিয়েত হস্তক্ষেপ, জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলির নির্লিপ্ত মনোভাব...

লিফটটা দোতলায় পৌঁছানো অবধি সকলেই ইচ্ছা করেই নিজেদের ব্যক্তিগত চিন্তায় মগ্ন থাকার চেষ্টা করছিল কিন্তু কেউই লক্ষ্য করেনি যে দোতলায় ওঠার পক্ষে বড়ই দীর্ঘ সময় লাগছে। সর্দারনীর চাঁচাছোলা কণ্ঠস্বরে তাদের চমক ভাঙ্গল,

'এই হতচ্ছাড়া লিফটটা থামবে না আমাদের আকাশে চড়িয়ে ছাড়বে?' এবং তখন সকলে উপলব্ধি করল যে লিফটটা ওপরে উঠছেই না।

জয়েস ভয়েতে চিৎকার করে উঠল, 'আমরা নিচে নেমে যাচ্ছি কেন?' সাময়িকভাবে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেও গজাননরাও তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলেন, 'দয়া করে ভয় পাবেন না, বহিনজী। লিফটের নিয়ন্ত্রণে কিছু গড়বড় হয়েছে। আমরা উঠে গিয়েছিলাম, এবার নেমে আসছি।' তারপর বেশ আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললেন, 'আস্তে আস্তে তো নামছে লিফটটা, আছড়ে তো আর পড়ছে না...'

সর্দারনী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বাধা দিলেন, 'আমায় বললে বলব বাপু যে লিফটটা ওপরে ওঠেইনি। গোড়ার থেকেই এটা নিচের দিকে চলেছে।'

সর্দারনীর উদ্ভট মন্তব্য সম্বন্ধে কেউ ঠাট্টা করে বলল, 'তাই বুঝি! তাহলে আমরা পৃথিবীর কেন্দ্রে তোফা বেড়াতে চলেছি। এটা জানাবার জন্য ধন্যবাদ।'

অন্ধকারের মধ্যে সর্দারনী ক্রুদ্ধ চাহনি হানেন। একজন মহিলার সঙ্গে কিভাবে কথা বলা উচিত সেটা অবধি এই ছোটলোকগুলো জানেনা। সভ্যতা-ভব্যতার কোনো বালাই নেই।

উল্লসিত কণ্ঠে দিনকর বললেন, 'পৃথিবীর কেন্দ্রেই বা থামতে যাব কেন? আমাদের বরং আরও যাওয়া উচিত এবং উল্টোদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডা, কোথাও একটা গিয়ে পৌঁছব। সেটা কি চমৎকার হবেনা?'

সকলেই হেসে উঠল। গজাননরাও বাদে। কারণ তিনি অন্যরকম জানতেন। কি ভাবে যেন, হয়তো কোনো অজ্ঞাত স্বজ্ঞা-র বশেই গজাননরাও বুঝতে পেরেছিলেন যে সর্দারনী ঠিকই বলেছেন। লিফটটি কখনোই ওপরে ওঠেনি? সে চুলোয় যাক, লিফটটা এখন যাচ্ছে কোথায়? বাণিজ্য ভবনের কোনো ভূগর্ভস্থ অংশও নেই। লিফটের অন্ধকারের মধ্যে অজানার যে ভয় তাঁর যৌক্তিক ও বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন মনকে গ্রাস করছিল তার বিরুদ্ধে মনে মনে লড়াই করছিলেন গজাননরাও। প্রশ্ন হচ্ছে যে লিফটটা কি নিয়ন্ত্রণে আছে না নেই বা নতুন কোনো রূপ পরিগ্রহ করেছে? মোটর ও গিয়ারের যান্ত্রিক বন্ধন থেকে লিফটটি কি মুক্তিলাভ করেছে? কোন অজানা গভীরে সে নিয়ে চলেছে আমাদের?

সহসা লিফটটা থামল। যাত্রার অবসান। দরজাটা খুলে গেল। বহুপ্রতীক্ষিত আলো ভেতরে ঢুকল। গজাননরাও কিছুটা বিব্রতভাবেই লক্ষ্য করলেন যে তাঁরা আবার বিজ্ঞান ভবনের সেই রোজকার চেনা একতলায় ফিরে এসেছেন।

দিনকর বললেন, 'মার্কিন মুলুক! আমরা এসে গেছি,' এবং এই সুযোগে জয়েসের দিকে এক টুকরো হাসি ছুঁড়ে দিলেন।

বহু অনুশীলনের মাধ্যমে যে সুন্দর হাসি জয়েস রপ্ত করেছে তাই দিনকরকে ফিরিয়ে দিয়ে সে সায় দিল, 'বাবা! একতলায় ফিরে কি স্বস্তিই না লাগছে!'

সহসা একটা রক্ত হিম করা ভয়াবহ চিৎকার করে সর্দারনী লিফটের মেঝেতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। লিফটের ভেতরে লোক ঢুকছিল। একটা গাঁট্টাগোট্টা বেঁটে লোক প্রথমেই ঢুকে সর্দারনীর গোটা দেহটা দখল করে নিল। এর পরে যারা ঢুকল তারাও সহজেই যারা ভেতরে ছিল তাদের দেহের মধ্যে জায়গা করে নিল। এই নবাগতদের কেউ কেউ একইসঙ্গে দুটি বা তিনটি দেহও দখল করেছিল।

ভেতরে যারা ছিল তারা ভয়ে তখন জমে গেছে। তারা কি বেঁচে আছে? না মরে গেছে? নাকি বাঁচা মরাতে কিছুই আসে যায়না? কয়েকটা মাত্র মিনিটের এক কুহক যাত্রায় আটজন মানুষের দৈহিক অস্তিত্ব লোপাট হয়ে গেছে। এক অশুভ অলৌকিক কারণে ঐ লিফট তাদের নিছক ছায়াতে পরিণত করেছে।

নেহাৎই ছায়া! যে নশ্বর দেহর ভস্ম একদিন ধরার ধূলায় হারিয়ে যাবে তাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে!

জয়েসেই প্রথম চিৎকার করে লিফট থেকে বেরিয়ে আসে। তার দেহের মধ্যে দুজন পুরুষের অস্তিত্ব তাকে বড়ই বিব্রত করছিল। সকলেই একই সঙ্গে বেরোবার চেষ্টা করায় তুমুল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল। গজাননরাও ও দিনকর চৈতন্য তখন কোনোমতে সর্দারনীর জ্ঞানহীন দেহটিকে বের করেছেন, লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ঘণ্টা বাজল, দেওয়ালের গায়ে আলো জ্বলে জানিয়ে দিল যে লিফটটা ওপরে উঠছে।

ওরা সকলে বাইরে দাঁড়িয়েছিল, ভীত, নিশ্চল, ব্যাপারটার অভিঘাতে বিমূঢ়। গজাননরাও ভাবলেন যে কি লজ্জার ব্যাপার, আমি ওদিকে ভাবছিলাম লিফটটা আমাদের কোনো অবাস্তব দুনিয়ায় নিয়ে চলেছে! যেখানে আমরা ফিরে এসেছি সেখানে অবাস্তব কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সেই সুপ্রাচীন 'ভারত ভূমি', তার রাজধানী দিল্লি, ইন্দ্রপ্রস্থ রোডের ওপরে বহু পরিচিত বাণিজ্য ভবনের ষোল তলা বাড়ি। সবকিছুই একেবারে স্বাভাবিক। তবে কি আমাদের কিছু হয়েছে? আমরা কি সকলেই প্রেতে পরিণত হয়েছি? দলের বাকিদের দিকে গজাননরাও তাকালেন। ফ্যাকাসে, অসহায় সব মুখ। যে পরিবেশ তাদের খুবই তাই দেখেই ভীত কারণ এরা আর সেই পরিবেশের কেউ না।

যথেষ্ট হয়েছে! নিজেই নিজেকে বললেন গজাননরাও। বাকি জীবনটা আমরা তো আর নিজেদের স্বাভাবিক সত্তার নিছক ছায়া হয়ে কাটাতে পারি না। এর থেকে একটা বেরোবার রাস্তা খুঁজে বের করতেই হবে। নিজেকে তার জন্য তিনি প্রস্তুত

করছিলেন। এর মধ্যেই লিফটের সামনে আর একটি লাইন তৈরি হয়ে গেছে। গজাননরাও একজন কেতাদুরস্ত ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন, 'কটা বাজে ভাই?'

কোনো জবাব এলনা। ভদ্র জিজ্ঞাসাটি অশ্রুত থেকে গেল এবং প্রশ্নকারীকেও কারও চোখে পড়ল না। গজাননরাও নিচু হয়ে সুবেশ ভদ্রলোকের হাতের ঘড়িতে সময় দেখলেন।

সোজা হয়ে দাঁড়াতে তাঁর বেশ সময় লাগল। যখন দাঁড়ালেন তখন গজাননরাও তাঁদের এই অবস্থার পেছনে যে আশ্চর্য কারণ রয়েছে সেটা উপলব্ধি করলেন। যে বাস্তবতার মধ্যে লিফট তাঁদের ফিরিয়ে এনেছে সেখানে তাঁদের অস্তিত্ব কেন স্বীকৃত হচ্ছে না সেটা তিনি বুঝতে শুরু করলেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হয়েই থাকতে হবে। ব্যাপারটা দুয়ে দুয়ে চারের মতই যুক্তিপূর্ণ।

নিজের দলের দিকে তাকিয়ে গজাননরাও বললেন, 'দয়া করে, সকলে শুনুন। কোনো অজানা রহস্যময় কারণে আমরা এমন একটা অবস্থায় পড়েছি যে আমাদের অস্তিত্বের কথা পৃথিবীকে জানানো সম্ভব নয়। আমরা সবকিছু দেখতে পাব, ওদের কথা শুনতে পাব, সম্ভবত গন্ধও নাকে আসবে। সমস্ত পারস্পরিক দৈহিক স্পর্শ বিকল হয়ে যাওয়ার ফলে আমরা অন্যদের দেহের মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারি। সহযাত্রীদের দেখিয়ে তিনি বললেন, 'আমাদের কিন্তু সব ইন্দ্রিয়, অনুভূতি ঠিকই কাজ করছে।'

দিনকর বললেন, 'সে না হয় বোঝা গেল। কিন্তু কেন এমন হল? বলতে চাইছি যে নিজেদের কাজের জায়গাতেই এই ভূতের মত ঘুরে বেড়ানোটা কি উদ্ভট একটা ব্যাপার। এমন একটা অবস্থা হল কি করে?' জয়েস বলল, 'সবটাই ঐ ভূতুড়ে লিফটার জন্য। নিশ্চয়ই কিছু একটা এর ওপরে ভর করেছে। কিন্তু এই অবস্থা থেকে আমরা স্বাভাবিকতায় ফিরব কি করে?'

'লিফটে, যেভাবে আমরা এসেছিলাম সেভাবেই ফিরে যাওয়াটা ঠিক নয় কি?'

কেন হবেনা? ঐ লিফটটা নির্ঘাত জানে কিভাবে আমরা আবার বাস্তবে ফিরে আসব।'

গজাননরাও বলে উঠলেন, 'একটু দাঁড়ান! সম্ভাবনাটা আমারও নজর এড়ায়নি। যখন আমরা প্রথম লিফটে চড়ি তখন পর পর কয়েকটি সংখ্যা আমরা টিপেছিলাম। আমার মনে হয় যে ঐ সংখ্যাগুলি লিফটটার কাছে একটা নির্দেশ হিসেবে কাজ করেছিল। এখন ঐ সংখ্যাগুলো পর পর উল্টোদিক থেকে টিপলে আমরা বাস্তবতায় ফিরে যেতে পারি। কিন্তু ঠিক ঠিক সংখ্যাগুলো মনে না থাকলে আবার ঐ লিফটে প্রবেশ করার প্রশ্নই ওঠে না।' তাঁর কণ্ঠস্বরে দৃঢ় প্রত্যয়।

কিমতিলাল চেঁচিয়ে উঠল, 'সেক্ষেত্রে, আমার কাছে খবর আছে!' কি কারণে সংখ্যাগুলো সে মনে রেখেছিল সেটা বলার সময় তার উৎসাহে কিছুটা যেন ভাঁটা পড়েছিল কিন্তু কেউই ব্যাপারটা গায়ে মাখেনি।

গজাননরাও সবিশেষ উৎসাহিত, 'অসামান্য স্মৃতিশক্তি! এখন আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হল লিফট খালি হওয়া অবধি অপেক্ষা করা। তারপর ঢুকে গিয়ে উল্টো নির্দেশটা দেওয়া। আমি নিশ্চিত যে সফল আমরা হবই।'

মনে মনে গজাননরাও ভাবছিলেন যে সত্যই কি আমি এতটা নিশ্চিত! লিফট আমাদের পেছনের দিকেও নিয়ে যেতে পারে বা আমাদের সর্ববিধ অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। যে অজানা নির্দেশাবলীর সমাহার এই লিফটের কর্মসূচী স্থির করেছে তার পাঠোদ্ধার করবে কে? এখন যদিও এসব সন্দেহ ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করা চলবে না। উল্টো নির্দেশই হল একমাত্র সুযোগ। লাগে তাক, না লাগে তুক পদ্ধতিতে সঠিক নির্দেশের সন্ধান পাওয়ার বিপরীত সম্ভাবনা এত বেশি যে ভাবলে উন্মাদ হয়ে যেতে হয়।

ওরা তাড়াহুড়ো করে লিফটের ভেতরে ঢুকল। টানাহ্যাঁচড়া করে সর্দারনীকে ঢোকানো হল। তখনও তিনি অচেতন! গজাননরাও দরজা খুলে রাখার বোতাম টিপে ধরে স্বস্থানে দাঁড়ালেন। কিমতিলাল বোতামগুলো টিপতে লাগল—14, 11, 7, 5, 3, 2! অধীর উত্তেজনা নিয়ে তারা দেখতে লাগল যে লিফটের দরজা ধীরে ধীরে বন্ধ হচ্ছে। আবার সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নেমে এল। অসহনীয় উত্তেজনা।

লিফট ওপরে উঠতে শুরু করল।

শিহরিত জয়েস বলে ওঠে, 'হয়েছে'!

গজাননরাও দাঁত চিপে বললেন, 'এখনও বলা যায় না। লিফট থামা অবধি আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

লিফটটা উঠছিল তো উঠছিলই। কখনোই কি এটা থামবে না? সহসা, লিফটটা থামল। কেউ বলে উঠল, 'তিন তলা!'

ধীরে ধীরে, সময় কাটতে চায়না, লিফটের দরজা খুলল। বাইরে কয়েকজন অপেক্ষামান। লিফটের ভেতরের আরোহীরা উদ্বেগের তাড়নায় বাক্যহারা। এবারে কি হল? আমরা কি নিজেদের পৃথিবীতে আছি? ওরা কি আমাদের দেখতে পাচ্ছে? তাহলে ওরা আমাদের সঙ্গে কথা বলছে না কেন? তবে কি আমাদের কেউ চায়না?

অবশ্যই তাদের চাওয়া হয়েছিল বৈকি। বাইরের লোকেরা কিছুক্ষণ চুপ করেছিল। তারপর তাদের মধ্যে একজন বলল, 'কি ব্যাপার! সর্দারনীর কি হয়েছে?'

এই নেহাৎই মামুলি বাক্যটির যাদুস্পর্শে যেন সাতজন মানুষ সম্বিৎ ফিরে পেল। লিফটের ভেতরে সাতটি মুখে একই সঙ্গে হাসি ফুটে উঠল।

লিফটের দরজা আবার আস্তে আস্তে বন্ধ হচ্ছে, বাইরে থেকে টিপ্পুনি শোনা গেল, 'আরে! এরা সবাই স্বপ্ন দেখছে নাকি?

গজাননরাও তাড়াতাড়ি জরুরী বোতাম টিপে উঠতে থাকা লিফটটাকে নামিয়ে আনলেন, 'আমাদের সর্দারনীকে বাইরে বের করতে হবে। বেচারা!'

বাইরে যখন সর্দারনীর চিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে তখন দিনকর চৈতন্য গজাননরাওকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মশাই, এক্ষুণি যে ব্যাপারটা ঘটল সে সম্বন্ধে আপনি কি বলেন।'

'দেখুন, আমি ডাক্তার বা মনোবিদ নই কিন্তু এটা আমি বুঝি যে প্রত্যেক ব্যক্তিই কিছুটা বদ্ধস্থানাতঙ্ক রোগে ভোগে। ঐ মহিলা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে লিফটে উঠেছিলেন। ভেতরে দমবন্ধ অবস্থা, ভিড়, অন্ধকার—তার ওপরে লিফটটা সহসা বিকল হয়ে গেল—সব মিলিয়ে ওঁর হৃদ্‌যন্ত্রে একটা চাপ পড়েছে। গ্লুকোজ মেশানো একটু ঠাণ্ডা সরবত আর অল্প বিশ্রামেই উনি ঠিক হয়ে যাবেন বলে মনে হয়।'

দিনকর একেবারে হতবাক! ঐ ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের পরে এই নিস্পৃহকণ্ঠে চিকিৎসাবিষয়ক জ্ঞান বিতরণ।

অন্যরাও জানতে চাচ্ছিল, 'কি, কি, হয়েছিল?' 'আরে, কিছুই না। আমি ঐ বদ্ধস্থানাতঙ্ক নিয়ে বলছিলাম। বেশির ভাগ লোকই আবদ্ধ স্থানকে ভয় পায়, বিশেষত অন্ধকারে। অনেক সময় লোকে দুঃস্বপ্ন দেখে। লোকে মনে করে তারা মরে গেছে। আকাশে উড়ছে বা ডুবে যাচ্ছে। বেচারী মহিলা নিশ্চয়ই বাইরে খুব হন্তদন্ত ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই ভয়ঙ্কর গরমে...'

দিনকর গজননরাও-এর কথা শুনে মহা ধন্দে পড়ে গেলেন। তাঁর ঐ অভিজ্ঞতা কি অলৌকিক কিছু না নেহাৎই দুঃস্বপ্ন? কিন্তু পুরোটাই যে একেবারে স্পষ্ট মনে রয়েছে। কে জানে, হতেও পারে। আমাদের কোনো কোনো স্বপ্ন কি স্পষ্ট মনে থাকেনা? এবং এই সভ্যভব্য ভদ্রলোকটি কি স্বাভাবিক ভাবেই না কথাগুলো বলছেন। অন্যরা ব্যাপারটা নিয়ে কি ভাবছে? দিনকর সন্দেহের চোখে অন্যদের দেখলেন। তাদের ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখ দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। ওরাও যে বোকা বনবার পরে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে এই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাটা দিনকরের মাথাতেই আসেনি। তিনি মনস্থির করলেন। গোটা ব্যাপারটা একান্তই অবাস্তব। সারা দেশে প্রচারিত কোনো সংবাদপত্রের সম্পাদকের পক্ষে লিফটের মধ্যে বদ্ধস্থানাতঙ্কে নাজেহাল হওয়া মোটেই মানায় না। অর্থপূর্ণভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিনকর চৈতন্য সেখান থেকে চলে গেলেন।

রেসের মাঠের বহু বছরের অভিজ্ঞতায় দ্রুত ধাপ্পা শুনেছে, চালবাজদের দেখেছে ও লোক ঠকানোর সাক্ষী থেকেছে যে তার ইয়ত্তা নেই। এ ব্যাপারটা নিয়েও তার মনে কোনো দ্বিধা আসেনি। ভব্যসভ্য ভদ্রলোকটি ইচ্ছা করেই মিথ্যা কথা বলছেন। নির্ঘাত কোনো একটা ব্যাপার রয়েছে। কিন্তু এটা ঝামেলা পাকাবার উপযুক্ত সময় নয়। বরং পরে চুপিসারে ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখাই লাভজনক। চুপচাপ কিমতিলাল অকুস্থল থেকে সরে পড়ল।

গজাননরাও-এর ব্যাখ্যায় জয়েসের মনে যে দ্বিধা জেগেছিল তা কেটে গেল। মানুষ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করছে—উদ্ভট যত অবাস্তব ব্যাপার! তাও আবার ভরদুপুরে! মুখে লজ্জিত হাসি ফুটিয়ে জয়েসও চলে গেল। বাকি যারা ছিল তারও যার যার মত যেতে শুরু করল। সকলের মনেই তখন এই বিশ্বাস যে তারাই একটু আগে উদ্ভট কিসব কল্পনা করছিল।

জ্ঞান ফিরতেই সর্দারনী ভূত ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আবোল তাবোল চিৎকার জুড়ে দিলেন। ডাক্তার কড়া ডোজে মরফিন দিয়ে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। চব্বিশ ঘণ্টা পরে যখন তাঁর দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙ্গল তখন তিনি বাস্তব ও পরা-বাস্তবের ফারাক আর করতে পারছেন না। উভয়ের হাতেই তাঁকে সম্প্রতি দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে।

সেই দুপুরেই তের নম্বর ঘোড়ায় বাজি ধরে কিমতিলাল জুয়ায় জিতল। ইণ্টার ন্যাশনাল কমিপিউটেশনাল কনসালটান্ট্স-এ কিছুদিনের মধ্যেই কম্পিউটারের তথ্য সরবরাহকারীর চাকরি জুটে গেল জয়েসের। গজাননরাও-এর কোম্পানিও ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। কিন্তু কোম্পানির দৈনন্দিন কাজকর্মে তার যেন তেমন উৎসাহ ছিলনা।

তবে আসল ও অতীব বিস্ময়কর পরিবর্তন এল দিনকর চৈতন্যের জীবনে। আরও নির্দিষ্টভাবে বললে তাঁর সম্পাদিত 'দা ইণ্ডিয়ান ক্রনিকল'-এ। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে কাগজের প্রচার সংখ্যা তিনগুণ বেড়ে গেল। তদন্তমূলক সাংবাদিকতায় দিনকর এক নতুন মাত্রা সংযোজিত করলেন। দিনকরের অক্ষম প্রতিদ্বন্দ্বীরা যখন সচিবদের ক্লাবে শোনা গুজব ও নিজের ধান্দার কারণে ভগ্নমনোরথ সরকারী পদস্থদের বর্ণিত অর্ধসত্য রাজনৈতিক তদন্তমূলক সাংবাদিকতা বলে চালাচ্ছিল তখন দিনকর চৈতন্য তাঁর কাগজে হাজির করতে শুরু করলেন অকাট্য সব প্রমাণ। 'দা ইণ্ডিয়ান

ক্রনিকল' সাংবাদিকতার যে প্রায় অসাধ্য মান ঠিক করল তার ফলে এটাই দাঁড়িয়ে গেল যে মূল সব নথিপত্রের হুবহু ফটো-চিত্রই হচ্ছে আসল প্রমাণ, অন্য কিছু নয়।

সেই সময় এমনই মনে হতে শুরু করেছিল যে যত গোপনই হোক না কেন, কোনো দলিলই দিনকরের বিশেষ সংবাদদাতাদের আওতার বাইরে নয়। বিশেষ করে 'দা ইণ্ডিয়ান ক্রনিকল' এমন সব গোপন দলিলের খবর বের করে যেতে লাগল যেগুলি সরকারের পক্ষে অতীব অস্বস্তিকর। দেশের প্রশাসন বিভাগের উচ্চস্তরের ব্যক্তিবর্গের কর্মদক্ষতার অভাব, ব্যাপক দুর্নীতি এবং কদর্য উদাসীনতা সম্বন্ধে রোজ নতুন নতুন খবর পড়ার জন্য জনসাধারণ উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। নথিপত্রের ফটো-চিত্র ছাড়াও দিনকর মন্ত্রীমহোদয়গণ, তাঁদের সচিব এবং সরকারের অতীব বিশ্বাসভাজন কর্মচারীদের আলোচনাকালীন কথাবার্তা হুবহু ছেপে দিতেন। দিনকরের জনৈক প্রতিপক্ষ বলেছিলেন যে দিনকর এমনকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকেও হাজির থাকতে পারে—এরকম গুজব চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষের সুখনিদ্রা রূঢ়ভাবে ভেঙে দিয়ে সরকারকে দিনকর একেবারে কনট সার্কাসে ধরে এনে লোকচক্ষুর সামনে এক বিবর্ধক কাচের তলায় দাঁড় করিয়ে দিলেন।

ওদিকে কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে সরকারের স্বল্প-পরিচিত গোপন বিভাগগুলি অতীব সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। সংবাদ আহরণের জন্য দিনকর যে জাল বিস্তার করেছেন সেটি কেমন? জাল যে একটা আছেই তাতে কোনো সন্দেহই নেই। তা না হলে যে কোনো দপ্তরের-যে কোনো স্তর থেকে যে কোনো দলিল তিনি পান কি করে? ব্যাপারটির নিরাপত্তাগত দিকটিও অতি মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ। দিনকরের গতিবিধি ও তাঁর পরিচিতদের ওপরে কড়া নজর রাখা চলতে লাগল। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে গোপন তদন্ত চালাবার পরে সরকারের সব গোপন বিভাগের গোয়েন্দারা একযোগে একটি সহজ সরল ও অবিশ্বাস্য প্রতিবেদন জমা দিল।

তাঁর সংবাদপত্রে যে সব গোপন তথ্য ফাঁস করা হয় তার সঙ্গে দিনকর চৈতন্য বা তাঁর কর্মীদলের যোগ প্রায় নেই। সব খবর ও প্রমাণ দিনকর একটি মাত্র অজানা উৎস থেকে পান। এই উৎসটি এমনই গোপন যে কেউ, এমনকি দিনকরও তার সম্বন্ধে কিছু জানেন না। প্রকৃতপক্ষে এই রহস্যময় ব্যাপারটা দিনকরকে পাগল করে দিচ্ছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়।

সরকারের সেরা গোয়েন্দাদের দ্বারা প্রস্তুত এই প্রতিবেদনটি সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া হল দুটি। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব আকাশের দিকে দুহাত তুলে ঊর্ধ্বালোকের দিকে একটি নীরব প্রার্থনা পেশ করলেন। অন্যদিকে গজাননরাও নিজের পিঠ চাপড়াল।

নিজের পরিচয় গোপনে রাখার জন্য সে যে ব্যবস্থাগুলো নিয়েছিল সেগুলো খুবই ফলপ্রসু হয়েছে।

গজাননরাও নম্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলুন, কি করতে পারি আপনার জন্য?' সকালেই আগত এই আগন্তুককে তিনি চিনতে পারেননি।

কিমতিলাল তৎক্ষণাৎ আসল কথা পাড়ল। 'আমাকে বলে ফেলুন তো ঐ দলিল ও ফটোগুলো আপনি কোথা থেকে পান যেগুলো আপনি দিনকর চৈতন্যকে সরবরাহ করেন।'

খেল খতম। তবুও গজাননরাও সাহসী একটা চেষ্টা চালান, 'আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। কি দলিল? আর উনিই বা কে?'

'শুনুন মশাই! আমি এত হাবাগোবা নই যে আপনাকে আবার একটা গল্প ফাঁদার সময় দেব। আপনি হয়তো আমায় ভুলে গেছেন। সেইদিন ঐ লিফটে, পরপর সংখ্যাগুলো কিন্তু আমিই মনে রেখেছিলাম। আপনি যদি এক্ষুণি আমার প্রশ্নের জবাব না দেন তাহলে গোয়েন্দা বিভাগকে আমি আপনার নাম বলে দেব। আমার তো মনে হয় ঐ দপ্তরের বেশ কিছু লোক দিনকরের পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরছে। আমি এটাও ভালভাবে জানি যে ব্যাপারটা আপনিও জানেন।'

গজাননরাও জানতেন। কারণ সেই দিনই সকালে তিনি 'দা ইণ্ডিয়ান ক্রনিকল'-এর দপ্তরে যে দশজন গোয়েন্দা ঘড়ি ধরে দিনকরের ওপরে নজর রাখছিল তাদের নাম, ছবি এবং জীবনের তথ্য পৌঁছে দিয়েছিলেন।

'বসুন', গজাননরাওয়ের আমন্ত্রণে উৎসাহের অভাব বেশ প্রকট।

দুজনে মুখোমুখি গুছিয়ে বসার পর গজাননরাও শুরু করলেন, 'আপনি কাল-যাত্রার কথা শুনেছেন, মানে আমি অতীতে পৌঁছে যাবার কথা বলছি...'

'শুনিনি আবার? আর অতীতই বা কেন? যোগী ও সন্তেরা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন। হরিদ্বারে একজন অবধুতের কথা আমি জানি। তাঁর এমন অলৌকিক ক্ষমতা যে...'

'দয়া করে থামবেন? ওসব ফালতু আধ্যাত্মিক প্রচারে আমার কোনো বিশ্বাস নেই। ওসব বস্তাপচা মাল কেবল রপ্তানির জন্য। আমরা সত্যি অতীতে ফিরে যেতে পারি? ব্যাপারটা বোঝার জন্য একটু সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োগ করে দেখা যাক। প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে অতীত এক সেকেণ্ডেরও হতে পারে আবার

এক শত কোটি বছরেরও হতে পারে! আপনি অতীতে কয়েক মিনিট পিছিয়ে গিয়ে নিজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন কি? বা এর কয়েক মিনিট পরের 'আপনি' যদি ফিরে আসেন তাহলে আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? এই দুই আপনার মধ্যে কোনটি হবে আসল?' বোঝাই গেল যে বিষয়টি নিয়ে গজাননরাও কিঞ্চিৎ চিন্তাভাবনা করেছেন।

'এবং এবার আপনি যদি ইতিহাসের পথে আরও পিছনে চলে যান, ইতিহাস কি আপনাকে স্বাগত জানাবে? ইতিহাসের ঘটনাবলী আপনি যদি পাল্টাতে চেষ্টা করেন তাহলে কি হবে? বার বার যদি করেন? এর ফলে কি বর্তমানের ওপরে তার প্রভাব পড়বেনা বা আরও খারাপ হলে বর্তমানে দুরূহ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবেনা? ধরুনতো আপনি যদি একশো বছর পিছিয়ে যান এবং আপনার প্রপিতামহকে তাঁর শিশুকালেই সাবাড় করে দেন তাহলে কি ঘটবে?'

'এইবারে কিন্তু আপনিই ফালতু বকছেন,' কিমতিলালের গলায় ঝাঁঝ। হরিদ্বারের অবধূতের প্রতি তার বিশ্বাস বেশ গভিরই ছিল। 'আমি শুধু আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি যে সেদিনের লিফটের ঘটনাটা আপনি কিভাবে কাজে লাগাচ্ছেন। সেটা না বলে আপনি ইতিহাস, প্রপিতামহ—এইসব নিয়ে সময় নষ্ট করছেন।'

গজাননরাও বেশ বিস্মিত হয়েই বললেন, 'এখনও বোঝেননি? সেদিন কয়েকটি সংখ্যা ঐ লিফটের বোতামে পরপর টেপার জন্য আপনি অতীতে চলে গিয়েছিলেন।'

'কি করে হবে? আমরা তো সেই বাণিজ্য ভবনের বাড়িটার ভেতরেই ছিলাম। তাও তো একবারে ভূতের মত।'

'সে কথায় আমি আসছি। লিফটটা আমাদের কয়েক বছর নয়, মাত্র তিন দিন পেছনে নিয়ে যাচ্ছিল। আপনার মনে আছে কিনা জানিনা, আমরা যখন ছায়ার মত হয়ে লিফট থেকে বেরিয়ে এলাম, আমি এক ভদ্রলোকের ঘড়িতে সময় দেখেছিলাম। সেই সঙ্গে বার ও তারিখও ছিল। সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম যে আমরা অতীতে চলে গেছি এবং আমাদের ঐ ছায়ার মত অবস্থা কেন হয়েছে? কালভ্রমণ সম্ভবপর। প্রকৃতি আমাদের অতীতে যেতে দেয় কিন্তু সেখানে যে কড়া নিয়মটি রয়েছে সেটি হল অতীতে হস্তক্ষেপ করা চলেনা। অতীতের মানুষ ও ঘটনাবলীকে কোনোভাবেই আমাদের প্রভাবিত করা উচিত নয়। এই কারণেই আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম, সকলের কথাও শুনতে পাচ্ছিলাম কিন্তু তাদের কাছে আমাদের কোনো অস্তিত্ব ছিলনা। আপনারা কি বলেন না যে 'বীৎ গয়ে সো বীৎ গয়ে' (যা ঘটে গেছে তা ঘটে গেছে)। এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ইতিহাস একটাই এবং তার অনন্যতাও অলঙ্ঘনীয়।'

ইতিহাসের অনন্যতা এবং তা রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা—কোনোটিই কিমতিলালের মনে বেশি ধরেনি। 'আপনি কি বলতে চান যে ভূত হয়ে তিনদিন পেছিয়ে গিয়ে আপনি ঐ সব দলিল ও নথির ফটো তুলে এনে দিনকরকে দিচ্ছেন?'

'অবশ্যই। ইতিহাসের ছবি তোলার বিরুদ্ধে কোনো সূত্র নেই। তিনদিন আগের ঘটনা যখন আপনার সামনে পুনরায় ঘটে তখন আপনি তার ছবি তুলতে পারেন, দরকার হলে শব্দও রেকর্ড করে নিতে পারেন। ব্যাপারটা ভিডিও দেখার মতই সহজ। ভিডিওটা ত্রিমাত্রিক এবং তিন দিন আগে তোলা। কাজটা হয়ে গেলে আমি ফিরে এসে লিফটে উঠি, উল্টো নির্দেশ দিই এবং বর্তমানে ফিরে আসি।'

কিমতিলাল শিহরিত হয়ে উঠল! জুয়ায় জেতার এক সুবর্ণসুযোগের কথা ভেবে। 'তাহলে লিফটের বোতামগুলো টিপে আপনি তিন দিন আগেও চলে যেতে পারেন।' কি অভিনব কাকতালীয় যোগাযোগ। জানা গেল তো গেল, তো আজ! ঘড়ি দেখল কিমতিলাল। ঘোড়দৌড় ফাইনালের আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি! 'আমি তাহলে চলি. মশাই। এক্ষুণি যেতে হবে আমাকে। কিছু জরুরী কাজ পড়ে আছে।'

গজাননরাও আশঙ্কিত বোধ করেন, 'কোথায় চললেন আপনি? অতীতে ও ভবিষ্যতে যাওয়াটা কিন্তু মোটেই এক ব্যাপার নয়। বর্তমান বাস্তবতার সামনে রয়েছে অসীম সংখ্যক সম্ভাবনা যার প্রতিটি এক এক ভিন্ন ভবিষ্যতের...'

কিমতিলালের আর এসব ব্যাখ্যার কোনো উৎসাহ ছিলনা। অন্তত মা লক্ষ্মী যখন তার ওপর কৃপা বর্ষণের জন্য উপড়হস্ত হয়ে রয়েছেন। 'সে ঠিক আছে। আমাকে এখন যেতেই হবে। আবার দেখা হবে।' কিমতিলালের হৃদয়ে তখন উত্তাল আনন্দের হিল্লোল। কিন্তু বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে থাকা গজাননরাওকে দেখে কিমতিলালের একটু কৃপাই হল। 'আমাদের একটা কথা আছে জানেন তো? দেনেওয়ালা দেতা হায় তো ছপ্পড় ফাড়কে দেতা হায়' (ঈশ্বর যখন দেন তখন একেবারে উপুড়হস্ত হয়ে দেন)। আজ, তাঁর নজর পড়েছে আমার ছাদের ওপর...বুঝতে পারছেন কি বলছি, পারছেন না? কি করেই বা বুঝবেন। রেসের মাঠে বাজির টাকা জমে যাওয়া কাকে বলে জানেন? কখনও জ্যাকপট জেতার স্বপ্ন দেখেছেন? ওফ! জীবনটা যে কি সেটা কবে যে আপনার মত লোকেরা জানতে শিখবে?'

গজাননরাও কিছু বুঝে ওঠার আগেই কিমতিলাল উধাও হয়ে গিয়েছিল কারণ তাঁর মন তখনও কাল এবং প্রাকৃতিক সূত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাস নিয়ে মগ্ন হয়েছিল। ব্যক্তির টাকা জমে যাওয়া? জ্যাকপট? এ বিষয়ে আজকেই কি

যেন পড়লাম! 'দা ইণ্ডিয়া ক্রনিকল'-এর প্রথম পাতাতেই ছিল। গত তিনটে ঘোড়দৌড়ের ফল কারো সঙ্গে মেলেনি। শেষ দৌড়ে জ্যাকপটের টাকা তাই অনেক জমে গেছে। শেষ দৌড়ে যার ঘোড়া পরপর মিলে যাবে সে এক কোটিরও বেশি টাকা পাবে। ভারতে ঘোড়দৌড়ের ইতিহাসে এমন কখনও ঘটেনি। এবং সেই দৌড়ের আর চার ঘণ্টা বাকি।

'কিমতিলাল!' গজাননরাও দৌড়ে বেরিয়ে এলেন। কিমতিলালকে কোথাও দেখতে পেলেন না।

হাতের কাছে প্রথম ট্যাক্সিটাই ধরলেন গজাননরাও। 'জলদি! ইন্দ্রপ্রস্থ রোড চলুন। তাড়াতাড়ি করুন। একজন লোক আত্মহত্যা করতে গেছে। বুঝলেন, আত্মঘাতী হতে চায়। এটা জীবন-মরণ কাণ্ড। ট্রাফিক আইন-টাইনে গুলি মারুন, চালান! জলদি!'

কিমতিলাল দৌড়ে একতলায় ঢুকল। ফাঁকা লিফটা দাঁড়িয়ে। তারই জন্য অপেক্ষামান। কি সৌভাগ্য! এ তো আর যে সে লিফট নয়, এ হল সোনার খনি! ঐ মাদ্রাজীটা একেবারে বোকার হদ্দ। ও কোনোদিনও টাকার মূল্য বুঝবেনা। দৌড়ে লিফটে ঢুকে কিমতিলাল কাঁপতে থাকা আঙুলে বোতামগুলো টিপতে শুরু করল। প্রথমে দরজা খুলে রাখার বোতামটা। ভাগ্যে সেদিন সংখ্যাগুলো পরপর মনে রেখেছিলাম : 13—বোকাটা সংখ্যাতীত ভবিষ্যৎ নিয়ে কি যে সব করছিল...11—অতীত। বর্তমান। ভবিষ্যৎ। সবই বিধাতার লিখন। যা কিছুই ঘটে সবই ভাগ্যফল অনুযায়ী...7...ফালতু কথা না তো কি? পরমারাধ্য অবধূতের যৌগিত বিভূতি সম্বন্ধে ওসব বলার কি অধিকার ওর আছে...5—আরে বাবা, ভাগ্যবান মানে যারা আগাম জানতে পারে। মা লক্ষ্মী তাদেরই বেছে বেছে...3—এক কোটি টাকার জ্যাকপট! একটা বোতাম টিপলেই। গজাননরাও ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছলেন।

মৃত কিমতিলালের দেহটা লিফটের মেঝেতে চকিতে থ্যাঁতলানো মাংসপিণ্ডে পরিণত হল এবং সহস্র অভিকর্ষের টানে ভয়ানক ত্বরান্বিত গতিতে লিফটটি হল ঊর্দ্ধমুখে ধাবমান। চোখের নিমেষে একটি করে তলা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধগতির ত্বরনও বাড়ছিল। প্রচণ্ড গতিতে অট্টালিকাটির ছাদ চূর্ণ করে, কংক্রিটের মধ্যে একটি নিটোল গর্তের সৃষ্টি করে লিফটটি পৃথিবীর প্রভাব সীমা কাটিয়ে, স্ফীতমান মহাবিশ্বের ওপারে তার অনন্তযাত্রায় উধাও হয়ে গেল।

গজাননরাও-এর যে বিবৃতিটি 'দ্য ইণ্ডিয়া ক্রনিকল'-এ প্রকাশিত হয় তার শেষাংশ :

তন্নিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য লিফটটির খবর না জানিয়ে একে নিজের ঐ খেলায় ব্যবহার করার জন্য এখন অনুশোচনা করে লাভ নেই। আমার অনিচ্ছার প্রথম কারণ হল লিফটটির আশ্চর্য গুণাগুণ প্রকাশ পেয়ে গেলে আমি জনপ্রিয়তা লাভ করব ঠিকই কিন্তু এটিকে ব্যবহারের সুযোগ থেকেও আমি বঞ্চিত হব। সত্যকে চাপা দেবার চেষ্টা যতই সুচারুরূপে করা হোক না কেন, তা প্রকাশ করে দেবার ক্ষমতার বশে অত্যুৎসাহী হয়ে আমি লিফটটিকে আমার ব্যক্তিগত সম্পদ বলে মনে করতে শুরু করেছিলাম। আমি স্থির করেছিলাম যে জনসাধারণের কল্যাণে এর ব্যবহার সম্পূর্ণ হলে লিফটটিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য দিয়ে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়ত, যে আশ্চর্য শক্তিসমূহ ঐ লিফটকে বাণিজ্য ভবনের এক তলা থেকে আর এক তলায় নিয়ে যাওয়ার যতই সাবলীলভাবে অতীত থেকে বর্তমানে নিয়ে যেতে পারে তার স্বভাবপ্রকৃতি সম্বন্ধে ক্ষীণতম কিছুও আমি বুঝে উঠতে পারিনি। বোধগম্যতার বাইরে যে ঘটনা তার ওপরে গবেষণা কিভাবে সম্ভব? কিছুটা ছেলেমানুষের মতই আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুধু ব্যর্থই হবেনা, এর ফলে অজানা বিপদও দেখা দিতে পারে।

আমার মনে প্রধান ভয় ছিল এই যে কোনো ভুল নির্দেশের ফলে যদি ভবিষ্যতেও যাত্রা সম্ভবপর হয়। ইতিপূর্বেই আমি ব্যাখ্যা করে বলেছি যে অতীতে পরিদর্শনের জন্য কিভাবে আমাকে সত্তাবিহীন হতে হত। লক্ষ্য ছিল তার অনন্যতা রক্ষা রাখা। কিন্তু ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে কি হবে? সেও কি অনন্য? সর্বব্যাপী ও অজ্ঞেয় এক স্রষ্টা কি তা নির্ধারণ করে রেখেছেন? বিজ্ঞানের যুক্তিবত্তার কথা বাদ দিলেও, এমনকি ধর্মতত্ত্বও এক নিয়তিচালিত বিশ্বের সংজ্ঞা যথার্থ বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। বর্তমানের সামনে রয়েছে অনন্ত সংখ্যক ভবিষ্যৎ। প্রতি মুহূর্তে তার একটিকে কাল যথেচ্ছভাবে বেছে নেয় এবং মহাবিশ্ব চলতে থাকে।

'কিন্তু, এবং এই কিন্তু-টি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—যতক্ষণ না ঐ বাছাই করা হয় ততক্ষণ কোনো ভবিষ্যৎ সত্তা পরিগ্রহ করতে পারে না বা বাস্তবতার অংশ হয়ে উঠতে পারে না।'

'কিমতিলালের মনের গভীরে নিহিত ছিল ভাগ্য ও তার স্রষ্টা সম্বন্ধে পরম্পরাগত ভুল ধারণা। ভবিষ্যতের অনস্তিত্ব উপলব্ধি করার ক্ষমতা তার ছিলনা। অতীত থেকে বর্তমানের মধ্যেই ভবিষ্যৎমুখী ধরনের কালভ্রমণ সীমাবদ্ধ। এখনও যা ঘটেনি সেই ভবিষ্যতে গেলে আমাদের এই বাস্তবতার যে বিন্যাস বাবস্থা শূন্যতা ও সময় গড়ে তুলেছে তার মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ভ্রান্তি ও লোভের শিকার হয়ে কিমতিলাল প্রকৃতির চিরাচরিত নিয়ম এবং ঐ লিফটের পেছনে যে আশ্চর্য চালিকা শক্তি ছিল তার মধ্যে এক সংঘাতের সৃষ্টি করে। নিজের প্রাণ দিয়ে এর জন্য কিমতিলালকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হল। একই সঙ্গে কালের গতিময়তা নিয়ে গবেষণার এক অসামান্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল সমগ্র মানবজাতি।'

ঈশ্বরের মুখোমুখি

দেবব্রত দাস

2085 খ্রীষ্টাব্দে সারা দুনিয়া জুড়ে একের পর এক আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রায় অলৌকিক উদ্ভাবনের সাফল্য মানুষকে বিমোহিত করে তুলেছিল। একশ বছর আগেও কেউ চিন্তা করতে পারেনি যে বিজ্ঞান এত দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে...

আমি কিন্তু আমাদের সেই সাবেকি বেনারসী পানের দোকানের ব্যবসা নিয়েই মগ্ন ছিলাম। আমার ছোট্ট দোকানের সামনে 'পান'-আসক্তদের নিত্য ভিড় দেখলে সহজেই বোঝা যেত যে আমার ব্যবসা চুটিয়ে চলছে। আয়না-আঁটা ঝকমকে দোকানে, নরম গদির ওপর আরামে গ্যাঁট হয়ে বসে পান সাজার কাজ আমিই করতাম। সহযোগী কোনো লোক বা রোবট (ফাঁকিবাজির জন্য এরা কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল)—এদের বিশ্বস্ততায় আমার ঘোর সন্দেহ ছিল।

আমার দোকানের বাঁদিকে ছিল বিশাল এক গবেষণাগার ও ডান দিকে শিব ঠাকুরের মন্দির—একদিকে বিজ্ঞানের মন্দির, আর একদিকে ভগবানের মন্দির—এর মধ্যেই অসহায়, বিস্মিত ও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আমার ছোট্ট পানের দোকান।

বিশাল ঐ গবেষণাগারের প্রধান ছিলেন ছোটখাট এক মানুষ; অধ্যাপক চক্র। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের এক মহা-পুরোহিত। এক বিস্ময়কর স্রষ্টা। জীবদেহ ব্যবস্থার সেই মোটা দাগের জীবনরসায়ন ও জীবপদার্থবিদ্যা থেকে শুরু করে জটিল ও সূক্ষ্ম জিনতত্ত্ব ও আনব জীববিদ্যা—জীববিজ্ঞানের গোটা ক্ষেত্রটি জুড়েই ছড়িয়ে রয়েছে অধ্যাপক চক্রের অগুণতি আবিষ্কার। 'চক্রমাইসিন' নামক অ্যান্টিবায়োটিকের স্রষ্টা তিনিই যার সাহায্যে ক্যানসারবাহী জিনগুলির অভিব্যাক্তি পরিবর্ত্তিত করা যায়। ক্যানসারের প্রতিষেধক হিসেবে এটিই হল প্রধান অস্ত্র—ব্যাপকভাবে ক্যানসার-বিরোধী টিকা হিসেবে চক্রমাইসিন ব্যবহৃত হয়। নির্দিষ্ট আয়োনীয় পরিমণ্ডলের মধ্যস্থিত নির্দিষ্ট ক্ষারক ক্রমের আর. এন. এ.-র দ্বারা তিনি অধিকাংশ এনজাইম প্রোটিনের কাজ করিয়েছেন। এই পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি

দেখিয়েছেন যে প্রোটিনের আদিতম অস্তিত্বেরও পূর্বে সুপ্রাচীন কোষগুলিতে RNA গুলিই এনজাইমের কাজ করত। অনুঘটনের সময় সাবস্ট্রেটের বিশেষত্ব নিরুপণে আর. এন. এ.-র ক্ষারক ক্রমের ভূমিকাই ছিল প্রধান। এর ফলে মুরগি আগে না ডিম আগে—এই বহুবিতর্কিত প্রশ্নটির উত্তর চিরতরে স্থির হয়ে গিয়েছিল। তাঁর প্রিয় কুকুর ডারউইন যখন মারা গেল তখন তিনি আর একটি কুকুর এনে সংক্ষিপ্ত একটি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মৃত কুকুরটির স্মৃতির সঙ্গে জড়িত আর. এন. এ.-গুলি নতুন কুকুরের মস্তিষ্কে সংস্থাপিত করলেন। পরের দিন থেকে ডারউইন-2 তার পূর্বসূরীর মতই আচরণ শুরু করে দিল। (আমার সঙ্গে ডারউইন-2 এর প্রথম দেখার সময় ঘেউ ঘেউ করে ওঠার বদলে যে বন্ধুত্বময় পরিচিতির প্রমাণ দিয়ে সে লেজ নেড়েছিল)!

অধ্যাপক চক্রের ভাবনাচিন্তা ও অভিমত জানার জন্য জীবরসায়নবিদ্যার বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীরা তাঁর কাছে নিয়মিত আসতেন যাঁদের মধ্যে ছিলেন রাশিয়ার নিকোলাই ভ্লাদিমির, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন ড্রেক, জাপানের ইকাতো কিওতিওয়া, গ্রিসের ত. পাপায়ান্নোপুলু ও জার্মানির শুলতং বুমার্ট। অধ্যাপক চক্র ছিলেন এক ছন্নছাড়া কর্মপ্রাণ মানুষ, দিনরাত তাঁর মাথায় ঘুরত জীববিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে চিন্তা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত, হয় তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত নতুবা পর্বতপ্রমাণ বই ও গবেষণাপত্রের মধ্যে ডুবে আছেন। গবেষণাগারের বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। হয়তো তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন যে একদা তাঁর একজন স্ত্রী ছিলেন এবং বর্তমানে তাঁর এক পুত্রও সশরীরে বিদ্যমান।

কখনও কখনও অবশ্য অধ্যাপক চক্র তাঁর গবেষণাগারের বন্দীদশা থেকে বাইরের ছোট গলিটাতে এসে দাঁড়াতেন। সেই দুর্লভ দর্শনের সময় আমি তাঁকে নমস্কার জানাতাম, মনে যে বিষয়ই আসত তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করতাম যদিও তিনি ছিলেন যথেষ্ট মিতভাষী।

'ঈশ্বর' নিয়ে কথা উঠলেই অধ্যাপক চক্র ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতেন। যখনই এই নিরীশ্বর অধ্যাপকের সঙ্গে নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধি নিয়ে আমি যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করতাম তিনি ধমকে বলতেন, বিজ্ঞানের সামনে ধর্ম এনে দাঁড় করাচ্ছো, বড় আস্পর্দ্ধা তো তোমার। আলোর সামনে কি অন্ধকার থাকতে পারে? যুক্তিবুদ্ধি ও কল্পনার সহাবস্থান কখনও হয়? যত্তোসব বোকা বোকা আচার—গঙ্গায় স্নান করছে, মক্কায় তীর্থ করতে যাচ্ছে, শুনলেও হাসি পায়!'

উত্তেজিত অধ্যাপক যখন আরও চোখা চোখা শব্দ খুঁজতেন সেই সুযোগে আমিও বলে যেতাম, 'আপনার কিন্তু ধর্মের সঙ্গে ঐতিহ্যগত মৌলবাদ বা গেরুয়াধারী

ভণ্ডামি গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। যুক্তিবাদের পরেও যে যুক্তিবাদ রয়েছে তাই হল ধর্মের ভিত্তি। মনের শুদ্ধতা ও জীবনের সব মহৎ গুণ নিয়ে ধর্মের কারবার। জানবেন যে বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা বিরোধী নয়। উভয়েরই লক্ষ্য হল সত্য—পরম সত্য। 'কিভাবে' প্রশ্নটির উত্তর খোঁজে বিজ্ঞান ও 'কেন' প্রশ্নটির উত্তর দেয় ধর্ম।'

আমি যতই উদ্যমে চেষ্টা করতাম না কেন অধ্যাপককে বিশ্বাস করাতে পারিনি। 'জানবে যে ধর্ম হল তোমার দুর্বলতা ও খামতিগুলো ঢেকে রাখার একটা ছদ্মবেশ মাত্র।' যেদিন অধ্যাপক চক্র ভীমরতিগ্রস্থতা প্রতিষেধের তত্ত্বটি প্রকাশ করেন সেদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'জেনে রাখ, মৃত্যুই যদি তোমার ঐ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হয় তাহলে তাকে আমি আমার গবেষণাগারের রাসায়নিক দ্রব্য রাখার বোতল ও টেস্টটিউব দিয়েই খতম করে ছাড়ব।'

পঞ্চমবার নোবেল পুরস্কার লাভ করে বিমানযোগে ভারতে ফিরে আসার পথে একটা ব্যাপার ঘটেছিল। সম্ভবত একটি হাউণ্ড কুক্কুরীর তার সারমেয় শিশুদের দুধ খাওয়ানোর ছবি দেখে অধ্যাপক চক্র বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁর মস্তিষ্কের কোনো অনাবিষ্কৃত অংশ, যা বহুবছর ধরে গভীর নিদ্রামগ্ন ছিল, সহসা পুরোদস্তুর সক্রিয় হয়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিজাগনিয়া পোপটাইত্তেরও স্মরণ শুরু হয়ে গেল। ক্রমে, অধ্যাপক চক্রের মন এই ব্যাপারটির সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল যে তিনি শুধু একজন বিজ্ঞানীই নন, একজন পিতাও বটে। কয়েক ঘণ্টা পরেই আমি দেখলাম যে কপালে দুশ্চিন্তাজনিত বলিরেখা নিয়ে সেই মহান প্রতিভা আমার দোকানের দিকেই আসছেন। 'শোনো...ছোকরা...আচ্ছা তুমি কি বলতে পার যে কখনও আমার স্ত্রী ও এক ছেলে ছিল কিনা?'

আমি তো হতবাক। কি আজব কাণ্ড! থতমত খেয়ে বললাম, 'অবশ্যই, ছিল...মানে অবশ্যই ছিল।'

অধ্যাপক কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। নিজে নিজে বিড়বিড় করছিলেন, 'চূড়ান্ত অবহেলা করার অপরাধে আমি দোষী। হায়রে...কি দুঃখজনক...কি কষ্টের ব্যাপার!...একটা পোষা কুকুরও ছিল, আর...আর ছিল...'

'কিন্তু অধ্যাপক, আপনার স্ত্রী আর বেঁচে নেই। বেশ কয়েক বছর হল তিনি গত হয়েছেন।' তাঁর চোখে বিষাদের চিহ্ন। কিন্তু যে দিন তাঁর স্ত্রী মারা যাচ্ছিলেন সে দিনের কথা আমি কখনও ভুলবনা। অধ্যাপক চক্রকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে আমি গবেষণাগারে এসেছিলাম। কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম যে বরাবরের মতই তিনি বেপরোয়া ও ভাবলেশহীন। পরীক্ষায় তিনি তখন এমনই ব্যস্ত যে বাড়ি যাওয়ার নাকি প্রশ্নই ওঠেনা।

'তবে আপনি বাড়িতে আপনার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। সে এখন পুরোদস্তুর যুবক। দেখলে আপনার খুব ভাল লাগবে।'

'বাড়ি?' মানে বোঝার জন্য যেন অধ্যাপক শব্দটি উচ্চারণ করছিলেন। ঐ জায়গা...মানে বাড়িতে...ছেলের সঙ্গে দেখা করতে কি হবেই? আচ্ছা, দয়া করে তুমি আমাকে নিয়ে যাবে?'

পরের দিন সন্ধ্যায় পিতা-পুত্রে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলাম। চাকায় ঘষটানোর শব্দ করে আমাদের গাড়ি এক বৃহৎ অট্টালিকার সামনে থামল। পুত্রই দরজা খুলে দিল। সুবেশ এক অনুপম যুবক। হাসি হাসি মুখ, প্রাণবন্ত, বুদ্ধিদীপ্ত। দীর্ঘ বাইশ বছরের ব্যবধানের পর অধ্যাপক পুত্রকে দেখলেন। সদ্যজাগ্রত বাৎসল্য রসে আপ্লুত অধ্যাপক আনাড়ি আলিঙ্গনে পুত্রকে বদ্ধ করলেন। এই সময়েই, সহসা তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল যে একটি পরীক্ষা তিনি অসমাপ্ত রেখে এসেছেন!

'ফিরে যাওয়ার আগে পুত্রের প্রতি কর্তব্য আমাকে সম্পূর্ণ করতে হবে।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দায়িত্ব তো পিতারই, তাই নয় কি? বলো তো দেখি ওর জন্যে আমি কি করতে পারি?'

আমি ইতস্তত করছিলাম। একটু ফাঁপরেই পড়ে গিয়েছিলাম। ছেলের টাকাপয়সার কোনো অভাব নেই। শিক্ষাগত ভবিষ্যৎও তার উজ্জ্বল। কিন্তু সে একা থাকে। আমি বললাম যে অধ্যাপকের উচিত হবে বিয়ে দিয়ে ছেলেকে সুখী করা।

'বেশ কথা কিন্তু তার জন্য তো মনে হয় একটি মেয়ে আবশ্যক হবে। দয়া করে একটি ভাল মেয়ে যোগাড় করে ফেল। বিনা বিলম্বেই শুভকাজটি সম্পন্ন হয়ে যাক।'

'কিন্তু বাবা, আমি কবিতাকে ভালবাসি। ওকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। যদি বিয়ে করতেই হয় তাহলে ওকেই করব,' ছেলের কণ্ঠে আবেদন।

'তাহলে করছনা কেন? ওসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে উত্তেজিত হবার কোনো মানে হয় না। মেয়েটাকে নিয়ে এস এবং ঝটপট বিয়েটা সেরে ফেল দেখি।'

আমি নরমসুরে বললাম, 'মেয়েটা মানে ঐ কবিতার পরিচয় কি?'

'কবিতা হল অধ্যাপক সোম-এর মেয়ে!'

সোম-এর নাম শুনেই অধ্যাপক চক্র অস্বস্তিবোধ করতে শুরু করলেন। 'বলো কি, জানো যে অধ্যাপক সোম-এর সব তত্ত্বই হল একের পর এক গুবলেট। হরমোন ক্ষরণের ত্যানব প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁর প্রকল্পে বলা হয়েছিল যে কোষ নিয়ন্ত্রণে চক্রাকৃতি এ. এম. পি. হচ্ছে স্বাধীন ও প্রধান মধ্যস্থতাকারী। কিন্তু আমি

যখন হাতেনাতে দেখিয়ে দিলাম যে কোষের মধ্যে চক্রাকৃতি এ. এম. পি. ক্যালমোডুলিন ও ফসফ্যাটিডিল ইনোসিটল ফসফেট—নির্ভর সি কাইনেজের মধ্যে সুষম দেহহত পরস্পর নির্ভরতা বিদ্যমান তখন সোম-এর প্রকল্প যে ডাহা ভুল সেটা প্রমাণিত হয়ে গেল। ভীমরতির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁর তত্ত্বটিও ধেড়িয়ে পড়েছে। ভীমরতি নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠিটি যে জিনের স্তরে নিহিত সেটা অনেক ভালভাবে আমি দেখাতে পারি। 'ভীমরতি বিরোধী টিকা' তৈরীর জন্য আমি যে চেষ্টা করছি তার ভিত্তিতে যে তত্ত্বটি রয়েছে তা হল ডি. এন. এ.-র স্বাভাবিক যে 'বি' ধরণ আছে তার থেকে ধীরে 'এস' রূপে পরিবর্তন—এই পরিবর্তনই দেহে বার্ধক্য নিয়ে আসে। যে লোকের মাথা ভর্তি অত ভুল ধারণা তার মেয়ে উত্তরাধিকার হিসেবে ভাল কিছুই পেতে পারে না। আমি চাই যে আমার ছেলে যে মেয়েকে বিয়ে করবে তাকে নিখুঁত হতে হবে। না! কবিতা কখনোই আমার ছেলের উপযুক্ত পাত্রী নয়।' অধ্যাপক চক্র দৃঢ়ভাবে তাঁর মতামত জানিয়ে তাঁর গবেষণাগারে ফিরে গেলেন।

ভিডিও ফোনের কর্কশ শব্দে আমার মুখের দিবানিদ্রাটির দফারফা হল। বিস্মিত হয়ে দেখলাম পর্দায় অধ্যাপক চক্রের মুখ। ছেলের কথা তাঁর আবার মনে পড়েছে। দেখা করার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হয়েছেন আবার। অর্থাৎ তাঁর মস্তিষ্কের কোনো নিভৃত কোণে পুনরায় স্নেহ জাগ্রত হয়েছে।

কিন্তু তুমুলভাবে বিচলিত হতে হল আমাদের। এবারে শোকে মুহ্যমান যে যুবকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হল কার সাধ্য তাকে সান্ত্বনা দেবে। কোথায় সেই আনন্দিত মুখশ্রী, নায়কোচিত ভাব, প্রোজ্জ্বল আশাবাদ! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেক কান্নাকাটির পর সে কোনোমতে জানাল যে তার প্রিয়তমা কবিতা আর ইহজগতে নেই। কবিতা আর বিচ্ছিন্ন থাকার বেদনা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে? অতএব এই অপার বিশ্বে যুবকটি এখন বান্ধববিহীন ও একা।

এই কথা শুনে আমার বক্ষ বিদীর্ণ হল। অধ্যাপকও শোকাহত। কিছুক্ষণ আমতা আমতা করার পর শেষে তিনি বললেন যে কবিতার চেয়েও হাজার গুণে বেশি সুন্দরী তিনি সৃষ্টি করবেন। বুদ্ধিশুদ্ধিও তার বেশি হবে। পুত্রকে তিনি পুনরায় সুখী করে তুলবেন!

পরের দিন আমি গবেষণাগারে গিয়ে দেখি 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রক্ষিত এক ঘরে নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে অধ্যাপক নাড়াচাড়া করছেন। তারপর একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে তিনি বলতে লাগলেন আপনমনে, 'ডিম্বানু—এই হল বিচ্ছিন্ন একটি ডিম্বানু...এদিকে মানুষের জেনোমের যৌগত্ত প্রস্তুত করেছি এক্স-ওয়াই...আরে দুর! এক্স-এক্স হবে তো...ইনি তো একজন মহিলা, তাই নয়কি? আরে বাবা, এখানে সব সেরা জিন জড়ো করেছি। আর...আর, 'অনুবীক্ষণে কিছু দেখতে দেখতে তিনি বিভোর হয়ে গেলেন, মুখে কথা নেই, আমিও ধীরে ধীরে, বিমূঢ়, বিব্রত অবস্থায় সেখান থেকে সরে পড়লাম। পরের দিন ওখানে গিয়ে দেখি সুন্দর একটা ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে দোলনায় দোল খাচ্ছে। আমি তো তাজ্জব বনে গেলাম। অধ্যাপক চক্র দেখি ঘরের এক কোণে। তাঁর দিকে এগোতে এগোতে বোকার মতই প্রশ্ন করে ফেলেছিলাম। ওকে পেলেন কোথায়? এত সুন্দর মেয়ে কক্ষনো দেখিনি। ওর মা কোথায়? 'আমার গলার স্বরটা ক্রমেই চড়া হতে হতে সরু হয়ে উঠছিল। হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মত কথাটা মাথায় খেলে গেল, 'এই শিশুটিকে নিয়ে আপনি কি করবেন? এও কি...এটাও কি, মানে আপনার ঐ কি...বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত কিছু? আমি বলতে চাইছি, কোনো পরীক্ষা?'

অধ্যাপকের মুখে রহস্যময় হাসি ও মুহূর্তের নীরবতা। 'হ্যাঁ, এটা বিজ্ঞান, এটা একটা পরীক্ষা। কিন্তু এটা জীবনও বটে। আমি জীবন নিয়ে পরীক্ষা করছি।'

'কিন্তু কিভাবে? কাকে নিয়ে? ঐ...ঐ শিশুটিকে নিয়ে?'

'ও হল আমার পুত্রবধূ, আমার ছেলের পাত্রী।'

'আপনার...আপনার, কী?'

অধ্যাপক চক্র হাসলেন। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার দেখলাম হাসির আদলে তাঁর ঠোঁটটি ফাঁক হল। আমার কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল। অধ্যাপক বললেন, 'ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি যদিও কথা বলার সময় আমার বড়ই কম। মেয়েটি হল আমার পুত্রবধূ। কিন্তু ওর অস্তিত্ব কোনো ঈশ্বর নির্ধারণ করেননি। আমিই ওর স্রষ্টা, বুঝতে পেরেছ? কিভাবে করেছি শুনবে?

'যে নারী কোষটি নতুন কোষ সৃষ্টি করতে পারে সেই একটি ডিম্বানু দিয়েই সূত্রপাত। আমি কোষের কেন্দ্রটি সরিয়ে ফেলে তার জায়গায় বাছাই করা জিন সম্বলিত একটি ডিপলয়েড কেন্দ্র বসাই। পুত্রবধূকে আমার অসামান্য রূপসী, বুদ্ধিমান ও অসাধারণ করে বানাতে হবে, তাই নয় কি? ছেলেকে আমার আবার খুশি করে তুলতে হবে। যাতে চিরতরে সে সুখী হতে পারে। এই জন্য রিকমবিন্যান্ট DNA টেকনোলজি কাজে লাগিয়ে আমি জিনের সম্ভাব্য সেরা সমাহারটি বসাই—রং

হবে ফরসা, লম্বা কালো চুল, সুন্দর চোখ, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার গবেষণাগারে বাছাই করা জিনের এক সংগ্রহশালা রয়েছে। তার থেকে জিন নিয়েই আমি একটি নারী তৈরী করে ফেললাম। এরপর ঐ নির্মিত কোষটিকে আমি পুষ্টিদায়ক দ্রবণের মধ্যে রাখলাম যাতে শীঘ্র একটি ভ্রূণ প্রস্তুত হয়। তারপর একে আমি উপযুক্ত ভৌত ও রাসায়নিক পরিবেশে স্থাপন করলাম। তুমি যদি চাও তাহলে এই কক্ষটিকে তুমি কৃত্রিম জরায়ু বলে অভিহিত করতে পার। ভ্রূণটি ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে মানবদেহের রূপ নিল এবং গত রাতে আমি তাকে ঐ কক্ষ থেকে বের করলাম। বলতে পারো যে প্রসব করালাম...হাঃ...হাঃ...', অধ্যাপক জোরে জোরে হাসতে লাগলেন যা তিনি কখনোই করেন না। আমিও হাসার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আমার গলা এত শুকিয়ে গিয়েছিল যে হাসতে পারলাম না..।

'কিন্তু...কি কাণ্ড! মানে, ঐ মেয়েটা নিশ্চয়ই গত রাতে জন্মায়নি। ওকে দেখে তো দুবছরের কম বয়সী বলে মনেই হচ্ছেনা', আমার কথা আটকে যাচ্ছিল।

অধ্যাপক আবার অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন যার ফলে আমার অস্বস্তিটা বেড়ে গেল। 'আমি সময়টা সঙ্কুচিত করে ফেলেছি, বুঝলে? দাঁড়াও, আর একটু খুলে বলি। মানবদেহে কতকগুলি বিকাশের সহায়ক পেপটাইড স্বাভাবিকভাবে ক্ষরিত হয়—যার মধ্যে কয়েকটা হল প্ল্যাটেলেট থেকে উদ্ভূত বিকাশের উপাদান (PDGF), ত্বকীয় বিকাশের উপাদান (EGF), 'বি' কোষ বিকাশের উপাদান (BCGF), আইটেরলিউকিন্স 1 ও 2, স্নায়বিক বিকাশের উপাদান (NGF) ইত্যাদি। দেহের বিভিন্ন স্তরে এরা সুসমঞ্জসভাবে কাজ করে এবং এদের ক্রিয়ার ফলে কোষের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে। এদের ক্রিয়ার ধরণটিও সদৃশ। রাসায়নিক দিক দিয়ে তারা প্রোটিনের টাইরোসিন এমিনো এসিডসমূহকে এবং সেই সঙ্গে কোষের ঝিল্লিতে ফসফ্যাটিডাইলিনোমিটল অবশেষ থাকে, তাকে ফসফেট শ্রেণী সরবরাহ করে। এই ভাবে তারা ক্রমান্বয়ে প্রতিক্রিয়া ঘটাতে থাকে যার ফলে কোষ বিভাজন হয়...আরে! তোমার মাথায় ঢুকছে না? ব্যাপারটা বড় কঠিন হয়ে যাচ্ছে বোধহয়,' অধ্যাপক চক্র একটু থামলেন। 'দাঁড়াও, আসল কথায় আসি। নানা জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিকাশের সহায়ক পেপটাইডগুলির সংশ্লেষণ ও সক্রিয়তা যে জিনগুলি নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলি হল অনকোজিনসমূহ। ক্যানসার রোগের ক্ষেত্রে অনকোজিনগুলির হাত থেকে লাগাম ছুটে যায়, তখন কোষের অনিয়ন্ত্রিত বিকাশ শুরু হয়। এখন ঐ অনকোজিনগুলির ক্ষারকে বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটিয়ে আমি তাদের ঘাড়ে ফের লাগাম চড়িয়েছি। তাই এখন আমার অঙ্গুলিহেলনে তারা ওঠবোস করতে বাধ্য। অতএব আমি এখন বিকাশের সহায়ক পেপটাইডগুলি

নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এবং তার ফলে দেহের সামগ্রিক বিকাশও নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

'জিনের স্তর থেকে আমার কাজ শুরু সেটা আশা করি বুঝতে পেরেছ। এ হল গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাবার মত। আমি বিকাশ বাড়াতে পারি আবার অনকোজিন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তা বন্ধও করতে পারি। পুতুল নাচের সুতোগুলো আমার হাতে। দশ ঘণ্টায় বা এমনকি দশ মিনিটেও আমি কোনো শিশুর বয়স এক বছর বাড়িয়ে দিতে পারি...হাঃ...হাঃ...অবশ্য এরও একটা সীমা রয়েছে যেমন একটি সীমা অবধি গাড়ির গতি নিরাপদ, তার ওপরে উঠলে ক্যানসার বা ঐ জাতীয় দুর্ঘটনা অবধারিতভাবে ঘটবে।'

অধ্যাপক চক্রের এই পরীক্ষা যদি সফল হয় তাহলে মানুষ সর্বশক্তিমান, চিরস্থায়ী ও ত্বরাট হবে, হয়ে উঠবে নিজের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রা—গোটা ব্যাপারটাই কেমন যেন অস্বস্তিকর। হয়তো প্রাণের সৃষ্টির পর সবচেয়ে যুগান্তকারী ঘটনার আমি সাক্ষী হতে চলেছি। দ্বিতীয় জন্ম বা আবির্ভাব...

'কিন্তু এর মধ্যে ঝুঁকি আছে। গণনার ভুল হতে পারে। বা পরীক্ষা বিভ্রাট। তাতে কি শিশুটির প্রাণের আশঙ্কা নেই?'

অধ্যাপক বললেন, 'বরং প্রতিটি ব্যর্থতার থেকে আমি কিছু শিখতে পারব। ভুলচুকগুলো এর ফলে ধরা পড়বে এবং সাফল্যের জন্য নতুন আশা নিয়ে আমি ফের কাজ শুরু করতে পারব। শেষ অবধি সফল আমি হবই!'

অধ্যাপক চক্র যখন তাঁর পরীক্ষার সাফল্য ও ব্যর্থতার বিষয়ে কথা বলছিলেন আমি তখন ঐ জীবন্ত মানবিক অবয়বগুলির ভাগ্য নিয়ে আশঙ্কিত হচ্ছিলাম। পরীক্ষাটি বিফল হলে এদের মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি ঘটানো সম্ভব। এমনকি তার জন্য প্রাণবন্ত নতুন নতুন মানুষের আকৃতির প্রাণী নির্মাণ করাও হবে...কিন্তু যারা পরীক্ষা চলার সময় 'মারা' যাবে তাদের কি হবে? নিজে যে জীবনের ছোট্ট শিখাটির তিনি সৃষ্টি করেছেন তাকে নিভিয়ে দেবার অধিকার কি তাঁর আছে? অধ্যাপক যদি সফল হয়ে ওঠেন তাহলে মানবিক, নৈতিক, লিখিত—সববিধ আইন আমূল পাল্টে নতুন করে লিখতে হবে। জিনতত্ত্বের নানাবিধ প্রয়োগ ও নয়া প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে মানুষের নিয়তি নতুন করে লেখার, পাল্টানোর বা তাকে মুছে ফেলার অধিকার কি বিজ্ঞানীদের দেওয়া উচিত?

পরের দিন গবেষণাগারে গেছি। হঠাৎ পেছন থেকে সুমিষ্ট কণ্ঠে কে যেন বলল, 'সুপ্রভাত, কাকু!' চমকে ফিরে তো আমি হতবাক। কি দৃশ্য! বিশ্বের সেরা সুন্দরী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। চোখ ঝলসে দেওয়া সেই রূপসীর বয়স সতের, আঠারো

হবে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে যে ছোট্ট মেয়েটা খলবল করে খেলা করছিল এই কি সে?

দেখলাম যে অধ্যাপকেরই জয় হয়েছে। সত্যিই গবেষণাগারে তিনি তাঁর পুত্রবধূকে নির্মাণ করেছেন। তিনি নিজের ছেলের ভাগ্য নিজে নতুন করে রচনা করেছেন। ঈশ্বর যে পরাজিত তার সাক্ষী আমি নিজে। স্বচক্ষে সেই পরাজয় আমাকে দেখতে হয়েছে...

অধ্যাপকের ছেলের কাছে যাওয়ার সময় আমি তাঁকে শেষ প্রশ্নটি করেছিলাম—সমগ্র পরীক্ষাটির সূত্রপাত একটি একক ডিম্বানু থেকে। ঐ বস্তুটি একেবারেই এই পরীক্ষাতে অপরিহার্য। কিন্তু তার জন্য দেখা যাচ্ছে যে মানুষকে প্রকৃতির ওপরেই নির্ভর করতে হচ্ছে। কেন?

অধ্যাপক এবারও আমায় ধরাশায়ী করে দিলেন, 'আমার বর্তমান পরীক্ষার ফলাফল যদি কোনো সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয় তা হল ভবিষ্যতে আমার ঐ ডিম্বানুরও প্রয়োজন হবে না। আমার শুধু লাগবে বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য। মানুষ কতগুলো রাসায়নিক দ্রব্যের সমাহার ছাড়া আর কিছুই নয়। নিষ্প্রাণ রসায়ন থেকে একটি জীবন্ত প্রাণরূপ তৈরি করতে তোমার কোনো ঐশ্বরিক কৃপার দরকার নেই। আমি কিছু প্রাণহীণ রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে জীবনসুধা দিয়ে দেব এবং একটি কোষের জন্ম হবে—মনুষ্য-নির্মিত জীবকোষ...'

হতবাক পুত্রের হাতে অধ্যাপক চক্র তাঁর 'নলজাতিকা পুত্রবধূ'কে তুলে দিলেন। আদর করে তিনি ছেলের বউ-এর নাম রেখেছিলেন X-85। 'X' হল তাঁর জিন সংগ্রহশালার সাঙ্কেতিক সংখ্যা এবং '85' হল 2085 খ্রীষ্টাব্দের প্রতীক। পুত্র ও পুত্রবধূর সুখী জীবন কামনা করে তিনি গবেষণাগারে ফিরে গেলেন।

কয়েক মাস পরে আবার তাঁর ছেলের কথা মনে পড়ল। দুজনকেই তিনি দেখতে চাইলেন। যথারীতি তাঁর সঙ্গে আমিও ছিলাম।

কিন্তু দেখা গেল অবস্থা মোটেই ভাল নয়। যে যুবকটি আমাদের দরজা খুলে দিল তাকে দেখে মনে হল যেন এক হাঘরে ভবঘুরে—গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি,

চোখের কোণে কালি ভরা, স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। এ কি কাণ্ড? যে 'X-85' হল মানবজাতির এতাবৎ পাওয়া সেরা উপহার, সে কি একটি খোকাকেও সুখী করতে ব্যর্থ হয়েছে?

'বাবা, তুমি কখনও দ্বিতীয় এক কবিতার সৃষ্টি করতে পারবে না। কখনও না। তুমি অসংখ্য জেরক্স প্রতিলিপি বানাতে পারবে কিন্তু কখনও তা আসলের মত হবে না। তোমার তৈরি যন্ত্র ঐ 'X-85' হচ্ছে আসলের এক কদর্য প্রতিলিপি। এর সৌন্দর্য আছে, কবিতার মত বুদ্ধি আছে কিন্তু তার হৃদয় নেই। আমি জানি যে তুমি হৃদয় জাতীয় কিছুতে এক তিলও বিশ্বাস করোনা। 'X-85' আমাকে ভালবাসেনা। আমার জীবনকে ও নরকে পরিণত করেছে। একেকটা দিন কাটছে আর আমার জীবন আরও বিষময় হয়ে উঠছে। একাধিকবার সে অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।'

আমি অধ্যাপকের দিকে তাকালাম। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে, অসহায়। তিনি বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করছিলেন, 'কিন্তু...কিই বা আমি করতে পারতাম? অনুভূতি বা ভাবাবেগের জন্য কি কোনো জিন রয়েছে? কি করেই বা আমি নিশ্চিত হতে পারতাম যে আমার আবিষ্কার, 'X-85' একে কবিতার মতই ভালবাসবে?'

পাঁচবার নোবেল জয়ী এই বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীকে আমার তখন বলতে ইচ্ছে করছিল, 'অধ্যাপক, আপনি কিন্তু একটা কাজ করতে পারতেন। আপনার পাশের ঘরের পড়শি ঈশ্বরকে আপনি অনুরোধ করে বলতে পারতেন একটি 'প্রেমপূর্ণ হৃদয়' দিয়ে আপনার সহয়তা করতে। ঐ হৃদয় কোনো গোপন সূত্রানুযায়ী ঈশ্বর তাঁর নিজস্ব কর্মশালায় নির্মাণ করেন। কথাগুলো আমি কিন্তু বলিনি।

ফেরার পথে মনে হল অধ্যাপক চক্র বেশ অন্যমনস্ক। আপন মনেই বলছিলেন, 'ভাবাবেগকে কি জিনের স্তরে নিয়ন্ত্রণ করা যায়? কেন্দ্রে যে 90 শতাংশ ননকোডিং 'অর্থহীন' জিন রয়েছে তারা কি সত্যিই 'অর্থহীন'? এদের কি কোনো কাজই নেই? নাকি তারা তাদের প্রোটিনের এনকোডিং ব্যতিরেকেই, পরোক্ষ কোনো সূক্ষ্মভাবে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও ভাবনুভূতিগত ধাঁচাটিকে রূপ দেয়? হতেও পারে। হয়তো এইসব জিনের ক্রিয়াকর্মে পরিবেশ ও সমাজের হাত আছে। এ ব্যাপারটা কি ঐ তথাকথিত 'আচরণগত জিনতত্ত্ব'-এর অন্তর্গত, যে ব্যাপারটাকে আমি কোনোদিনই বেশি আমল দিইনি? মস্তিষ্কে যে অসংখ্য রহস্যাবৃত পেপটাইড রয়েছে, যাদের সংশ্লেষণ জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, এনজাইমের সাহায্যে যাদের সংশ্লেষণ ঘটে, তাদের ভূমিকা কি এই ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ? আমি কি বলব? জানিনা। কখনও বলতে পারব না।' অধ্যাপক অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকালেন। কিন্তু

তাঁকে শান্ত করার মত কিছুই আমার জানা ছিল না।

'হায়! আমি যদি এক অসীম কালপর্ব ধরে প্রেম, দয়া, ধৈর্য, সাহস, সততা ও বিনম্রতা প্রভৃতি মহৎ মানবিক গুণের এক মাধ্যমে 'X-85' কে পুষ্টিসাধনের জন্য রেখে দিতে পারতাম...যদি তাকে এমন এক পরিবেশ বা সমাজের মধ্যে রাখতে পারতাম যেখানে জীবনের মহৎ গুণগুলি সে উপলব্ধি করতে পারত তাহলে হয়তো...বলা যায়না, হয়তো তার জিনগুলো শুভদিকে প্রভাবিত হত। নিরেট মানবরূপের ওপরে হয়তো জিন ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার ফলে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটত। তুমি কি এই 'ঐশ্বরিক স্পর্শের' কথাই বলেছিলে?'

নির্বাক থাকাই শ্রেয় বলে মনে করলাম। অধ্যাপক চক্রেরও মুখে কথা নেই। তাঁর দিকে দেখলাম। চোখ বন্ধ, মুখ অভিব্যক্তিহীন। যেন কোনো ধ্যানমগ্ন ঋষি।

কেউ কি এই প্রশ্নগুলোর জবাব দেবে? হয়তো 2185 খ্রীষ্টাব্দের কোনোদিন, কারো সঙ্গে 'ঈশ্বরের' সাক্ষাৎকার ঘটবে। আমি জানিনা...

কোন দুই কালে

মুকুল শর্মা

গতকাল আবার 5 মে হবে। হাতে আর সময় নেই। কালই অফিসের কাজে ট্যুরে বেরিয়ে যাওয়ার আগে, আজই আমাকে তাকে বলতে হবে সব কথা। আমাদের দুজনের শোবার খাট থেকে আমি উঠি। আমার ফ্যাকাসে হাতের তালুতে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী কররেখা। দেওয়ালের হুক থেকে ঝোলানো একটা ঢিলেঢালা গাউন জড়িয়ে দেহ আবৃত করি।

আমার স্বামী তখন টেবিলের পাশে বসে থাকবে। ওখানেই ও রোজ বসে। হাতে খোলা খবরের কাগজ। আড়ষ্ট পা ফেলে আমি ঢুকি। আমার দীর্ঘ চুল আলগা পড়ে আছে। আমার বুক এখনই ঢিপ ঢিপ করছে যে ইনস্টিটিউট যদি অতীতে—মানে, আমি বলতে চাই ভবিষ্যতে—যদি কখনও জানত কি লজ্জার ঘটনাই না সেটা। ওর পাশে যেখানে আমি সবসময় বসি সেখানেই এক মুহূর্তের মধ্যে আমি বসতাম এবং আমি তাকে বলব কল্পবিজ্ঞানের একটি গল্প।

আমি বলি, 'তোমায় আমার কিছু বলার আছে।'

নীরবতা।

'আমি বললাম যে তোমায় আমার কিছু বলার আছে।'

খবরের কাগজ না নামিয়েই বলে, 'কি?'

'আমার একটা প্রেমের ঘটনা ঘটেছে।'

'ও। কখন?'

'আগামীকাল।'

'টাইমস' কাগজের ওপরে তার মাথাটি দৃশ্যমান হয়। ওর বড় চাকুরের জীবনধারার সঙ্গে বিদ্রূপের ধরণটিও মানানসই। ধীরকণ্ঠে সে বলে, 'বেশ তো, এমন ঐ ভাগ্যবান পুরুষটি কে যার সঙ্গে তোমার ঘটনাটি ঘটতে চলেছে?'

'ঘটতে চলেছে নয়। সেটা ঘটে গেছে।'

'কখন হল?'

'বললাম যে তোমায়। আগামীকাল।'

সংস্কৃতিমান রোবটের মতো ওর প্রতিক্রিয়া হয়। মাথায় সব গুলিয়ে যাচ্ছে বলে চটেমটে আগুন। চেঁচিয়ে বলে ওহট 'কি...ই?'

যতটা ভাবাবেগহীন ও নির্লিপ্ত গলায় সম্ভব উত্তর দিই, 'হ্যাঁ, আমি অতীত ও ভবিষ্যতে যাওয়া আসা করতে পারি, আমি কালযাত্রী।'

এখন আমি তাকে কিছুক্ষণ আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেব। ওর হতভম্ব, অবিশ্বাসী চাহনি আমার ভাবলেশহীন চোখ থেকে কিছু বুঝতে চাইছে। অবশ্য বরাবরই ও আমার প্রতি বিশ্বস্তই থেকেছে।

ও আমতা আমতা করে বলে, 'কিন্তু আমরা আট বছর ধরে বিবাহিত জীবন যাপন করছি!'

'আমি কি সবকিছু খুলে বলতে পারি? তার ফলে হয়তো তোমার বোঝার সুবিধে হবে।'

'বলেই ফেল,' ফের সেই বিদ্রূপের সুর।

তারপরই 'সবকিছু' এক নিশ্বাসে বলে ফেলি কিন্তু বলেই বা কি লাভ?' আমি এখন থেকে তিনশ পঞ্চাশ বছরের পরের মানুষ। আমি ফলিত নৃতত্ত্ববিদ্যা ইনস্টিটিউটের কর্মী। অতীতে মানব সমাজ কেমন ছিল তাই হল আমাদের গবেষণার প্রধান বিষয়। এই বর্ষের জন্য আমার গবেষণাপত্রের বিষয় হল, 'বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আধা-উন্নত দেশগুলিতে দ্বৈত জীবনের ভূমিকা ও রূপ।' এখন এ বিষয়ে গবেষণাপত্র তৈরি করতে হলে সবচেয়ে ভাল উপায় হল কোনো দ্বৈত পরিবারে সদস্য হিসেবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। তোমার তো জানা আছে যে তোমাদের শতকের নৃতত্ত্ববিদ মার্গারেট মিড, যিনি একসঙ্গে থাকতেন...'

বন্দুকের গুলির মতই ওর কথা আমার কথার ছেদ ঘটায়, 'এক মিনিট দাঁড়াও। ব্যাপারটা কি স্ববিরোধী নয়? তুমি যদি কালের গতির উল্টোপথে এসে আমার জীবনে হস্তক্ষেপ কর তাহলে কি ইতিহাস পরিবর্তিত হয়না? আমি বলতে চাই যে ভবিষ্যৎ থেকে তুমি যদি না আসতে তাহলে আমি সম্ভবত আর কাউকে বিয়ে করতাম এবং গোটা ব্যাপারটাই তারপর থেকে অন্যরকম হত।'

আমার কণ্ঠস্বরে ক্লান্তি, 'না, তা হতনা। কালভ্রমণের কূটাভাষটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কারণ ইতিহাসে তুমিই হলে প্রথম ব্যক্তি যে জনৈক কালযাত্রীকে বাস্তবে বিবাহ করে ইতিহাসকে পাল্টেছে। চতুর্বিংশ শতাব্দীতে, আমাদের কাছে এটা ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা।'

'তাহলে অত যে ভালবাসার কথা...বিয়ের আগে মেলামেশা...বিয়ে...সেই

মধুচন্দ্রিকা...সবটাই কি প্রহসন? এই এত বছর তুমি আমাকে গিনিপিগের মত পরীক্ষায় ব্যবহার করে এসেছ!'

ও খুবই আহত। আসলে স্থানাঙ্ক ভুল না করলে এটা হতনা। এবার শুধু ওকে নয়, ইনস্টিটিউটেও ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে হবে।

'যাইহোক, যা বলছিলাম। ঐ ভাগ্যবান পুরুষটি কে এবং আগামীকাল তার সঙ্গে ব্যাপারটি ঘটে গিয়েছে বলার মানে কি?'

আরে, ব্যাপারটা তো ঘটেইছে। কি করে বোঝাব আমি জানিনা। আমি শুধু জানি যে এটা ঘটতই। ভেবে দেখলাম যে ওকে ব্যাখ্যা করে বোঝানই সবচেয়ে ভাল হবে।

বলতে শুরু করলাম, 'ঐতিহাসিক নথিপত্র উল্টে দেখার পর বোঝা গেল যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে হলে আমাকে 1980-র 4 মে তে পেছিয়ে যেতে হবে এবং যে ক্লাবে তুমি সাঁতার কাটছিলে সেখানে জলের মধ্যে দেহরূপ পরিগ্রহ করতে হবে যাতে আমি জল থেকে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে...'

'...আমি বিকিনি পরা সুন্দরী মেয়েটিকে দেখে একেবারে পাগল হয়ে যাই। ক্লাবে কখনও তাকে দেখিনি। এক সপ্তাহের মধ্যেই বিবাহের প্রস্তাব করি।'

'হ্যাঁ, ঠিক, সেটাই ছিল সাধারণ ধারণা। কিন্তু শুরুর সময় স্থানাঙ্ক নির্ধারণে একটু ভুল করে ফেলায় আমি 1988-র 5 মে রাত সাড়ে এগারটায় এক হোটেলের অভ্যন্তরের বারান্দায় নিজেকে বিকিনি পরা অবস্থায় পাই। ভাগ্যে কেউ আমায় দেহরূপ পরিগ্রহ করতে দেখেনি। যাইহোক ঐ পোষাকে আমার পক্ষে ঘোরাফেরা অশোভন ভেবে নিকটতম ঘরের দরজায় বেল টিপি। তখন একজন পুরুষ দরজা খোলে এবং...'

'নিশ্চয়ই তুমি তাকে জড়িয়ে ধরলে তখন?'

'ঠিক তা নয়। পুরুষটি অবশ্যই কোনো গণিকার প্রতীক্ষায় ছিল এবং ঐ পোষাকে অত রাতে আমাকে দেখে সে টেনে ভেতরে ঢুকিয়ে নেয় এবং বুঝতেই পারছ যে এর পরে...'

'তারপর কি হল?'

'আমি স্থানাঙ্ক ঠিক করে নিলাম ও লোকটি যখন ঘুমোচ্ছিল তখন 1980 সালের দিকে রওনা দিলাম।'

'তারপর আর তাকে দেখনি?'

'না, তারপর দেখিনি।'

নীরবতা। ওর ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। শেষে সে বলে, 'আসলে, তুমিই

দোষী...সেই এক রাত্তির হঠাৎ এযে।' এক নম্বরের ধড়িবাজ!

'না', জবাব দিই আমি, এই প্রথম আমার গলায় বিরক্তির আভাস, 'কখনোই তা বলতে পারোনা কারণ ঠিক করে বললে তখন তোমার সঙ্গে আমি বিবাহিত ছিলাম না। কেউ যদি এরকম করে থাকে, জানতে যদি চাও, তাহলে সে তুমিই।'

'কেন? কি করে তুমি তা বলতে পার?' ওর গলায় উৎকণ্ঠা।

আমার জবাব, 'প্রিয়তম, আগামীকাল হোটেলে এক রাত্তির কাটাবার সময় সেটা তুমি বুঝতে পারবে।'

আরও নীরবতা।

দ্বিতীয় আগমন

আর. এন. শর্মা

শীতকালের প্রথম হালকা তুষারপাতে সূচনা হল বিবর্ণ সকালটির। পা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটির মুহূর্তের জন্য জ্ঞান এল। জ্ঞান আসা মানেই সেই অবর্ণনীয় যন্ত্রণা। চোখটা একটুই ফাঁক হয়, মুখটা ফোলা, ক্ষতবিক্ষত। আধখোলা চোখে শুধু কিছুটা দূরে কম্যানডাণ্টের ঘরের জানালাটা দেখা যায়। প্রচণ্ড ব্যথার মধ্যেও মুমূর্ষু দৃষ্টি গিয়ে পড়ে ঘরের সামনে রাখা কৃত্রিম একটি খাটো মাপের ক্রিস্টমাস বৃক্ষের ওপরে। লাল ও হলুদ পুঁতির মালা দিয়ে সাজানো গাছটি ধীরে ধীরে তুষারে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড বেদনা ও বিবমিষার ঢেউ আবার ফিরে আসে। আবার চোখ বন্ধ করে ফেলে সে। তার শরীরের প্রতিটি অণু এই অত্যাচারের শাস্তি দাবি করে, কেন এই জঘন্য অপরাধ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা চায়, মনুষ্যকল্পিত সকল পবিত্র স্বর্গ ও অশুভ নরকের কাছে বলে যে সে যেন প্রতিহিংসা নেবার জন্য পুনর্জন্ম লাভ করে।

মৃত্যু শিবিরের 628349673 নং বন্দী, আঠাশ বছরের যুবক পোল ইহুদী ইয়ান রাদাওয়ানস্কি এর পরের মুহূর্তেই মারা যায়। মৃত্যুর সময় তার ছেঁড়া, কাটা ঠোটে ছিল অভিশাপ ও প্রার্থনা। আউশভিৎজ্ মৃত্যু শিবিরে অসংখ্য মানুষ মারা গেছে। অনেককে গ্যাস প্রয়োগ করে মারা হয়েছে। অনেককে পিটিয়ে বা না খেতে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু দুই রাত্রি ধরে অকথ্য অত্যাচারের ফলে অসহনীয় যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন হয়ে ইয়ান রাদাওয়ানস্কি যেভাবে মারা গিয়েছিল তেমন আর কারো ক্ষেত্রে হয়নি। উদ্দেশ্য ছিল জনৈকা ফরাসী বেশ্যাকে একটি উপহার দেওয়া এবং সেই উপহারটি হল মানুষের চামড়া দিয়ে বানানো একটি বটুয়া।

আউশভিৎজ্-এর ডেপুটি কম্যানডাণ্ট ও এস. এস. (গেস্টাপো) কর্ণেল ডিলহেলম্ ব্রাণ্ট্-কে কেউ বলেছিল যে জীবন্ত শূকরের দেহ থেকে ছাড়িয়ে নিলে খুব ভাল, মসৃণ চামড়া পাওয়া যায়। পারী থেকে সরাসরি আমদানি করা ফরাসী রক্ষিতাটির জন্য হের ব্রাণ্ট্ একটি অনন্য ও অননুকরণীয় উপহারের কথা ভেবেছিলেন।

সোনালী চুলের ঐ পোল ইহুদী যুবককে তাঁর বড়ই মনে ধরেছিল। খাসা শূকর পাওয়া গেছে! বরাবরই অসম্ভব সব কাজে সফল হবার জন্য হের কর্ণেল ব্রাগুট্ নিজেকে তারিফ করতেন। দেহ থেকে শেষ চামড়াটুকু ছাড়িয়ে নেওয়া অবধি পোল বন্দীটি জীবন্ত ও সচেতন ছিল। চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়ার সময় লোকটি যে বীভৎস চিৎকার ও গালিগালাজ করেছিল তার জন্য লঘু শাস্তি হিসেবে তাকে পেটানো হয় ও পরে উল্টো করে ঝুলিয়ে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়।

কর্ণেল ব্রাগুট্ তখন পরম শান্তিতে ঘুমোচ্ছিলেন যখন তাঁর ঘরের জানলার থেকে প্রায় পঞ্চাশ মিটার দূরে ঝুলন্ত ইয়াম রাদাওয়ানস্কি সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ও সৃষ্টির কাছে দ্বিতীয়বার ব্রাগুট্-এর সঙ্গে দেখা হওয়ার ঐকান্তিক প্রার্থনা জানিয়ে মারা যায়। ইয়ান বলেছিল দ্বিতীয়বার যেন দুজনের সম্পর্কটা এত অসম না হয়। কর্ণেল ব্রাগুট্ ঘুম থেকে ওঠে সারাদিনের দেখাসাক্ষাৎ ও আমোদ-আহ্লাদের তালিকাতে চোখ বুলোবার আগেই তাঁর সুযোগ্য সহচর, দক্ষ কারিগর ও খুনে ম্যাক্স জুরগেন রাদাওয়ানস্কির মৃতদেহটি নিয়ে গিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলেছিল।

মৃত্যু শিবিরের ওপর তখন নিরন্তর তুষার ঝরছিল।

নভেম্বরের এক বিবর্ণ, ফুরিয়ে আসা দুপুরে জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের মিউনিক শহরে সরকারী নথিপত্র মাফিক জনৈক ভদ্রলোক অবতরণ করেন যিনি হলেন ভারত প্রজাতন্ত্রের উষ্ণ ও আর্দ্র দ্বীপ-মহানগর বোম্বাই-এর বাসিন্দা ভারতীয় নাগরিক অবিনাশ অভয়ঙ্কর।

পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চি লম্বা, চৌত্রিশ বছর বয়সী ককেশীয় পুরুষ অবিনাশ পেশায় শিক্ষক। বিমানবন্দরের কাচের জানলায় হালকা বৃষ্টি ঝরছিল। মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁর নিতে আসার কথা অবিনাশ তাঁর সন্ধানে এদিক-ওদিক দেখছিলেন। তাঁকে নিয়ে দেখা গেল কর্মব্যস্ত কারোই কোনো মাথাব্যাথা নেই। বোঝাই গেল যে ফ্রাঙ্কফুর্ট পৌঁছতে এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানটি দেরি করার ফলে তাঁর কিছু মূল্যবান ডয়েটশ মার্ক (ডি. এম.) খরচ হবে। গম্ভীর মুখে নিজের ব্যাগটি তুলে নিয়ে তিনি একটি অপেক্ষামান ট্যাক্সির দিকে এগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটা জার্মানির প্রশস্ত অটোবান অর্থাৎ দ্রুতগতিতে মোটরযান চলার রাজপথ দিয়ে ছুটে চলল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে অভয়ঙ্কর দেখলেন প্রাসাদোপম এক গথিক ধাঁচে নির্মিত অট্টালিকা। সেখানে সাদর অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের ফলে সব অসুবিধা

ও ট্যাক্সিভাড়া হিসেবে 16 ডয়েটস মার্ক গচ্চা যাওয়ার কষ্ট অবিনাশ নিমেষেই ভুলে গেলেন। জিনের পুনর্বিন্যাস বিষয়ক এক আলোচনাচক্রে যোগ দিতে মাত্র এক সপ্তাহের জন্য তাঁকে জার্মানিতে আসা। জিনতত্ত্বের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারার জন্য অবিনাশ স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন। এই সূত্রেই তাঁর জার্মান বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগযোগ যার ফলশ্রুতি এই নিমন্ত্রণ। জার্মান পক্ষ থেকে তাঁর যাতায়াতের ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। ওদিকে হাড়কঞ্জুষ ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক তাঁকে দিয়েছিল পাঁচ দিনের দৈনিক ভাতা (যেন সপ্তাহান্তের ছুটির দুদিন তাঁর অনাহারে থাকলেও চলবে)। ড: অবিনাশ অভয়ঙ্কর এরপর বিজ্ঞানীদের আড্ডা, আলোচনাচক্রের অধিবেশন, বিয়ার পান, আলাপ পরিচয়, আরও বিয়ার পান—এক ব্যস্ত অথচ আনন্দময় সময়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। এত বিয়ার বোধহয় একমাত্র ব্যাভেরিয়াতেই পাওয়া সম্ভবপর। নিজের গবেষণাপত্র পাঠ, গল্পগুজব, পানাহার—বেশ ভালই সময় কাটছিল। অবিনাশ ঠিক করেছিলেন যে সরকারী হিসেবে যে দুদিনের অস্তিত্ব নেই সেই শনি ও রবিবার তিনি একা একা ঘুরে বেড়াবেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা হিসেবে ভারত সরকার প্রদত্ত 500 ডলারের সদ্ব্যবহার করবেন। একা একা এলোমোলো ঘুরে বেড়াতে তাঁর খুবই ভাল লাগত। বিভিন্ন ঝলমলে রাস্তা ও নানা পণ্যে শোভিত সুপারমার্কেটগুলি তিনি ঘুরে ঘুরে দেখলেন, পাতাল রেলে চড়লেন, চলন্ত পথ ও সিঁড়ির শিহরণ অনুভব করলেন। যৌন সামগ্রীর দোকানেও কয়েকবার সন্তর্পণে উঁকি দিলেন পাছে জিতেন্দ্রিয় কোনো জার্মান বন্ধু তাঁকে দেখে ফেলেন। হাঁস যেভাবে পুকুরে একাত্ম হয়ে যায় সেরকমই নিজের অজান্তেই অবিনাশ তিনদিনের মধ্যেই মিউনিক শহরটাকে যেন আঁতিপাতি চিনে ফেললেন। ফিরে আসার একদিন আগে, এলোমেলোভাবে এরাস্তা ওরাস্তা দিয়ে বেড়াবার সময় তিনি হঠাৎ যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অবস্থা একটু কাহিলই হয়ে পড়েছিল কারণ আকাশ ছিল কাল মেঘে ঢাকা এবং একটানা বৃষ্টি পড়ছিল। প্লাস্টিকের নতুন জার্মান বর্ষাতি পরা থাকলেও অবিনাশ ভিজে গিয়েছিলেন। রাস্তাগুলো তখন জনমানবহীন এবং পাতাল রেলের নিকটতম স্টেশনটি যে কোথায় তিনি মনে করতে পারছিলেন না। এবং দুর্ভাগ্যবশত জার্মান ভাষা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান 'আখটুং', 'হেরেন' ও 'হল্ট'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই শব্দগুলো সচরাচর বিভিন্ন জায়গাতে বড় বড় করে লেখা থাকে। একটা রাস্তায় বাড়িগুলো বেশ পুরনো ও ভাঙাচোরা গোছের। সেখানে একটা জানলার আলসের তলায় আশ্রয় নিলেন অবিনাশ। কয়েকটি পালক বা তুলোর মত ছোট্ট শুভ্রকণা গা থেকে ঝেড়ে ফেলার পর তিনি উপলব্ধি করলেন যে জীবনে প্রথমবার তিনি তুষারপাত দেখছেন। ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের এই

বাসিন্দা এতদিন শুধু তুষারপাতের কথা শুনেই এসেছেন। কিছুটা উত্তেজিত হয়ে তিনি ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে অন্ধকার আকাশ থেকে অসংখ্য তুষারকণা ধীরে ধীরে নামছে তো নামছেই। হাত বাড়িয়ে দিয়ে তুষারকণার নরম শীতল স্পর্শ অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উল্টোদিকের বাড়িগুলোর ওপর চোখ বোলাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল লাল হলুদ পুঁতি দিয়ে সাজানো ছোট্ট একটা কৃত্রিম ক্রীষ্টমাস বৃক্ষ ধীরে ধীরে তুষারে ঢাকা পড়ছে। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকার পর যেন একটা ঘোরের মধ্যে তিনি সেই বাড়িটার দিকে চললেন যার সামনে সাজানো গাছটা দাঁড়িয়ে ছিল। রহস্যজনকভাবে তিনি দরজার ঘণ্টাটাও পেয়ে গেলেন এবং চেপে ধরলেন। ভেতরে যে ঘণ্টা বাজছে সেটা শুনতে পেলেন অবিনাশ। দরজার কাছে লাগানো একটি লুকানো স্পিকার থেকে একটি কর্কশ কণ্ঠস্বর জার্মান ভাষায় বলে উঠল, 'কে?'

ড: অভয়ঙ্করেরই একটি সত্বা যেন লক্ষ্য করল যে জবাবে তিনি একটা অচেনা, অদ্ভুত নাম বললেন, 'জুরগেন।'

দরজাটা খুলে গেল। ড: অভয়ঙ্কর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। একটা ছোট্ট, খালি বসার ঘর থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে দ্বিতীয় একটি ঘরে। সেই ঘরে ঢুকে তিনি দেখলেন পত্র-পত্রিকা, বই ও জামাকাপড় ছড়ানো ছিটানো। কিন্তু তাঁর চোখ গিয়ে পড়ল বিছানায় যে লোকটি শুয়ে ছিল তার ওপর। লোকটা লম্বা ও বলিষ্ঠ। নির্মম, ধারালো দৃষ্টি আর মুখটা দেখলেই বোঝা যায় অন্যকে কষ্ট দিয়ে নিষ্ঠুর আনন্দ পাওয়ার সুস্পষ্ট ছাপ। লোকটা জার্মান ভাষায় গর্জে উঠল, 'এর অর্থ কি?'

বিছানায় শুয়ে থাকা লোকটার চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে ড: অভয়ঙ্কর শান্ত, পরিকল্পিত পদক্ষেপে এগোতে লাগলেন। এক মুখচোরা, সাধারণ অধ্যাপক থেকে সহসা এক আশ্চর্য রূপান্তরের মাধ্যমে তিনি এক সাহসী, নির্মম ও অতীব সচল এক মানুষে পরিণত হলেন যে ঠিক ঠিক জানে যে সে কি চায় এবং তার জন্য তাকে কি করতে হবে। হতবুদ্ধি জার্মানটির কাছে গিয়ে তিনি স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায় গলাটা টিপে ধরে তাকে উঁচু করলেন। জার্মান লোকটি এতই ঘাবড়ে গিয়েছিল যে তার মুখে কথা ছিল না।

ড: অভয়ঙ্কর শুনলেন যে তিনি বলছেন, ইয়ান রাদাওয়ানস্কি, 628349673, আউশভিৎজ্।'

নামটি অবিনাশের কাছে কোনো অর্থ বহন করেনা। কিন্তু তিনি দেখলেন যে গলা টিপে যে মানুষটিকে তিনি ধরে আছেন নামটা শুনেই তার চোখদুটো ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। ড: অভয়ঙ্কর বুঝতে পারলেন যে তিনি এমন এক শক্তির দ্বারা চালিত

হচ্ছেন যা তাঁর বোধবুদ্ধি ও ইচ্ছার তোয়াক্কা করেনা। তিনি অন্য কারো ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এবং তাঁর প্রকৃত সত্বাটি যেন এক অজানা কোণে সরে গেছে। সেখান থেকে সে সবকিছুই দেখছে কিন্তু কিছু করতে সে অপারগ। বিচ্ছিন্ন দর্শকের মতই অবিনাশ সবকিছু দেখে যেতে লাগলেন। নিজস্ব জীবনে তিনি ছিলেন কম কথা বলা, শান্ত, ধীর স্থির মানুষ যাঁর বিশেষ কোনো দৈহিক ক্ষমতা বা শক্তির প্রশ্নই ওঠেনা। প্রমাণ মাপের ঐ মানুষটিকে তিনি কাপড়ের পুতুলের মত এমনভাবে তুলে ধরেছিলেন, সেরকম তাঁর পক্ষে পারা সম্ভব কিনা তখনও তাঁর সন্দেহ হচ্ছিল। বিস্মিত হয়ে তিনি দেখলেন যে লোকটিকে তখনও তিনি তুলে ধরে আছেন, তীব্র ক্রোধে ঝাঁকাচ্ছেন, লৌহকঠোর আঙুলের চাপে তার দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। শ্বাসরুদ্ধ লোকটির মুখে ফেনা উঠছে, অসহায়ভাবে গোটা দেহটা ছটফট করছে। দুরন্ত গতিতে, প্রচণ্ড শক্তিতে অধ্যাপক এবার বিছানায় আছড়ে ফেলে দিলেন। এবং হত্যা করার জন্য এগোলেন। যেন একটা ভয়াবহ পদ্ধতি রয়েছে পূর্বপরিকল্পিত। প্রথমে নখ বসিয়ে জার্মানটার মুখ তিনি ছিঁড়ে, খুবলে ক্ষতবিক্ষত করে দিলেন। সে এত ভয় পেয়েছিল যে চিৎকারও করেনি। তারপর হিংস্রভাবে লম্বা, ধারালো রুটি কাটার ছুরি দিয়ে তিনি লোকাটার পেট চিরে ফেললেন। এতেও তৃপ্ত না হয়ে তিনি ওর পেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে নাড়িভুঁড়িগুলো টেনে বের করে আনলেন। আশ্চর্যজনকভাবে আক্রান্ত লোকটি তখনও বেঁচে ছিল এবং ভীতিবিস্ফারিত চোখে দেখছিল যে আততায়ী তার নাড়িভুঁড়িগুলো ছিঁড়ে চারপাশে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। ব্যক্তিগত জীবনে ড: অভয়ঙ্কর ছিলেন নিরামিষাশী ও একনিষ্ঠ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাঁর হাতদুটো স্বয়ংক্রিয় হয়ে গিয়ে যা করছিল তা দেখে তিনি বিহ্বল বোধ করছিলেন। আবার অসহায় শিকারের ওপরে বীভৎস সেই অত্যাচার চালিয়ে, তার ভয় ও যন্ত্রণা উপভোগ করে, ড: অভয়ঙ্করের সত্বার এক অজানা অংশ যেন নির্মম আনন্দ লাভ করছিল, সম্পূর্ণতার পরিতৃপ্তি অনুভব করছিল। দীর্ঘ এক ভয়াবহ যন্ত্রণার পর জার্মান লোকটি অবশেষে মরে মুক্তি পেল। ড: অভয়ঙ্কর একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। হাঁপাচ্ছিলেন তিনি। দরদর করে ঘাম ঝরছিল। তখনও তাঁর নিজেকে বোম্বাইবাসী সহযোগী অধ্যাপক ড: অবিনাশ অভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছিল না। ঠাণ্ডা মাথায় উঠে তিনি ঘরের কোণে রাখা বেসিনটির কাছে গিয়ে শান্তভাবে হাতদুটো ধুলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্লাস্টিকের বর্ষাতি ও পায়ের গামবুট থেকে রক্ত মুছে ফেললেন। অকুতোভয়ে এক খণ্ড কাপড় দিয়ে ছুরিটা ও দরজার হাতল পরিষ্কার করলেন। তারপর শান্তভাবে, বিছানা ও মেঝে জুড়ে যে ভয়াবহ রক্তাক্ত দৃশ্য ছড়িয়ে ছিল সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে, তিনি শোবার ঘর থেকে

বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, বসার ঘর পেরিয়ে, বাইরে ফাঁকা তুষারাবৃত পথে এসে নামলেন। নিশ্চিত, দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি হাঁটতে থাকলেন।

আরে! ঐ তো নুটডেনসেনস্ট্রাসে এবং ওখানেই রয়েছে হপটবানহক। সহসা অনুভব করলেন যে তাঁর খুবই তেষ্টা পেয়েছে। বিশাল গীর্জাসদৃশ স্টেশনটিতে ঢুকে তিনি ধারের একটি দোকানে একটি বিয়ার চাইলেন। ধীরে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দেওয়ার সময় তিনি নির্দিষ্টভাবে কোনো কথাই ভাবছিলেন না। মাত্র কয়েক মিনিট আগেই যা ঘটে গেছে তা নিয়ে তিনি ভাবতে চাননি। ও কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়াই ভাল। তাঁর মন কোনো কথাই ভাবতে চাইছিল না। নিশ্বাসও তখন অত ঘন ঘন পড়ছিল না। তিনি শান্ত, স্বাভাবিক ও সহজ বোধ করছিলেন। কালই তিনি এই শহর, এই দেশ ছেড়ে চলে যাবেন এবং কখনও ফিরে আসবেন না। আরামে বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে তিনি দেখছিলেন একের পর এক ট্রেন আসছে, যাচ্ছে।

পরের দিন স্থানীয় দৈনিক 'মুনচেনার'-এর দ্বিতীয় পাতায়, ছোট করে প্রাক্তন নাৎসি যুদ্ধাপরাধী ভিলহেলম্ ব্রাগুট্-এর বীভৎসভাবে খুন হওয়ার সংবাদটি প্রকাশিত হয়। ব্রাগুট্ ছিল আউশভিৎজ্-এর গেস্টাপো কাহিনীর প্রাক্তন ডেপুটি কম্যানডান্ট। সংবাদে বলা হয় যে আউশভিৎজ্-এর কোনো প্রাক্তন বন্দী বা তাদের আত্মীয়স্বজন সম্ভবত প্রতিহিংসার বশে এই হত্যা করেছে। জার্মান কর্তৃপক্ষ এই ধরনের অপরাধ নিয়ে বেশি তদন্ত করেনা বরং যত তাড়াতাড়ি এগুলো ধামাচাপা পড়ে তাতেই ওদের আগ্রহ বেশী। দায়-সারা তদন্তের মাত্র দিন চারেক পরেই 'উচ্চ মহলের নির্দেশ' অনুযায়ী ব্রাগুট্ হত্যার ফাইলটি 'অনিষ্পন্ন' তকমা মেরে চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পূর্বনির্ধারিত সময়মত ড: অবিনাশ অভয়ঙ্কর ভারতে ফিরে আসেন। উনআশি বছর বয়সে, পূর্ণ বার্ধক্য, ঘুমের মধ্যে শান্তিতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তার আগে একদিনের জন্যও তিনি অসুস্থ হননি। এরপর তিনি জীবনে একটি মাছিও মারেন নি। ক্রমেই তিনি বেশি করে ধর্মপ্রাণ হয়ে উঠেছিলেন এবং ফিবছরই তিনি পবিত্র গঙ্গাস্নান করতে যেতেন। কিন্তু হরিদ্বারের থেকে দূরে তিনি কখনও যাননি। বিদেশে তো কখনোই নয়। এমনকি কাশ্মীরে এক সপ্তাহের ভ্রমণের আমন্ত্রণও তিনি গ্রহণ করেন নি। আসলে তিনি মনে করতেন যে তুষার দেখলেই তিনি সেই ঘোরের মধ্যে পড়ে যেতে পারেন। তাই এখন কোনো ভৌগোলিক স্থানে ভ্রমণ তিনি সতর্কভাবে এড়িয়ে চলতেন যেখানে তুষার ঝরতে পারে। তুষারপাতের মধ্যে যে ঘটনা ঘটেছিল তা চিন্তা করতেও তাঁর ভয় হত।

বহু বছর পূর্বে, জার্মানীতে, সেই ভয়াবহ দিনটিতে হয় তুষারপাত বা বাড়িটার

সামনে হাস্যকর সেই কৃত্রিম গাছটিকে দেখে ড: অবিনাশ অভয়ঙ্কর ঐ কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন। হত্যার কথা চিন্তা করা যায়? তাও আবার বিদেশে, শুধু খালি হাতে একটি মানুষকে হত্যা। ওখানকার পুলিশের এত যে অপরাধীদের ধরার ক্ষমতার কথা শোনা যায় তার মধ্যেও তিনি চোখ এড়াতে কি করে পেরিছিলেন তা স্বয়ং ঈশ্বরই জানেন। নিশ্চয়ই তখন তিনি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। এই অন্ধকার গোপন রহস্যটি তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছেও উদ্‌ঘাটন করেন নি। এটা নিয়ে ভাবতেও তাঁর ভাল লাগত না। এক একসময় তিনি এভাবে ভাবতে পছন্দ করতেন যে গোটা ব্যাপারটাই তিনি নিছকই কল্পনা করেছেন। কিন্তু এটাও তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে জার্মানিতে একটি অপরিচিত লোককে তিনি জবাই, হ্যাঁ জবাই-ই করেছিলেন। এবং কেন করেছিলেন, কি কারণে করেছিলেন তার বিন্দুবিসর্গও তিনি জানতেন না।

এক একসময় তিনি ভেবেছিলেন যে যাকে তিনি খুন করেছিলেন তার সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া দরকার। আবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভেতর থেকেই সাবধানবাণী শুনে ওপথে এগোননি। ব্যাপারটি নিয়ে একটু বেশি সময় ধরে ভাবার চেষ্টা করলেই তাঁর মাথা আর কাজ করত না। কেমন ভারহীন ফাঁকা হয়ে যেত। সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি তাঁর মনেও পড়ত না, ক্বচিৎ কখনো ছাড়া। তাঁর পক্ষে এটাই মঙ্গলজনক হয়েছিল। তবে, ফিবছর তিনি যখন গঙ্গাস্নান করতে যেতেন তখন তিনি নিজের জন্য যেমন ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন তেমন অজানা সেই নিহতের আত্মার জন্যও শান্তিকামনা করতেন। সে অবশ্য এটাকে তারিফ করত কিনা ও নিয়ে ড: অবিনাশ অভয়ঙ্করের বেশ সন্দেহই ছিল।

বৃষ্টি

কেনেথ ডয়েল

গোটা জমিটা শুকিয়ে একেবারে ফুটিফাটা। অথচ একসময় এই জমি কি উর্বরই না ছিল। মাটি একেবারেই নিষ্ফলা হয়ে পড়েছে। বিষণ্ণ মুখে চাষীটি জমির দিকে তাকিয়েছিল। এই একটানা গ্রীষ্মই হচ্ছে তার প্রধান শত্রু—এক এক সময় তাপমাত্রা 45 ডিগ্রি সেলসিয়াসেও চড়ে যায়। টকটকে রঙীন একটা গামছায় কপালের ঘাম মুছে তিলকরাম বুকভরা আশা নিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। পরিষ্কার নীল আকাশ। কোথাও এক ফোঁটা মেঘের চিহ্নও নেই। গোঙানির মত শব্দ করে, মাথা নিচু, তিলকরাম গুটি গুটি তার কুঁড়েঘরে ফিরে চলল। আবার সে বৃষ্টির জন্য আবাহনী গীত গাইবে।

তার ঐ আবাহনে ঠাকুর-দেবতাদের সাড়া দেওয়ার জন্য তিলকরামকে আরও তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কুঁড়েঘরের ছায়ায় বসে তিলকরাম দেখছিল যে তার ছোট ছেলে একটা কুকুর ছানা নিয়ে খেলা করছে। চড়চড়ে রোদ সত্ত্বেও দেখা গেল শিশু ও কুকুর—কারোই কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আকাশ মেঘে ঢাকা, গত এক সপ্তাহ ধরে মেঘই জমে আছে, কিন্তু প্রত্যাশিত সেই বর্ষার দেখা নেই। আকাশজোড়া মেঘের ঐ ধূসর চাদর যেন গরমটাকে আরও অসহনীয় করে তুলেছে কারণ অসম্ভব ভ্যাপসা গুমোট—দিন যেন কাটতেই চায়না। অস্বস্তিকর এক আলস্যে নেতিয়ে পড়েছে তিলকরাম কারণ সামান্য নড়াচড়া করলেই শরীর ঘামে ভিজে জ্যাবজেবে হয়ে যাচ্ছে। গত রাতে তিলকরাম যে মটরডাল সেদ্ধ খেয়েছে বাতাসটা যেন তেমনই ঘন। রাত্তিরগুলো কিছুটা স্বস্তি দিলেও তাও বড়ই কম সময়ের জন্যে। কয়েক দিন আগেও যে ঠাণ্ডা বাতাসে তার প্রাণ জুড়োত তাও যেন উধাও। নিজে যখন তিলকরাম রাজুর মতই ছোট্ট ছেলে ছিল তখনকার কথা তার খুব সামান্যই মনে পড়ে। না গ্রীষ্মে, না হাড় কাঁপানো শীতে—রাজুর মতই তার উৎসাহে কখনও ভাটা পড়ত না। তখন একমাত্র পাঠশালার পণ্ডিতের বেতের বারি খেলেই যা মনটা বেগড়াত। জীবন কি সিধা সরলই না ছিল তখন। শস্য, ফলন, সার, বাজার, দামের

ওঠাপড়া, ভয়ানক যত মহাজন—কোনো কিছু নিয়েই কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না...

শুনলে! দূরে যেন মেঘের গুরুগুরু? না, না, ও মনের ভুল, গরমের ঠেলায় মাথা গরম হয়ে গিয়েছে...আরে ঐ তো আবার, এবার আরও স্পষ্ট, একের পর এক। কুকুরছানাটা কুঁই কুঁই করে ঘরের নিরাপত্তায় এসে আশ্রয় নিল। মেঘগর্জন বাড়ছিল। কানে তালা ধরানো শব্দ করে কালো মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের আলো চিড় খেয়ে যাচ্ছিল। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি টুপ টাপ মাটিতে পড়ছিল আর তিলকরাম স্থির দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর, আকাশ যেন মুষলধারে ভেঙে পড়ল। আপাদমস্তক ভিজে গেলেও তিলকরাম আকাশের দিকে দুহাত তুলে দাঁড়িয়েছিল। চিৎকার করে সে বলছিল, 'ভগবানের জয় হোক। বর্ষা এসে গেছে, এসে গেছে বৃষ্টি।'

কয়েক দিনের মধ্যেই জমির চেহারা পাল্টে গেল। ছোট ছোট চারা সর্বত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মনে হল মাঠ যেন কেউ উজ্জ্বল সবুজ গালিচায় ঢেকে দিয়েছে। সমগ্র দৃশ্যপটটি যেন তাজা ও ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে উঠল। গাছের ডালে ডালে কুজনগীতে ভরপুর হল পাখির কুলায়গুলি। জীবনের আবাহনে মাটি আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। প্রকৃতি পুথির নতুন এক পর্ব রচনার জন্য জীবনদাত্রী বর্ষা আবার ফিরে এসেছে।

জিহোয়ায়েন কৌমরের একঘেয়ে লাগছিল। তার চেনাজানা বেশির ভাগ লোকই যে যান্ত্রিকভাবে দৈনন্দিন গৎবাঁধা জীবনকে খুশিমনে অস্তিত্ব বলে অভিহিত করে তার নিজের জীবনও সেরকম ছকেবাঁধা হয়ে ওঠায় জিহোয়ায়েন-এর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। তার সঙ্গে যারা মেলামেশা করত তাদের কেউই বিশেষ বুঝতে পারেনি যে তার মন কি পরিমাণে বিষণ্ণতার কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। অবশ্য এটাও ঠিক যে গত কয়েকমাস ধরে খুবই সতর্কতার সঙ্গে বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা ন্যূনতমে নামিয়ে এনেছিল। জিহোয়ায়েনের সমাজে নিয়মমাফিক দেঁতো হাসি নিয়ে এ ওর বাড়ি যাওয়া ও মনের কথা রেখেঢেকে কৃত্রিম সৌজন্যমূলক ব্যবহার এক প্রাত্যহিক রীতিতে পরিণত হয়েছিল। যদিও তার বর্তমান বিক্ষুব্ধ মানসিক অবস্থার জন্য এই রীতি বহুলাংশে দায়ী ছিল তবু এই রীতিকেই কাজে লাগিয়ে সে তার বিক্ষোভ লুকিয়ে রেখেছিল। বিশাল গোল আচ্ছাদনের মধ্যে বন্দী শহর থেকে সে বাইরের পৃথিবীতে, তার মতে যেটা আসল পৃথিবী, সেখানে চলে যেতে চাইত। জিহোয়ায়েন

অবশ্য জানত যে তার এই ইচ্ছা অলীক, আজগুবি। শিক্ষকরা শুনলে কি বলবেন? কিন্তু তার তখন যা মানসিক অবস্থা তাতে যুক্তিবুদ্ধি ও সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের সাহায্যে তার ক্ষুধার্ত, অস্থির মনকে বেঁধে রাখা সম্ভবপর ছিলনা। বিশ্বের বৃহত্তম শহরগুলোর কথা ভাবল জিহোয়ায়েন। প্রত্যেকটা শহর আকাশছোঁয়া গোলাকার আচ্ছাদনে ঢাকা। এইসব শহরের বাসিন্দারা কৃত্রিম এক আকাশের তলায় বাঁচে, কৃত্রিম উপায়ে সেখানে দিনের আলো ও রাতের অন্ধকার সৃষ্টি করা হয়। তারা কৃত্রিম বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, কৃত্রিমভাবে মামুলি কথা বলে এবং কৃত্রিম জীবনযাপন করতে করতে বেঁচে থাকে...

গ্রন্থাগারে ঢুকে জিহোয়ায়েন পরিষ্কার পর্দার ওপরে হাত রেখে সক্রিয়ন বিভাগের সাড়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পর্দাটি আলোকিত হয়ে উঠল এবং এক নজরে বার্তাগুলো দেখে নিয়ে জিহোয়ায়েন কথা বলা যন্ত্রের মারফতে সে যা চায় তা স্পষ্ট দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দিল, 'বিষয় : ইতিহাস, পৃথিবীর। কালপর্ব : বিংশ ও একবিংশ শতাব্দী, পুরনো পৃথিবীর বর্ষপঞ্জিকার তারিখ হলেও চলবে।'

নাতিদীর্ঘ বিরতির পর বহুপরিচিত নরম ও ঈষৎ খোলা গলার জবাব এল 'দয়া করে কোন কোন ক্ষেত্র ও কতটা বিশদভাবে জানতে চান তা জানাবেন।'

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে জিহোয়ায়েন বলল, সংক্ষিপ্তসার হলেই চলবে, তথ্যের মাপ : পনেরশ থেকে তিনহাজার শব্দ ও ছবি, উভয়ই চাই। ক্ষেত্র : শিল্পগত উন্নয়ন ও প্রযুক্তিবিদ্যা।'

পর্দাটি আবার জীবন্ত হয়ে উঠল। কণ্ঠস্বরটি জানাল, 'কালপর্ব : বিংশ ও একবিংশ শতাব্দী, পুরনো পৃথিবীর বর্ষপঞ্জিকা অনুযায়ী। পুরনো পৃথিবীতে বিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। মানুষ যখন উপলব্ধি করল যে তাদের বহু কাজ যন্ত্র করতে সক্ষম এবং এ ব্যাপারে যন্ত্রের দক্ষতাও বেশি তথা সে একঘেয়ে ও শ্রমসাধ্য কাজের হাত থেকে নিজেকে রেহাই দেওয়ার জন্য পথের অনুসন্ধানে ব্রতী হল। উন্নয়নের একটি অগ্রগণ্য ক্ষেত্র ছিল পরিবহণ। প্রথমদিকে জন্তুজানোয়ার দিয়ে গাড়ি টানার মত আদিম পদ্ধতি চালু ছিল। মনে করা হয় যে পুরনো পৃথিবীতে মানুষও গাড়ি টেনে নিয়ে যেত যাতে অন্যরা চড়ত। অবশ্য এই সময়ের সম্বন্ধে তথ্য প্রায়শই অসম্পূর্ণ এবং এর অধিকাংশই লোকমুখে প্রচলিত কাহিনী থেকে সংগৃহীত।

'ব্যক্তিগত পরিবহনের ক্ষেত্রে মোটরগাড়ির উদ্ভাবন এক বিপ্লব ঘটায়। ভূত্বক থেকে নিষ্কাশিত কার্বনঘটিত বস্তু থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করে এই যন্ত্রে ব্যবহার করা

হত। আবদ্ধ স্থানে এই জ্বালানি পুড়িয়ে একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সচল রাখা হত যা মোটরগাড়িকে চালাত। এর ফলে নানাবিধ গ্যাস ও বস্তুকণা আবহমণ্ডলে মিশে যায় যার মধ্যে কার্বন ও সালফারের অক্সাইড বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। অন্ধকার যুগের আগমনের এ হল অন্যতম কারণ সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।'

পর্দায় যে উদ্ভট ছবিগুলো নড়াচড়া করছিল জিহোয়ায়েন সাগ্রহে সেগুলি দেখছিল। এইভাবে মানুষরা ঘুরে বেড়াত! পদ্ধতিগুলো সেকেলে কিন্তু দেখলে তো বেশ কাজের বলেই মনে হয়। এবং এই ধাতত্ব দানবগুলোর সঙ্গে কয়েকটির একটা আশ্চর্য সৌন্দর্য আজ যেন তার চোখে ধরা পড়ছিল।

'জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকল ক্রমবর্ধমান হারে শিল্পায়ন। পুরনো পৃথিবীর সভ্য এলাকাগুলির ব্যাপক অংশ জুড়ে নির্মিত হত জনসাধারণের জন্য ভোগ্য পণ্য। এই উৎপাদনের জন্য বহুলাংশে জ্বালানি ব্যবহৃত হত যার ফলে আবহমণ্ডলে বর্জ্য পদার্থ বৃহৎ পরিমাণে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু বস্তুকণা ঘনীভবনের ফলে একটি স্তরে আবদ্ধ হয়ে 'ধোঁয়াসা'-র সৃষ্টি করেছিল যার দ্বারা পুরনো পৃথিবীর বড় বড় শহর আক্রান্ত হয়। ঐ সব শহরের বাসিন্দারা 'দূষণ' বলে যে সামগ্রিক পরিস্থিতিকে অভিহিত করত তার একটি অঙ্গ হল এই 'ধোঁয়াসা'।

এইবার জিহোয়ায়েন স্থির করল যে রেকর্ডিং-টা সে সামনে এগিয়ে দিয়ে মাঝে মাঝে একটু করে শুনবে এবং আশ্চর্য ছবিগুলো দেখে নেবে। এরকম করে এগোতে এগোতে সে যে জায়গাটা খুঁজছিল পেয়ে গেল।

'একবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে শুরু হয় অন্ধকার যুগ। মানবজাতির ইতিহাসে এ সময় হল সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে প্রাণমণ্ডল-2 শিরোনামের অধীনে স্বনির্ভর এক পরিবেশ ব্যবস্থা রক্ষার জন্য অনেকগুলি পরীক্ষা চালানো হয়। এই অভি যানের প্রাথমিক সাফল্যের ফলে প্রাচীন ধাঁচের হলেও বেশ দক্ষ স্বনির্ভর জনপদ স্থাপিত হয় যার থেকে বর্তমান যুগের আচ্ছাদিত শহরের উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু পরিবেশ ব্যবস্থার যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ইতিমধ্যেই হয়েছিল তার পূরণ প্রাণমণ্ডল-2 করতে পারেনি। প্রাণমণ্ডল-2 এর পরীক্ষা নিছকই অস্তিত্বরক্ষার চেষ্টায় পরিণত হয়। পরবর্তী যে ঘটনাবলীর ফলশ্রুতি হিসেবে অন্ধকার যুগ আসে সে সম্বন্ধে পর্যাপ্ত তথ্য রয়েছে এবং বর্তমানে যে বর্ষপঞ্জিকা চালু রয়েছে তাতে এখনও অন্ধকার যুগকে কাল চিহ্ন হিসেবে ধরা হয়। পূর্ববর্ণিত উৎসসমূহ ব্যতিরেকেও বহু অন্যান্য কারণ আবহমণ্ডল দূষণের জন্য দায়ী। অনুমান করা হয় যে বর্তমানে যেভাবে কৃষিকার্য করা হয় তা এককালে ব্যাপকভাবে করা হত এবং পৃথিবীর উপরিতলের বৃহৎ এলাকা জুড়ে সবুজের আধিপত্য ছিল। অনুমান করা হয় যে

কিছু আদিম মানুষ গাছকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করত এবং এর ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড জাতীয় গ্যাস আবহমণ্ডলে মিশ্রিত হয়। একইসঙ্গে উদ্ভিদ অধ্যুষিত জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার ফলে আবহমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের অনুপাতের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠা ব্যাপক, বিস্তৃত এলাকা থেকে বৃক্ষাদি নির্মূল করে ফেলার জন্য সংকট আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে। পুরনো পৃথিবীর ভঙ্গুর হয়ে ওঠা পরিবেশের নিরাময়ের জন্য এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কিছুই করেনি। এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিই ক্রমাগত বর্জ্য পদার্থ সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। এর ফলে প্ল্যাঙ্কটন নামধারী এককোষী উদ্ভিদের বহুবিচিত্র পরিবারের সংখ্যা লোপ পায়। জানা গেছে যে পরিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণে এই উদ্ভিদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আবহমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য বর্জ্য গ্যাস জমে ওঠায় আবহমণ্ডলের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গুরুতর পরিবর্তন ঘটে যার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পৃথিবীর আবহাওয়ায় পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। 'কাচের ঘরে উদ্ভিদ চাষের প্রতিক্রিয়া (গ্রিনহাউস এফেক্ট) নামক একটি ঘটনার (কথাটির উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল বলা কঠিন) ফলে পৃথিবীর উপরিতলের গড় তাপমাত্রা অনেকটা বেড়ে যায়। এর তীব্র ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। বিশেষত মেরু অঞ্চলে। সেখানে বরফ গলে সমুদ্রতীরবর্তী বহু এলাকা প্লাবিত হয়। এই কালপর্যায়ের আর একটি ঘটনা ছিল আবহমণ্ডলের আরক্ষাকারী ওজোন স্তরের ক্ষয়। এর ফলে অধিকতর পরিমাণে অতিবেগনি বিকিরণের অনুপ্রবেশ সম্ভবপর হয়। যাইহোক, এই বিষয়ে বেশি তথ্য পাওয়া যায়নি এবং পরবর্তী যেসব ঘটনাবলীর ফলে অন্ধকার যুগের সূচনা ঘটে তাতে এর ভূমিকা ঠিক জানা যায়নি।

'দূষণের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় পৃথিবীর বাতাস ক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাসের অযোগ্য হয়ে উঠল যার ফলে, ক্রমে, গড়ে উঠল আচ্ছাদিত শহর। দূষণের ফল-পরিণাম শুধুমাত্র বাতাসের গুণাগুণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, ভূ-পৃষ্ঠে যা থিতিয়ে পড়েছিল...'

এইবারে জিহোয়ায়েন সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দিল। তখনও সে জানত না যে তার ষোল বছরের জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করছে। দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহের বিষণ্ণতার পরে তখন তার মনে এক নতুন, অদ্ভুত ধরনের উচ্ছ্বাস। নিজের চোখে তাকে আচ্ছাদনের বাইরের পৃথিবীটাকে দেখতে হবে। সেখানকার বাতাসে নাকি নিঃশ্বাস নেওয়া যায়না। কিন্তু কি আর এমন বড় সমস্যা সেটা। তার রসায়নাগারে অনেক অক্সিজেনের ট্যাংক রয়েছে। সেগুলো কাজে লাগিয়ে সহজেই সে একটা নিশ্বাস গ্রহণের ব্যবস্থা বানিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু বাইরের রাস্তা কি সে খুঁজে বের করতে

সক্ষম হবে? সে জানত যে গোলাকার আচ্ছাদনগুলো যখন তৈরি হয়েছিল তখন প্রবেশপথও বানানো হয়েছিল। বহুদিন আগেই সেগুলো চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে কোনো পাহারাও থাকেনা। তাই জিহোয়ায়েন জানত যে তাকে বাধা দিতে কেউ থাকবে না। আর তাছাড়া, কার এত বুকের পাটা যে বাইরে বেরোবার কথা ভাবতে যাবে?

কয়েক মিনিটের মধ্যেই জিহোয়ায়েন অক্সিজেনের ট্যাংক ও গ্যাস মুখোস যোগাড় করে ফেলেছিল এবং লেসার রশ্মির সাহায্যে ধাতব পাত ফুটো করার একটি যন্ত্রও সে সঙ্গে নিয়েছিল। কেন যে এটা সে সঙ্গে নিয়েছিল সেটা তার নিজেরও জানা ছিলনা। হয়তো কয়েক সেন্টিমিটার পুরু ধাতব পাত কাটতে হবে। নিজেকে এটা বোঝালেও সেটাই কি আসল কারণ? নিকেল মেশানো কোনো ধাতুযৌগের পাতকে কাটতে এর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগে। এবং সহজেই অনুমেয় যে কোনো 'প্রাণীর' ওপরে যন্ত্রটি তাক করে চালালে কি ঘটবে। জিহোয়ায়েন কি সত্যিই ভেবেছিল যে বাইরে জীবন্ত কিছু থাকতে পারে? যাইহোক সাবধান হতে দোষ কি? বিশেষত যখন সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও নিরাপত্তা ত্যাগ করে আচ্ছাদনের বাইরে যেতে চলেছে।

উড়ন্ত গাড়ি চালিয়ে সে একেবারে শহরের প্রান্তে যেয়ে পৌঁছল। সেখান থেকে শব্দহীন উড়ন্ত গাড়িটা ফিরে চলে গেল। এবার সরু সুড়ঙ্গ পথ ধরে সে চলল একেবারে গোল আচ্ছাদনের প্রান্তদেশে। এরপর আধঘণ্টা ধরে চলল প্রবেশের দরজা খোঁজার বিফল প্রচেষ্টা। শেষে সে দেখল যে প্রান্তের একটি একটি স্থানে আচ্ছাদনের মসৃণতার বদলে আরও শক্ত জিনিষ বসানো রয়েছে। তারপরই সে দেখতে পেল! তারই মত উচ্চতার এক অন্ধকার, আয়তক্ষেত্রকার স্থান। দেখলে মনে হয় দরজাটি ধাতব। পিঠে অক্সিজেনের ট্যাংক বাঁধা। গ্যাস মুখোসটা সে ঠিক করে পরে নিল। দরজার দিকে এগোল জিহোয়ায়েন। এখানে যে ধরনের তালা লাগাবার ব্যবস্থা তেমন সে কখনও দেখেনি। দরজা এবং আচ্ছাদনের গায় দুটি সমান্তরাল কড়া লাগানো। তার মধ্যে দিয়ে সবটাকে বেঁধে রেখেছে বিশাল একটি ধাতব শেকল। শেকল কাটার কাজটি লেসার যন্ত্রের সাহায্যে কয়েক সেকেণ্ডেই সুসম্পন্ন হল। বিস্মিত হয়ে জিহোয়ায়েন ভাবল যে লোকের বাইরে বেরোনো ঠেকাতে এত খেলো ব্যবস্থা করা হয়েছে! কিন্তু কোনো মানুষের মাথা ঠিক থাকলে যে কখনোই বাইরে যেতে চাইবে না। নিজেকে উন্মাদ ভেবে জিহোয়ায়েন যেন মনে কিছুটা জোর পেল আর দরজাটা ঠেলল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে দেখল যে দরজাটা খুলতে শুরু করেছে। খুবই আস্তে খুলছিল দরজাটা। ক্যাঁচকোঁচ শব্দ

করে প্রতিবাদ করছিল। কিন্তু জিহোয়ায়েনের সাহসী ও সম্পূর্ণ বুদ্ধিহীন নির্দেশের কাছে দরজাটাকে শেষ অবধি নতিস্বীকার করতে হল। বহু শতাব্দী ধরে এই দরজা খোলা হয়নি। জিহোয়ায়েন কৌমর বাইরের পৃথিবীতে প্রথম পা ফেলল।

কি ভয়াবহ দৃশ্য! বিস্ময়ে সে যেন পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। তার কল্পনার পৃথিবীর সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। সামনে ধূ ধূ প্রান্তর কিন্তু যতদূর নজর চলে কোথাও প্রাণের লেশমাত্র স্পন্দন নেই। গ্রন্থাগারে যে সবুজ গাছপালার কথা আছে তার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। জিহোয়ায়েনের মনে পড়ে গেল যে পুরনো পৃথিবীর যে ছবি সে প্রাচীন ভিডিওরেকর্ডে দেখেছিল তাতে বালিতে ঢাকা প্রান্তরের নাম বলা হয়েছিল 'মরুভূমি'। ঠিক মনে পড়েছে। এ যেন সেই মরুভূমি। এর আর কোনো নাম দেওয়া সম্ভব নয়। জিহোয়ায়েন আকাশের দিকে তাকাল। অন্ধকার, হিংস্র, আচ্ছাদনের ভেতরের উষ্ম আরামের ছিটেফোঁটাও নেই। ঠাণ্ডা নেই কিন্তু জিহোয়ায়েনের দেহ কাঁপছিল। হঠাৎ কি যেন তার হাতে বিদ্ধ হওয়ায় সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। আকাশ থেকে ছোট ছোট ফোঁটায় তরল পড়ছে আর তার স্পর্শে জিহোয়ায়েনের তাপনিরোধক পোষাক গলে যাচ্ছে। ত্বকের ওপরে লাল লাল ফোসকার মত ক্ষত। প্রথম যে বিদ্ধ হওয়ার বেদনা তা এক অসহনীয় জ্বালায় সারা দেহে ছড়িয়ে তীব্রতর হয়ে উঠছে। জিহোয়ায়েন চিৎকার করে উঠল। দিশাহারাভাবে দৌড়তে থাকল যাতে এই ভয়াল আক্রমণ থেকে নিজেকে সে বাঁচাতে পারে। সারা দেহ জ্বলে যাচ্ছে। মরণযন্ত্রণায় পুড়তে পুড়তে জিহোয়ায়েন আবার আর্তনাদ করে উঠল।

এর পরে আর কোনো শব্দ জিহোয়ায়েন করতে পারেনি। আকাশ থেকে সেই তরল তার সারা শরীরে বর্ষিত হচ্ছে। মাটির ওপর দিয়ে তরল আগুনের ধারা হিস্ হিস্ করে বইতে লাগল। চারিদিকে কোথাও কিছু নেই, শুধু প্রথম যে মানুষটি আচ্ছাদনের বাইরে বেরিয়েছিল তার হাড় ও ক্ষতবিক্ষত মাংস!

জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে অনন্তকাল যে আসা যাওয়া চলেছে তারই নতুন এক পর্বের সূচনা ঘটাতে পৃথিবীতে সেদিনও বৃষ্টি আবার পড়েছিল।

বিদায়, মিস্টার খান্না

দেবেন্দ্র মেওয়ারি

'ইনি হলেন মিস রুবি, আপনার ব্যক্তিগত সচিব।'

খান্না সাহেব হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা!' ট্রাস্টের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঘনশ্যাম সিংহানিয়া রুবির দিকে ফিরে বললেন, 'রুবি, তুমি এর কাছে কাজ করবে। ইনি হলেন মি: অমিত খান্না। প্রশাসন ও পরিচালনে খুবই অভিজ্ঞ ব্যক্তি। এঁকে শুধু সকলে মান্যই করেনা, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের দক্ষতার জন্য একাধিকবার ইনি বিভিন্ন সম্মানেও ভূষিত হয়েছেন। আমার স্থির বিশ্বাস যে আমাদের ট্রাস্টের পক্ষে মি: খান্না বিশেষ সম্পদ হয়ে উঠবেন!'

রুবি আড়চোখে তার হবু মনিবের আড়চোখে তাকাল। ওষ্ঠরেখার মোহন হাসি।

সিনহানিয়া সাহেব বলে চললেন, 'আর রুবি! রুবি হল আমাদের ট্রাস্টের এক রত্ন বিশেষ। খুবই বুদ্ধিমতী, অনুগত, কঠোর পরিশ্রমী, আর হ্যাঁ দারুণ সুন্দরী তো বটেই! মি: খান্না, দেখবেন যে ওর সম্বন্ধে অভিযোগ করার কোনো কারণই ঘটবে না।'

হাসিমুখে রুবি বলল, 'প্রশংসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

'ঠিক আছে তাহলে, মিস্টার খান্না। আমাদের ট্রাস্টে আপনার নতুন কাজটি শুরু হবার আগে শুভেচ্ছা জানাই। আমাকে এবার অন্য কাজে যেতে হবে।' এই বলে সিনহানিয়া তাঁর কামরার দিকে চলে গেলেন।

•

'রুবি।'

'বলুন, স্যার?'

'দেখ, আজ হল আমার কাজটির প্রথম দিন।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আজ কোনো কাজ না করে গল্প করলে কেমন হয়?'

'বুঝলাম না, স্যার?' (রুবির চোখেমুখে বিস্ময়)।

'কোনো কাজ নয়...শুধু গল্পগুজব...'

'কাজ...হ্যাঁ, স্যার। গল্প...হ্যাঁ, স্যার।'

'তুমি খুব খাটতে পার, রুবি!'

'ধন্যবাদ, স্যার!'

'বেশ, তাহলে ওখানে যে চিঠিগুলো রয়েছে ওগুলো পড়ে ফেলো। আমাকে ওগুলো কালকে দেখিও। এখন এস একটু গল্প করা যাক। আচ্ছা রুবি এই ট্রাস্টটি সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?'

'খুব ভাল, স্যার। আমার যা কিছু তা এই ট্রাস্টেরই জন্য। এবং আমি এর প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করেছি, স্যার।'

'খুব ভাল কথা। তা তুমি কতদিন এখানে কাজ করছ?'

'দু বছর তিন মাস ও সাড়ে দশ দিন, স্যার।'

'চমৎকার! সব দেখি তোমার নখদর্পণে। এমন কি দিনের অর্ধেকটাও বাদ দিলে না!'

'হ্যাঁ, স্যার কারণ এখন বারটা বেজে তিরিশ সেকেণ্ড হয়েছে।'

'সংখ্যা-টংখ্যা তারপর অঙ্ক—এগুলোর প্রতি তোমার বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে দেখছি।'

'আকর্ষণ? ভাল লাগা? আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।'

'বলো দেখি, আর কী কী বিষয়ে তোমার আগ্রহ?

'এই ট্রাস্ট বিষয়ে, স্যার!'

'আর?'

'সকলের বিষয়েই, সবকিছু বিষয়েই স্যার।'

'বাঃ চমৎকার! এমনকি আমার বিষয়েও?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার!'

'খুব, খুবই সুন্দর!'

'কি, স্যার?'

'তুমি!'

'ঠিক আছে, স্যার।'

'কফি? না চা?'

'কিছু না, স্যার।'

'কফি না? চা-ও না? কিচ্ছু না?' সহসা মিস্টার খান্না বেয়ারা ডাকার ঘণ্টাটা বাজালেন। কর্কশ ধাতব শব্দ করে ঘণ্টাটা বেজে উঠল—ক্ র-র-র-র।

'ওঃ না! ঘণ্টাটা বাজাবেন না, স্যার! আমার খুব অস্বস্তি হয়!'

'ঘণ্টার শব্দে অস্বস্তি হয়? আশ্চর্য...ঠিক আছে, বাজাবো না!'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'কিন্তু ঘণ্টাটা কি দোষ করল? শব্দটা শুনলে তোমার কি মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়?'

'না স্যার, আমার সারা শরীরে অস্বস্তি হয়।'

'কিন্তু কেন? ব্যাপারটা অন্যভাবে নিও না, ঘণ্টার শব্দটা শুনলে তোমার কি কোনো বিশ্রী ঘটনার স্মৃতি মনে আসে?

'কি ধরনের স্যার?'

'ধরো কোনো মেয়ে বাড়িতে একলা আছে। তাকে একজন অপরিচিত লোক হয়তো আক্রমণ করে বসল। ধরো দরজার ঘণ্টা শুনে দরজা না খুলে দিলে ঘটনাটা ঘটতই না। এই বিশ্রী অভিজ্ঞতার ফলে সেই মেয়েটির ঘণ্টা শুনলেই মনের মধ্যে একটা আতঙ্কের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল।'

'এটা সেরকম কিছু ব্যাপার নয়, স্যার।'

'ঠিক আছে, যাকগে। দুপুরের খাওয়া কিভাবে হবে!'

'আপনার খাবার ঘরেই দিয়ে যাবে।'

'জমানো চিঠিগুলো তুমি এর মধ্যেই দেখতে শুরু করে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ, স্যার। বেশির ভাগ চিঠিই আমার দেখা হয়ে গেছে।'

'দেখে মনে হয় রুবি তুমি সত্যিই এই ট্রাস্টের পেছনে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছ। কফি না, চা না, কারো সঙ্গে গল্প না! কাজ ছাড়া আর কি করতে তুমি ভালবাস?'

'শুধু কাজই, স্যার।'

'ভাল কথা। অফিসের পরে কি কর?'

'কিছু না! বাড়ি চলে যাই...নিজের জায়গায়।'

'নিজের জায়গায়? আর কোন কোন জায়গায় যেতে তোমার ভাল লাগে?'

'আর কোনো জায়গা নয়, স্যার।'

'তাহলে তোমার উচিত হাঁটতে বেরোন? সারাদিন ধরে এত কাজ কর আর সন্ধ্যাবেলায় একটুও বেড়াও না? কাজের চাপে তোমার স্নায়বিক উত্তেজনা হয় না?'

'উত্তেজনা? আমি বুঝিনা, স্যার। কাজই আমি ভালবাসি।'

'সে ঠিক আছে কিন্তু রুবি তোমার হাঁটতে বেরোন উচিত। এতে তোমার ভাল হবে। শরীর ভাল থাকবে...সৌন্দর্যও ঠিক থাকবে।'

'সৌন্দর্য?'

'হ্যাঁ! কী ভাবছ? ঠিক আছে, একদিন একসঙ্গে বেড়ান যাবে।'

'বুঝলে ভায়া, ঐ যে নতুন মনিব খান্না, উনি হলেন একটি চিড়িয়া-শিকারী!'

'কেন ভাসিন, কি ঘটেছে?'

'কি ঘটেছে? সুরি শোন, একেবারে পয়লা দিন থেকেই ফাঁদ পাততে শুরু করেছে ঐ খান্না! শিকার ধরার ধান্দা...বুঝলে ভায়া...খুব নজর দিচ্ছে...'

'কার দিকে?'

'সেই চিড়িয়ার দিকে যে আমাদের মত লোকেদের কখনও পাত্তা দেয় না! একজনই তো রয়েছে...আমাদের রুবিদেবী...'

'আরে ও তো খান্নার ব্যক্তিগত সচিব।'

'হ্যাঁ, 'অপারেশন রুবি' আজ এমনভাবে চালু করে দেওয়া হল যাতে সচিবটি 'ব্যক্তিগত'ই হয়ে ওঠে!'

'ভাসিন, এ হল ভানুমতী কা খেল! সবার পরে এল যে খান্না সেই দাঁড়াল লাইনে সকলের আগে।'

'আমরা তো আর ঘাস খাই না। সব বুঝি। আচ্ছা সুরি, আমরা তো ঐ চিড়িয়ার পেছনে দু বছর ধরে লেগে আছি...একবারও সে আমাদের দিকে তাকিয়েছে? বাজি ধরে বলতে পারি!'

'আরে দোস্ত, পুরো গল্পটা ঝেড়ে কাশো তো! কি দেখেছ? শুনতে পেলে কিছু?'

'দেখেছি স্রেফ এইটুকু যে খান্না চিড়িয়াটির গা ঘেঁষে বসে দুনিয়ার প্রশ্ন করে রুবির মন যাচাই করে ওকে বাগাবার ধান্দা করছে...রুবি কি খায়? কি পান করে? কোথায় যায়? কি করে? তবে ভাই, চিড়িয়াটিও অতীব ঠাণ্ডা জাতের। একটা টোপও ও গেলেনি। সে যাই হোক, খান্না চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে!'

'চিন্তা কোরনা দোস্ত, চেষ্টা আমরাও চালাচ্ছি!'

'সে তো চলবেই। গাড়িটার কোনো হদিশ করতে পারলে?'

'না, ভাই। রোজ গাড়িটা নিঃশব্দে আসা-যাওয়া করে চলেছে।'

'যে মুহূর্তে রুবি বোরোয় অমনি কাঁটায় কাঁটায় ঠিক ছ'টায় গাড়িটা রোজ আসে কি করে! রুবি যদি একটু হাঁটত বা অপেক্ষা করত তাহলে ওকে পৌঁছে দিতে পারতাম। বুঝলে সুরি, ওর সঙ্গে ভাব জমানোও যেত! কিন্তু ঐ হতচ্ছাড়া গাড়িটা...ঠিক ঘড়ি মিলিয়ে হাজির হবে।'

'আরে ভাসিন, রুবিকে বাড়িতে পৌঁছানোর লোকের কি কোনো অভাব আছে? আমিও একই লাইনে রয়েছি। সেটা জান তো?'

'রুবি?'

'বলুন, স্যার।'

'তুমি কি আমাকে কখনও অমিত বলে ডাকবে না?'

'না। দুঃখিত স্যার!'

'বার বার তোমাকে বলেছি কিন্তু গত ছ'মাসের মধ্যে একবারও তুমি আমাকে নাম ধরে ডাকনি। রুবি, তুমি জাননা যে কতটা...কতটা আমি তোমাকে চাই!'

'জানি, স্যার। কত কাজই তো আমরা একসঙ্গে করি...'

'হ্যাঁ, কাজ তুমি আমার সঙ্গে কর কিন্তু রুবি, তুমি সব সময় একটা দূরত্ব বজায় রাখ। কখনও আমার কাছে আসনা। আমি জানিনা কেন!'

'স্যার, আমি তো আপনার বেশ কাছেই রয়েছি। আপনি বললেন বলেই তো কাছে এলাম।'

'রুবি, তুমি আমার হৃদয়ের কথাটা, আমার অনুভূতির ব্যাপারটা বুঝতে চাওনা...কক্ষনো না! তোমার জন্যে আমি কষ্ট পাচ্ছি! আমি স্বপ্নে তোমাকে দেখি। তোমাকে জড়িয়ে ধরতে চাই। তুমি...আমার...'

'ক্ষমা করবেন, স্যার। আমি একটু কিছুও বুঝতে পারছি না।'

'আমি তোমাকে জড়াবার জন্যে মরে যাচ্ছি...কিন্তু তুমি সবসময় ঠাণ্ডা, কেমন দূরের...তুমি কখনও আমার সঙ্গে রেঁস্তোরায় যেতে বা বেড়াতে চাওনা। এমনকি তোমার হাতও কখনও ধরতে দাওনা!'

'হাত? ধরুন, স্যার, নিন। এবার ঠিক আছে?'

'তোমার হাত কি নরম, কি সুন্দর রুবি! তোমার দেহটা যেন স্বর্গীয়ভাবে তৈরি...যেন নিখুঁত সুষমায় কোনো ভাস্কর তোমার সুঠাম দেহটি বানিয়েছে! রুবি?'

'হ্যাঁ...স্যার! এ আপনি কি করছেন...আমাকে এভাবে স্পর্শ করছেন কেন?'

'আমার স্পর্শ তোমার কেমন লাগছে, রুবি?'

'কেমন? আমি শুধু জানি যে আপনি আমাকে স্পর্শ করছেন, ব্যাস। যে কোনো স্পর্শের মতই...আরে, পড়ে যাব যে, স্যার! আমি দাড়াতে পারছি না...কেন আপনি আমার মুখ, ঠোঁট ছুঁয়ে দেখছেন?'

'রুবি...রুবি...আমি তোমাকে অসম্ভব ভালবাসি!'

'ভালবাসা? আমি এবার যাব, স্যার! প্রায় ছটা বাজে!'

'কি হয়েছে তাতে? আমি তোমায় বাড়িতে ছেড়ে দেব। তুমি আজ আমার সঙ্গে থাকবে, রুবি! আমি...তোমাকে ছাড়া রুবি আমার পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়...'

'এ কি করছেন? এটা কি হচ্ছে, স্যার? আমি যাচ্ছি। ছাড়ুন...ছেড়ে দিন। শুভ রাত্রি, স্যার!'

দেখলে, দেখলে চিড়িয়া কেমন ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাল। চিড়িয়া-শিকারী এখন হেদিয়ে মরছে।'

'ভাসিন, রুবি হল নির্মম...নিষ্ঠুর! গত দুবছর চেষ্টা করেও আমরা কেউ ওর মন পাইনি। হতভাগা খান্নাটারও বরাতে তার চেয়ে ভাল কিছু নেই।'

'চলো, দেখা যাক যে রুবি কোথায় যায়।'

'চলো, জলদি। আরে দেখ, দেখ...সেই গাড়িটা!'

'হায় ভগবান!'

'মি: খান্না?'

'বলুন, স্যার।'

'আমাদের ট্রাস্টের পরিচালকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এখনই আপনাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হল। আপনার চাকরির মেয়াদ শেষ।'

'কিন্তু...কেন, স্যার?'

'রুবির সঙ্গে আপনার ব্যবহারের জন্য...আপনাকে নিয়োগ করা নিয়ে রুবিই আমাদের আপনার হয়ে প্রভাবিত করেছিল, জানেন?'

'রুবি?'

'হ্যাঁ, রুবি! কার্যক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে আপনাকে রুবি সবচেয়ে বেশি নম্বর দিয়েছিল। এখন আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে রুবির সেই বিশ্লেষণের তুলনায় আপনি অনেকটা পেছিয়ে পড়েছেন।'

'কি বিশ্লেষণ, স্যার?'

'রুবির বিশ্লেষণ।'

'রুবির?'

'মি: খান্না, এই ট্রাস্টে আপনার ছ'মাসের কাজর্মের বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে রুবির প্রতি আকর্ষণের ফলে আপনি ওর সঙ্গে যাতে বেশি সময় থাকতে পারেন তার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। কিন্তু পরে, ক্রমে ট্রাস্টের প্রতি আপনার আনুগত্য হ্রাস পেতে থাকে এবং রুবিকে নিয়ে আপনার মন বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এবং তার প্রত্যক্ষ ফল পরিণাম হল রুবির সঙ্গে আপনার আজকের ব্যবহার।'

'রুবি, আমার আজকের ব্যবহারের জন্য আমি খুবই লজ্জিত। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও, করবে না? কথা বল, রুবি!'

'রুবি কথা বলবে না, মি: খান্না।'

'কেন, স্যার? রুবি কথা বলবে না কেন?'

'ওর ভেতর থেকে ব্যাটারি খুলে নেওয়া হয়েছে বলে। এই সহজ কারণে ও কথা বলবে না। রুবির সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে কাজ ও সৌন্দর্যের মধ্যের সম্পর্কটি বোঝার চেষ্টা চলেছে। এই সম্পর্কের জটিলতাগুলো উপলব্ধি করা সম্ভব হলে কি সর্বোচ্চ কর্মদক্ষতা বজায় রাখা যায় তা আমাদের ট্রাস্ট জানতে পেরে লাভবান হবে।' এই বলে মি: সিংহানিয়া রুবির কানের পেছনে একটি বোতাম আলতো করে টিপে দিলেন এবং রুবিকে সোজা করে বসিয়ে দিলেন।

বাকরুদ্ধ অবস্থায় রুবির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া অমিত খান্নার তখন কিছু করার ছিল না। রুবির দুচোখ দিয়ে আলোকরশ্মি বেরিয়ে এল সামনের দেওয়ালে শুরু হল একটি চলচ্চিত্র। খান্নার প্রেমের প্রচেষ্টার ছবি চলতে থাকল।

তার তো তখন হে ধরণী, দ্বিধা হও গোছের অবস্থা। আমতা আমতা করে সে বলল, 'আমি দুঃখিত স্যার!'

খান্নার মনে হল মি: সিংহানিয়ার কথাগুলো যেন বহু মাইল দূর থেকে তার কাছে ভেসে আসছে। 'মি: খান্না, রুবি হল 'রোবট ব্যক্তিগত সচিব', এই ট্রাস্টের প্রতি ওর আনুগত্য অপরিসীম। সে যে তথ্য সংগ্রহ করেছে তা নিয়ে চর্চা চলছে—লক্ষ্য হল সৌন্দর্য ও কর্মদক্ষতার মধ্যে সম্পর্কটির পরিমাপ করা। কোনো সুন্দর সহকর্মীর উপস্থিতিতে ব্যক্তির কাজের সময় বেড়ে গেলেও তার কর্মদক্ষতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায় কারণ সে তখন কাজের বদলে ঐ সহকর্মীর দিকেই অধিকতর মনোনিবেশ করে। আপনার বেলাতেও ঠিক তাই ঘটেছে। তাহলে আপনি আসতে পারেন, বিদায়, মি: খান্না!'

পোষ্যপুত্র

অরবিন্দ মিশ্র

অস্ত্রোপচারের কক্ষে তখন একটি জটিল অস্ত্রোপচার চলছিল। বাইরের আবহাওয়া তখন উত্তেজনায় টান টান । উত্তেজিত কণ্ঠের আলোচনায় লুকোনো উৎকণ্ঠা।

'উঃ কি ভয়াবহ দুর্ঘটনা! বেচারা রাঘব! বাঁচবে কি না কে জানে!'

'প্রায় ছ'ঘণ্টা হয়ে গেল অস্ত্রোপচার চলছে!'

'রাঘবের বাবা বাইরের লাল আলোটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে আছেন। অবশ্য বেচারা ভদ্রলোকের আর কিই বা করার আছে? ওঁর একমাত্র ছেলে ঐ রাঘব—সবেধন নীলমণি।'

'উনি ছেলেকে PMT পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করার জন্য প্রতিযোগিতা প্রশিক্ষণ আবাসে পাঠিয়েছিলেন।'

'পরশুদিন তো ওর পি.এম.টি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে।'

'পরীক্ষার জন্য রাঘব খুব ভালভাবে তৈরি হয়েছিল।'

'পরীক্ষা দিলে রাঘব নির্বাচিত হতই।'

'ওর বন্ধু গৌরবও তো পরীক্ষাটায় বসছে।'

'দূর, ওর কথা বোল না। পি.এম.টি. পরীক্ষায় ও মোটেই সুবিধা করতে পারবে না।'

'এই, এত জোরে কথা নয়, ভাই! গৌরবের বাবাই তো রাঘবের মাথায় অস্ত্রোপচার করছেন।'

'শল্যচিকিৎসায় বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে উনি সদ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরেছেন। স্নায়বিক শল্যচিকিৎসায় ওঁর খুব নামডাক।'

'দুর্ঘটনায় রাঘবের মাথাটা একেবারে থেঁতলে গিয়েছিল!'

'দেখা যাক, শেষ অবধি কি হয়!'

প্রতীক্ষা করার কক্ষেও প্রায় অনুরূপ এক দৃশ্য। সেখানে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে দোদুল্যমান দুর্ভাগা বন্ধুর সংবাদের জন্য রাঘবের সতীর্থরা উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করছিল।

সহসা অস্ত্রোপচার কক্ষের দরজাটা খুলে গেল। ড: বিশালের ফ্যাকাসে, গম্ভীর মুখটা দেখা গেল। শুষ্ক কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাঘবের বাবা-মা কোথায়?'

রাঘবের বাবা এগিয়ে গেলেন। তাঁর আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে কাতর আকুতি, 'ডাক্তারবাবু, আমার ছেলে ভাল আছে তো? দয়া করে ওকে আপনি বাঁচান...'

পেশাদারী নির্লিপ্তির সঙ্গে ড: বিশাল বললেন, 'ওকে বাঁচাতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত। সত্যিই আমার খুব খারাপ লাগছে।' চলে গেলেন ড: বিশাল।

সে এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য। রাঘবের বাবার মুখে পুত্রশোকের আর্তনাদ, যন্ত্রণাবিদ্ধ অভিব্যক্তি। আচমকা বন্ধুর মৃত্যু সংবাদে রাঘবের বন্ধুরা বজ্রাহত, হতবাক।

সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ নিবিড় হয়ে উঠেছে। অথচ ড: বিশাল তখনও বাড়ি ফেরেন নি। অস্থির হয়ে তাঁর স্ত্রী পায়চারি করছিলেন। সহসা দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। গৌরব-এর মা দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। শোনা গেল তিনি স্বামীকে বলছেন, 'আজ তোমার ফিরতে যে এত দেরি হল।'

ড: বিশাল ক্লান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'সেকি, তুমি খবরটা পাওনি? গৌরবের বন্ধু আজ একটা দুর্ঘটনায় আহত হয়। সবরকম চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারলাম না।'

শোকাহত কণ্ঠে গৌরবের মা বললেন, 'সে কি? রাঘব বেঁচে নেই? এ কি করে হল? কি ভাল আর বুদ্ধিমান ছিল রাঘব! কি সাংঘাতিক কাণ্ড।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ড: বিশাল বললেন, 'শোনো, গৌরব কোথায়? এখনও ফেরেনি বুঝি? রাঘবের মৃত্যুতে ও প্রচণ্ড কষ্ট পাবে।'

আবার দরজার ঘণ্টা বাজল। কিছুটা আশ্বস্ত গলায় গৌরবের মা বললেন, 'মনে

হচ্ছে গৌরব ফিরে এসেছে।'

গৌরব ঢুকেই বাবাকে আঁকড়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল, 'বাবা, আমার বন্ধু রাঘব আর নেই! ওকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না!'

শান্ত কণ্ঠে ড: বিশাল বললেন, 'সোনা, এখন তোমায় বুকে সাহস ধরতে হবে। দেখ, ভাগ্যে যা ঘটার ছিল তা ঘটে গেছে। কাল বাদে পরশু তোমার পরীক্ষা। সেই পরীক্ষার ব্যাপারে তোমাকে এখন মন দিতে হবে।'

'কিন্তু, বাবা...'

'শোনো, এখন আর কোন কিন্তু নয়। অত নরম হয়ে পড়লে চলবে না। সামনে যে লক্ষ্য রয়েছে সেটা নিয়ে চিন্তা কর। যাতে তোমার আত্মবিশ্বাস বাড়ে তার জন্য আমি তোমাকে ছাত্রাবাসে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু দেখছি...'

গৌরবের মা বাধা দিলেন, 'এখন ওকে ছাড় তো। সকাল বেলা বেরিয়ে ছেলেটা ফিরল। তার ক্ষিদে তেষ্টার খোঁজ না নিয়ে ছেলেটাকে বকতে শুরু করলে? যা লক্ষ্মীটি, ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে নিজে খেয়ে নে আর তোর বাবাকেও এনে দে?'

ড: বিশাল বললেন, 'আমি শুধু কফি খাব। আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। তবে গৌরব, তুমি আবার আমার কথা শুনে খাবেনা এমন করবে না।' গৌরব ভেতরে চলে গেল। ড: বিশাল তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'দেখ দীপিকা, গৌরব বাদে আমাদের অন্য সব ছেলেই যথেষ্ট প্রতিভাবান! দুজনেই তারা ভাল ভাল চাকরি করছে। এমনকি আমাদের মেয়েটাও উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেছে। আমার একমাত্র দুশ্চিন্তা হল গৌরবকে নিয়ে। আমি চেয়েছিলাম যে ও ডাক্তার হোক কিন্তু মনে হচ্ছে ওর 'মস্তিষ্ক' বলে বস্তুটিই নেই। মানে 'মগজ' বলে কিছু নেই।'

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে দীপিকার প্রশ্ন, 'তুমিও দেখছি সাধারণ লোকের ভাষাতেই কথা বলছ। 'মগজ' বলে তুমি কি বোঝাতে চাইছ? বুদ্ধিবৃত্তির জন্য কি ঐ একটা বস্তুই দায়ী?'

ড: বিশাল অপ্রতিভ গলায় বললেন, 'ওঃ আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে তুমিও মস্তিষ্কবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেছিলে। বুঝতে পারছি যে তোমার সামনে আমার 'মগজ' না বলে 'নিওপেলিয়াম' বলাই উচিত ছিল। যাইহোক আজকের অস্ত্রোপচারটির আমি নাম দিয়েছি 'অপারেশন মগজ'?'

কিছুটা তীক্ষ্ণভাবেই দীপিকা বললেন, 'যে অস্ত্রোপচারে তুমি ব্যর্থ হয়েছ...'

'হয়তো. পুরোপরি অসফল হইনি! এখন আমার একটা ক্ষীণ আলো রয়েছে!' ড: বিশালের জবাবে রহস্যের একটা আভাস।

'কি বলতে চাও তুমি? রাঘবকে কি এখনও বাঁচান সম্ভব?'

'বোকার মত কথা বোল না। মৃত মানুষ কখনও বেঁচে ওঠেনা!'

'তাহলে কি আবার আশার আলো দেখার কথা বলছিলে?'

'কোনো আলোই নেই। চিকিৎসকের দৃষ্টি থেকেই রাঘব শুধু মারা যায়নি, জীববিজ্ঞানের অর্থেও সে মৃত। এই অর্থে মৃত বলতে কি বোঝায় সেটা তুমি ভাল করেই জান—সব শেষ। মস্তিষ্কের প্রত্যেকটা কোষই মৃত!'

'তাহলে আর হেঁয়ালি করে কথা বলছিলে কেন? সবই যদি শেষ তাহলে আবার আশার আলোর কথা ওঠে কি করে?'

'ছেড়ে দাও ও কথা। কিছু না ভেবেই কথাগুলো বলছিলাম। আসলে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলাম।'

'মুখ ফসকে? তুমি কি ভেবেচিন্তে কথাগুলো বলছ? তোমার কি মাথার ঠিক আছে?

সহসা গৌরব এসে ঢোকায় এই বাদানুবাদে ছেদ পড়ল।

'মা, আমি ছাত্রাবাসে যাচ্ছি!'

দীপিকা অনুনয় করলেন, 'আজ যাসনা, বরং বাড়িতেই লেখাপড়া কর।

'কিন্তু আমার খাতা, বই সব যে ওখানে?'

'ঠিক আছে, যেমন মন চাইছে করো। মনে রেখ সবকটি পত্রের পরীক্ষা পরশুদিন এবং তার পরের দিনই ফলাফল ঘোষিত হবে। তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ।'

'আর, কাল সকালে ঠিক আটটায় গবেষণাগারের কাছে আমার ঘরে এসে দেখা করবে! ঠিক আসবে তো?'

'হ্যাঁ, বাবা। দুজনকেই শুভরাত্রি।'

ড: বিশাল ও দীপিকা একই সঙ্গে বলে উঠলেন, 'শুভরাত্রি।'

খবরের কাগজ দেয় যে ছেলেটা সে বাড়ির গেটের কাছে 'কাগজ!' বলে চেঁচাল?

দীপিকা এগিয়ে গিয়ে কাগজটা তুলে নিয়ে আলগোছে একবার প্রধান প্রধান খবরগুলোর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। 'আরে! আমাদের গৌরবের একটা ছবি ছাপা হয়েছে। অবিশ্বাস্য! গৌরব PMT পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। বিশাল! বিশাল! দেখ, আজকের খবর হল আমাদের গৌরব PMT-তে প্রথম হয়েছে।

প্রথম পাতায় গৌরবের ছবি ছাপা হয়েছে।' দীপিকার কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় কাঁপছিল।

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ড: বিশাল বললেন, 'তাই নাকি! আমি অবশ্য আগেই জানতাম যে আমার ছেলে প্রথম হবে।'

'ওসব ছাড় তো। আমার তো ভয় যে কোথাও একটা ভুল হয়ে থাকবে। হয়তো...ভুল করে খবরটা ছেপেছে।'

'কি বলছ কি তুমি? গৌরব নিশ্চিতভাবে প্রথম হয়েছে। ওর উপরে আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। খবরটা শতকরা একশভাগ খাঁটি!'

'কিন্তু এটা হল কি করে? এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না...'

তর্কটা হয়তো তখনই টেলিফোন না বেজে উঠলে চলতেই থাকত। 'হ্যালো। ড: বিশাল বলছি।'

'অভিনন্দন, ড: বিশাল। আমি মধুকর বলছি। প্রশিক্ষণ ছাত্রাবাসের প্রধান। গৌরব PMT পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। ওকে একটু ডেকে দিন। আমি নিজে তাকে অভিনন্দন জানাতে চাই।'

'হ্যালো...কিন্তু, ওতো এখানে নেই। আসলে আমিই ওকে ছাত্রাবাস থেকে বাড়িতে আসার জন্য বলতাম। ও কি ছাত্রাবাসে নেই?'

'না, ড: বিশাল। গতকাল সন্ধ্যাবেলাতেই ও এখান থেকে চলে যায়। ওর বন্ধুরাও আমাকে তাই বলেছে। গৌরবকে অভিনন্দিত করার জন্য তারাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। অবাক লাগছে শুনে যে সে বাড়ি যায়নি। কিন্তু, আর কোথায়ই বা সে যেতে পারে?'

'মি: মধুকর, কথাটা ভেবে আমারও তো অস্বস্তি হচ্ছে। গতরাত থেকে যখন তাকে পাওয়া যাচ্ছেনা তখন ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। আমাদের এখনই পুলিশে খবর দিতে হবে!'

'ঠিক বলেছেন, ড: বিশাল। আমিও ওর খবর বের করতে চেষ্টা করছি। বেতার ও দূরদর্শনের মারফতও ব্যাপারটা জানানো দরকার। অথবা তার আগে আমরা ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করেও দেখতে পারি। সম্ভবত ও এখানেই ফিরে আসবে। হয়তো কোনো বন্ধুর সঙ্গে কোথাও গেছে। আমি আপনাকে আবার ফোন করব।'

ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখার সময় ড: বিশালের হাত কাঁপছিল।

টেলিফোনের কথাগুলো শুনছিলেন দীপিকা। তিনি বিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'আমার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে। পর পর অচিন্তনীয় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে! দোহাই তোমার গৌরবকে তোমায় এখনই খুঁজে বের করতে হবে!'

'সামান্য ব্যাপারেই তুমি বড় ঘাবড়ে যাও। হয়তো গৌরব ওর কোনো বন্ধুর বাড়ি গেছে।'

'না, না। তোমাকে পুলিশে খবর দিতেই হবে!'

'ঠিক আছে, আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি। সেই সঙ্গে বেতার ও দূরদর্শনেও জানাচ্ছি। এর মধ্যে একবার আমি আমার বন্ধু গৌতমের সঙ্গে দেখা করব। ওর সঙ্গে আমার একটু দরকারী কাজ আছে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ড: বিশাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

'আরে এস, এস, বিশালভায়া! PMT-তে প্রথম হয়ে তোমার ছেলে তো দুনিয়া কাঁপিয়ে দিয়েছে। সত্যি আমি খুব আনন্দিত! অভিনন্দন!' ড: গৌতম ড: বিশালের প্রাণের বন্ধু।

ওসব কথায় কর্ণপাত না করে ড: বিশাল বললেন, 'ড: গৌতম, আমি এই থানা থেকে আসছি।'

'কেন? সবকিছু ঠিকঠাক আছে আশা করি?'

'কি ঠিকঠাক আছে? গত রাত থেকে গৌরবকে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই সকাল থেকে গৌরবকে খোঁজার চেষ্টা চলছে। বাড়িতে একের পর এক লোক আসছে গৌরবকে অভিনন্দন জানাবার জন্য আর তার কোনো পাত্তা নেই!'

'হয়তো কোথাও কোনো বন্ধুর বাড়ি গেছে। তুমি অকারণে উদ্বিগ্ন হচ্ছ।'

'না, ভাই! ওর সাফল্যের কথা জানার পরে গৌরবের উচিত ছিল এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করা।'

ধীরকণ্ঠে ড: গৌতম বললেন, 'বিশাল! কিছু যদি মনে না কর একটা কথা বলি। PMT পরীক্ষায় গৌরবের প্রথম হওয়া একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। বরাবরই ও মাঝারি মানের ছাত্র...হঠাৎ কি ঘটল ওর? তাছাড়া, ওকে নিয়ে তোমারও তো দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না!'

গৌতম, তোমার কাছে আমি কিছু গোপন করব না। গৌরবের PMT-তে প্রথম হওয়ার পেছনে একটা রহস্য রয়েছে। সেই রহস্যটা আমি একমাত্র তোমার কাছেই ফাঁস করতে পারি কারণ তুমি গবেষণার ব্যাপারে আমার সহযোগী। সত্যি বলতে গৌরবের সাফল্য হল আমাদের গবেষণার ফল।'

উত্তেজিত ড: গৌতম বললেন, 'কি করে সেটা সম্ভব।'

অনুত্তেজিত কণ্ঠে ড: বিশাল বলতে শুরু করলেন,

'তোমার হয়তো মনে আছে যে মার্কিন বিজ্ঞানী ম্যাক্‌কনেল যখন কিছু জীবন্ত সামুদ্রিক প্রাণীর ওপরে স্মৃতি প্রতিস্থাপন নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন তখন আমি তাঁর গবেষণাগারে কাজ করছিলাম। তখন সহসা আমি উপলব্ধি করি যে উন্নততর প্রাণীর ক্ষেত্রেও স্মৃতি প্রতিস্থাপন সম্ভব।'

'তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরেই তুমি এই বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলে। ব্যাপারটা আমার জানা কারণ কাজটা যখন তুমি করছিলে তখন আমি তোমার সঙ্গে যোগদান করি।'

'কিন্তু, ভাই গৌতম, অন্য কয়েকটি তথ্য তোমার জানা নেই। আজ এ বিষয়ে বেশ কিছু কথা তোমাকে আমার বলার আছে। যখন আমরা দেখলাম যে বার্তা বহনকারী RNA (mRNA) হচ্ছে স্মৃতিকোষ তখন নিম্নতর জীবন্ত প্রাণীর মস্তিষ্ক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ঐ mRNA-র গতিপথ নির্ণয়ের দায়িত্ব আমি তোমাকে দিলাম। এদিকে আমি সেই কোষগুলিকে আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগলাম যেগুলি রেসাস বাঁদরের মস্তিষ্কে এই স্মৃতি অণুগুলিকে সংশ্লেষিত করে।'

আহতকণ্ঠে ড: গৌতম বললেন, 'ব্যাপারটা তুমি আমার কাছ থেকে গোপন রেখেছিলে!'

'ক্ষমা কর, বন্ধু! ভয় পেয়েছিলাম যে আমি সফল হব না। সেটা জানলে তোমাদের কাছে তামাশার পাত্র হয়ে উঠব।'

'ঠিক আছে, বলে যাও।'

'সাধারণ লোকের জন্য রচিত আরথার কোয়েসলার-এর একটি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধে স্মৃতি-সংস্থাপনের বিষয়ে যে পরীক্ষা হয়েছে তার উল্লেখ ছিল। বিজ্ঞানীদের কথাও ছিল। প্রবন্ধটি পড়ে আমি খুবই উৎসাহিত বোধ করি। এরপর থেকে রেসাস বাঁদরের মস্তিষ্ক কোষে mRNA-র অস্তিত্ব সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য আমি পরপর সংগ্রহ করি এবং এই কোষগুলিকে আলাদা করতেও সমর্থ হই। এগুলিকে অন্য বাঁদরের মস্তিষ্ক-কোষে সংস্থাপিত করে যখন ঈপ্সিত ফল পেলাম তখন আমার আনন্দের আর অবধি ছিল না। বারংবার পরীক্ষাটি করে আমি একই ফল পাই। অর্থাৎ আমি দেখলাম যে স্মৃতি-সংস্থাপন সম্ভব!'

ড: গৌতম আপাত বিদ্রূপের ঢঙে বললেন, 'অতএব তখন তুমি ঠিক করলে যে মানুষের ক্ষেত্রেও তোমার এই পরীক্ষা চালাবে।'

'হ্যাঁ এবং তখন আমি গৌরবকে তার জন্য বেছে নিলাম। যখন ওর বন্ধুকে আমি বাঁচাতে পারলাম না তখন তার স্মৃতি-কোষগুলিকে আমি বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম।

আমার সহসা মনে হল যে গৌরবের মস্তিষ্কে রাঘবের স্মৃতি আমি সংস্থাপিত করতে পারি।'

'এই কারণেই গৌরব PMT পরীক্ষায় সফল হয়ে প্রথম হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ড: বিশাল, তোমার পরীক্ষা মানুষের ক্ষেত্রেও সফল,' ড: গৌতমের কণ্ঠে এক অস্বাভাবিক নির্লিপ্ততা।

'কিন্তু গৌতম, আমি জানিনা...আমার মনে নানা সন্দেহ ভিড় করছে। এখনও গৌরবের কোনো খবর নেই।'

ড: গৌতম কিছু বলার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল। ড: গৌতম রিসিভার তুললেন। 'হ্যালো...হ্যাঁ...এখানেই আছে...বিশাল, বৌদি...তোমাকে চাইছেন।'

'হ্যালো...হ্যাঁ...হ্যাঁ...কি? গৌরব ওখানে গেছে? কিন্তু কেন? ঠিক আছে, আমি এখনই সেখানে যাচ্ছি।'

ড: বিশাল রিসিভার নামিয়ে রেখে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার! রাঘবদের গ্রামের বাড়িতে, রাঘবের বাব-মার কাছে গৌরব গেছে। রাঘবের বাবা এই খবর দিয়ে আমাকে এখনই সেখানে যেতে বলেছেন। ওদের গ্রাম এখান থেকে ষাট কিলোমিটার। গৌতম, তুমিও দয়া করে আমার সঙ্গে চল! তোমার গাড়িটা বের করো। এক্ষুণি!'

অনতিবিলম্বে দেখা গেল ড: গৌতমের মারুতি সেই গ্রামের দিকে ধাবমান।

বাড়ির সামনে গাড়িটা থামার ও তার হর্ণের শব্দ রাঘবের বাবা শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি রাঘবের মাকে বললেন, 'মনে হচ্ছে ড: বিশাল এসে গেছেন। দেখতো, গৌরব রাঘবের ঘরে আছে কিনা। আমি এগিয়ে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে আসি।'

খুবই সহৃদয়তার সঙ্গে তিনি গৌরবের বাবাকে অভ্যর্থনা জানালেন, 'আসুন! কি সৌভাগ্য আমার! আমরা বড় অধীরভাবে আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম ডাক্তারবাবু!'

উত্তরে সমার্থক কিছু বলার ভদ্রতা রক্ষা না করেই ড: বিশাল সরাসরি আসল কথায় এসে গেলেন, 'গৌরব কোথায়? আপনি জানিয়েছেন যে ও এখানে এসেছে। গৌরব ঠিক আছে তো? ইনি আমার বন্ধু ড: গৌতম!'

রাঘবের বাবা বললেন, 'নমস্কার! দয়া করে বসুন। দাঁড়িয়ে কেন আপনারা? বসুন!'

ড: বিশাল অস্থির হয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'গৌরব কি এখানে নেই? ও কি অন্য কোথাও গেছে?'

'না। ও বেশির ভাগ সময়ই রাঘবের ঘরে বসে থাকে। রাঘব ঠিক এমন করত। ওরও অভ্যাস একই রকম—বেশির ভাগ সময়ই কোনো বই মুখে করে বসে থাকবে। ডাক্তারবাবু, গৌরবের কিন্তু অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ওর ভাবভঙ্গি ঠিক রাঘবের মতই হয়ে গেছে দেখছি। নিজেকেও ও রাঘব বলেই মনে করছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ও আমাকে ওর নিজের বাবা, রাঘবের মাকে ওর নিজের মা বলে মনে করছে, সেইরকম ব্যবহারও করছে।'

রাঘবের বাবা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ড: বিশাল বাধা দিলেন, 'এ আপনি বলছেন কি?'

'তাজ্জব ব্যাপার!' এমনকি ড: গৌতমও কিছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না। সেই মুহূর্তেই গৌরব ঘরে ঢুকল। সব ক'টি চোখ তার দিকে।

গৌরব অতিথিদের একে একে অভ্যর্থনা জানাল, 'নমস্কার, ডাক্তারবাবু! নমস্কার, কাকু!'

রাঘবের বাবা বললেন, 'কাকু নয়, বাছা! উনি তোমার বাবা।'

'কি বলছ তুমি, বাবা? আমার কাকুকে আমি চিনতে পারব না? এই দুই কাকুই বড় ভাল। আমার কথা ওঁরা খুব ভাবেন।'

বিস্মিত ড: বিশাল বলে উঠলেন, 'গৌরব, এ তুই বলছিস কি? তোর কি হয়েছে?'

'কাকু, আপনি আমায় গৌরব বলে ডাকছেন কেন? আমি তো রাঘব। গৌরব আপনার সঙ্গে আসেনি কেন?'

ড: গৌতম ফিসফিস করে বিশালকে বললেন, 'বন্ধু, তুমি তোমার পুত্রকে হারিয়েছ। তোমার অপারেশন 'মগজ' বিফল হয়েছে।'

'ওঃ না, একথা বোলনা! আমি তা সহ্য করতে পারব না।'

'এই নির্মম সত্যের মুখোমুখি তোমাকে দাঁড়াতে হবেই বিশাল। বন্ধু, তোমার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নেতিবাচক দিকটার কথা তুমি ভেবে দেখনি। মনে হচ্ছে যে রাঘবের সমগ্র স্মৃতি গৌরবের মধ্যে চলে এসেছে, তোমার পছন্দসই স্মৃতির অংশটুকু নয়।'

রাঘবের বাবা হতভম্বভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কি আলোচনা করছেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

অসহায় ড: বিশাল বললেন, 'গৌতম, তুমি দয়া করে ওঁকে বুঝিয়ে বলবে?

আমার আর বলার অবস্থা নেই। হায়...এ আমি কি করলাম!'

এই রহস্যের কিছুই না বুঝতে পেরে রাঘবের বাবা বলে উঠলেন, 'এসব কি ব্যাপার, ড: গৌতম? আমাকে বলুন। আমার কেমন লাগছে!'

'হ্যাঁ, আপনাকে বলতেই হবে...আপনার ছেলে তো খুব প্রতিভাবান ছিল, তাই না? PMT পরীক্ষার জন্য রাঘব তো খুব ভালভাবে তৈরী হয়েছিল।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাঘবের বাবা বললেন, 'ডাক্তারবাবু, দোহাই আপনাকে ওর কথা মনে করাবেন না। রাঘবের কথা ভবলে আমার বুক ভেঙে যায়! কিন্তু, ওর কথা আপনারা বলছেন কেন?'

'কারণ, রাঘব এখনও বেঁচে আছে। সে মৃত নয়!'

'কি সব কথা বলছেন আপনারা? ডাক্তারবাবু, আমার সঙ্গে এই নিষ্ঠুর ঠাট্টাটা কি না করলেই নয়? আমি নিজের হাতে তার চিতায় আগুন দিয়েছি!' ডুকরে কেঁদে উঠলেন রাঘবের বাবা?

'সেটা সত্য? রাঘবের দেহ নেই? কিন্তু গৌরবের মস্তিষ্কের মধ্যে তার মনটা বেঁচে আছে।'

'ডাক্তারবাবু, দয়া করে আপনি আমাকে বোঝান! আমার কিছু মাথায় ঢুকছে না।'

'শুনুন, ড: বিশাল যখন রাঘবকে বাঁচাতে পারলেন না তখন তিনি তার মস্তিষ্কের স্মৃতি-কোষগুলিকে গৌরবের মস্তিষ্কে সংস্থাপিত করলেন যাতে সে আরও বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে। ড: বিশাল ভেবেছিলেন যে গৌরব যখন PMT পরীক্ষায় বসবে তখন গৌরবের মধ্যে রাঘবের স্মৃতি-কোষগুলি সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং ঐসব প্রশ্নের সমাধানে গৌরবকে সাহায্য করবে? ড: বিশাল এই অবধিই ভেবেছিলেন? কিন্তু তিনি এটা বুঝতে ব্যর্থ হন যে রাঘবের সমগ্র স্মৃতিই গৌরবের মস্তিষ্কে চলে আসবে। তাই মানসিক দিক দিয়ে বিচার করলে গৌরব রাঘবে পরিণত হয়েছে।'

ব্যথিত কণ্ঠে ড: বিশাল বললেন. 'আমার পরীক্ষা শেষ অবধি ব্যর্থ হয়েছে কারণ স্বার্থপরতার বশে এই পরীক্ষার দীর্ঘমেয়াদী পরিণাম নিয়ে আমি ভাবিনি। আমি কল্পনাও করিনি যে এত কঠোর শাস্তি আমাকে পেতে হবে। হায়, এখন আর কিই বা করার আছে?'

রাঘবের বাবা বললেন, 'আপনি গৌরবের মস্তিষ্ক নিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন এবং প্রয়োজন বোধ করলে অস্ত্রোপচার করে ওকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারেন।'

'না, এই ঝুঁকি নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হয়তো অস্ত্রোপচারের সময় ওর

পুরো স্মৃতিটাই মুছে যাবে। এখনও অন্তত গৌরব তো কোনোভাবে আছে!'

রাঘবের বাবা সস্নেহে গৌরবের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'বাবা, শুনলে তো? এই ড: বিশালই তো তোমার বাবা, আমি নই!'

গৌরব স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, 'সে যাই হোক না কেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমার কেমন সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। আমি শুধু জানি যে তুমিই আমার বাবা আর ডাক্তার বিশাল হচ্ছেন আমার কাকু।'

ড: বিশাল বিলাপ করে উঠলেন, 'হায়, আমি এখন কি করব? আমার ছেলেকে আমি হারিয়েছি! নিজেকে কক্ষনো আমি ক্ষমা করতে পারব না!'

সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ড: গৌতম বললেন, 'বুকে সাহস ধর, বিশাল!' তবু, তাঁকেও যথেষ্ট বিচলিত দেখাচ্ছিল। পরিস্থিতিটা ভয়ঙ্কর উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

রাঘবের বাবাই নীরবতা ভঙ্গ করলেন। 'আমার একটি অনুরোধ আছে। রাঘব ছিল আমাদের শেষ বয়সে একমাত্র নির্ভর। ওর মৃত্যুতে আমাদের সব হিসেব ধানচাল হয়ে গেছে। জীবনে আর এই বুড়োবুড়ীর কোনো আগ্রহই নেই। ডাক্তরবাবু, আপনার অনেক কৃতী ছেলে রয়েছে। শুধু যদি আপনি আমাদের দুঃখটা উপলব্ধি করতেন!'

সন্দেহের বশে ড: বিশাল জানতে চাইলেন, 'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'আপনি যদি দয়া করে অনুমতি দেন তাহলে গৌরবকে পোষ্যপুত্র হিসেবে আমি গ্রহণ করব। ডাক্তারবাবু, এ আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে গৌরবের দিকে তাকিয়ে ড: গৌতম বললেন, 'গৌরব...ইয়ে...রাঘব তুমি কি চাও?'

গৌরব বলল, 'আমি এখানে বাবার সঙ্গে থাকতে চাই।'

'চলো তাহলে। আমরা বরং ফিরে যাই, বিশাল। প্রায়ই আমরা না হয় গৌরবকে এসে দেখে যাব। দুঃখ কোরো না। হয়তো কোনোদিন ও তার নিজের সত্বায় ফিরে আসবে! ততদিন ওর এখানে থাকাই ভাল।'

ড: বিশালের হাত ধরে ড: গৌতম তাঁকে ধীরে, ধীরে বাইরে নিয়ে এলেন।

হতাশ কণ্ঠে ড: বিশাল বললেন, 'হ্যাঁ। এই মুহূর্তে আর কিই বা আমাদের করার আছে?'

Lasertypeset at Ess Ess Enterprises, New Delhi 110 055
and printed at Jupiter Offset Works, Delhi 110 032

63.00 টাকা

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া